দেহরক্ষীর ভূমিকায়

ওসামার সাথে আমার জীবন

নাসের আল-বাহরি

নাসের আল-বাহরি ১৯৭২ সালে সৌদি আরবের জেদ্দায় রেড সী পোর্টে জন্মগ্রহণ করেন। ওসামার পরিবারের মতো বাহরির পরিবারও ষাটের দশকে ইয়েমেন থেকে সৌদি আরবে চলে এসেছিল।

দশ ভাইবোনের মধ্যে সবার বড় বাহরি ১৬ বছর বয়স থেকেই জিহাদি জীবন শুরু করেন। আরবের অন্য অনেক যুবকের মতোই বসনিয়া, সোমালিয়া হয়ে চলে আসেন আফগানিস্তান। অতঃপর আল-কায়েদা প্রধান ওসামা বিন লাদেনের দেহরক্ষী হিসেবে নিযুক্ত হন।

ওসামার দেহরক্ষী হিসেবে থাকলেও বাহরি শুরুতে আল-কায়েদার সদস্য ছিলেন না। পরবর্তীতে আল-কায়েদার নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের নেতাদের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার। নাইন ইলেভেন পূর্ববর্তী সময়ে, ২০০১-এর ফেব্রুয়ারিতে আটক হন বাহরি। তখন তিনি তাঁর পূর্বের জীবনের জন্য অনুতপ্ত হন ও অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন এফবিআইকে। বইটি লেখার সময় বাহরি ছিলেন ইয়েমেনের একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার।

বাহরি ২৬ ডিসেম্বর ২০১৫ সালে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে ইয়েমেনের আল-মুকাল্লার একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।

ওসামার সাথে আমার জীবন

নাসের আল-বাহরি

(বিন লাদেনের সাবেক দেহরক্ষী)

সহলেখক

জর্জেস ম্যালব্রুনো

ভাষান্তর

ইউসুফ তাসফিন

প্রজন্ম

মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন: ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮

www.projonmo.pub

ওসামার সাথে আমার জীবন

প্রকাশকাল: আগস্ট ২০২১

প্রচ্ছদ: ওয়াহিদ তুষার

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com/projonmo

amaderboi.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; তানভীর প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Osamar Sathe Amar Jibon by Nasser al-Bahri
Published by Projonmo Publication

ISBN: 978-984-95578-5-2

"একটি সন্ত্রাসী সংগঠনে জীবনযাপনের এক প্রত্যক্ষ ও অসাধারণ বর্ণনা।"

-Le Figaro Magazine, ৯ এপ্রিল, ২০১০।

"বিন লাদেনের সাবেক দেহরক্ষীর বর্ণনা রীতিমতো শ্বাসরুদ্ধকর।"

-Tele et Vous, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১১।

"বাহরির কথাগুলো যেন তথ্যের খনি।"

-Liberation, ১৯ এপ্রিল, ২০১০।

"আল-কায়েদার অভ্যন্তরে জীবন কাটানোর একেবারে যথার্থ ও সরাসরি দলিল। ...বাহরি আমেরিকা, কানাডার প্রকাশকদের কাছে তার গল্প বিক্রি করতে চাননি। সানাআয় তিনি ম্যালব্রুনোকে বলতে রাজি হয়েছেন।"

-Le Monde, ২৪ এপ্রিল ২০১০।

"অসাধারণ গল্প...বাহরি পাকিস্তানের একটি ঘরে বসে ৯/১১ দেখাকে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।"

-El Pais, ২ মে, ২০১০।

"আল-কায়েদা নেতার আঁচল থেকে পাওয়া গল্প।"

-Sunday Times, ১৯ এপ্রিল, ২০১০।

"সে আমাদের আল-কায়েদা সম্পর্কে রীতিমতো তথ্যের খনি দিয়েছে।"

-আলি সুফান, তিনি সেই এফবিআই গোয়েন্দা,
যিনি বাহরিকে বেশ কয়েক সপ্তাহ জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন।

"বাহরি যেকোনো বন্দির চেয়ে বেশি জরুরি। অথচ আর সব বন্দিকেই বিন লাদেনের সাথে সরাসরি যোগাযোগ থাকার কারণে গুয়ান্তানামোতে পাঠিয়ে দিই।"

-মাইকেল শইয়ার, আলেক স্টেশনের সাবেক হেড।
সিআইএ'র এই ইউনিটটিই বিন লাদেনকে খুঁজে বের করেছিল।

সূচিপত্র

ভূমিকা

২০১০ সালে ফ্রেঞ্চ সাংবাদিক জর্জেস ম্যালব্রুনো[১] ওসামা বিন লাদেনের সাবেক দেহরক্ষী নাসের আল-বাহরির গল্প জানতে চাচ্ছিলেন। তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। তার মূন আগ্রহের জায়গা ছিল তারনাক ফার্মে আফগান হেডকোয়ার্টার।

আল-বাহরিই একমাত্র সাবেক আল-কায়েদা সদস্য, যিনি স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারেন। আল-বাহরি ২০০১ সালে গ্রেফতার হন। তাকে সানাআ জেলে আটক রাখা হয়। ইয়েমেন সরকার তাকে দুই বছর পর ছেড়ে দেয়। তারা কারণ হিসেবে দেখায় যে, আল-বাহরি 'তাওবা' করেছেন। ৭০টি রাষ্ট্র এখনো তাকে গ্রেফতার করতে মরিয়া।

তারনাক ফার্মে জীবন, আল-কায়েদার নেতা, তাদের পরিবারের অবস্থা ও সম্পর্ক, সংগঠনটির কাঠামো, আল-কায়েদা ও তালেবানের মধ্যকার সম্পর্ক, পাকিস্তান আর্মি ও তাদের গোয়েন্দা সংস্থার কাজ, ওসামা বিন লাদেনের জীবন, ৯/১১ পরিকল্পনা—এসব বিষয়গুলো খুবই নাটকীয়ভাবে তুলে এনেছেন আল-বাহরি।

আল-বাহরি কীভাবে আল-কায়েদায় যোগ দিয়েছেন তা থেকে আমরা তরুণ জিহাদিদের সাইকোলজিও বুঝতে পারি। বুঝতে পারি, কেন তারা স্বাভাবিক, সম্ভাবনাময় জীবন বাদ দিয়ে 'শহিদ' হওয়ার পথে চলে যায়।

আল-বাহরি এখন একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার। তিনি নিজেকে 'ইতিহাসের সাক্ষী' বলে আখ্যায়িত করেন। তার মতে, তার গল্প অনেককেই এ পথে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে।

এফবিআই আল-বাহরির সাক্ষ্যকে 'খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের খনি' বলে আখ্যায়িত করেছে। এ বইয়ে যা আছে এগুলো সবই তার একান্ত আবেগ ও পর্যবেক্ষণ থেকে বলা।

---

১. জর্জেস ম্যালব্রুনো *Le Figaro*-এর একজন চিফ রিপোর্টার এবং মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক গবেষক। ইসলামিক স্টেট অব ইরাক তাকে ২০০৪ সালে ১২৪ দিন বন্দী করে রেখেছিল।

"নাও, আমাকে হত্যার বন্দুক!"

সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে আয়মান আল-জাওয়াহিরি ও আবু হাফস আল-মাসরি কুরআন তিলাওয়াত করতে করতে বাগানের দিকে যাচ্ছিলেন মাগরিবের সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে। শায়খ ওসামা বিন লাদেন তখন তার কাবুল অফিসে একা একা বসে ছিলেন। ১৯৯৮ সালে নাইরোবি ও দারুস সালামে আমেরিকার দূতাবাসে হামলার পর আল-কায়েদার নেতারা সেখানে চলে যান। তিনি আমাকে পাশ দিয়ে যেতে দেখে ডাকলেন এবং মুচকি হেসে বললেন, "আবু জান্দাল, এদিকে এসো। আমি তোমাকে একটা গোপন কথা বলছি।"

আমি তার কাছে গেলাম। তিনি তার সাওব (জুব্বার ওপর যে পোশাক পরা হয়) থেকে একটি হ্যান্ডগান বের করলেন।

"আল্লাহ না করুন, যদি শত্রুরা আমাদের এমনভাবে ফাঁদে ফেলে কিংবা ঘিরে ফেলে যে আমরা গ্রেফতার হই, তবে তুমি আমাকে মাথায় দুইবার গুলি করবে। আমি গ্রেফতার হওয়ার আগে মরে যাচ্ছি। আমি আমেরিকানদের হাতে কখনোই জীবিত ধরা দিচ্ছি না। আমি শহিদ হতে চাই। কখনোই জেলে যেতে চাই না।"

"ও শায়খ! আল্লাহ কখনোই যেন এমন অবস্থা না করেন যে আমার হাতে আপনাকে মারা যেতে হয়। আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুন।"

তারপর শায়খ ওসামা আমার হাতে দুটো বুলেট দিয়ে বললেন, "আজ থেকে এটাই তোমার মিশন। যা বলেছিলাম, এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে অবশ্যই আমাকে হত্যা করবে।"

আমি চলে আসার সময় আমার বুকে পাহাড় সমান দ্বিধা অনুভব করলাম। গ্রেফতার হওয়ার লজ্জা থেকে বাঁচানোর জন্য হত্যা করার পরিস্থিতিটা হয়তো খুবই জঘন্য হবে অথবা হয়তো পরিস্থিতির ভয়াবহতা মাপার দায়িত্ব তিনি আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। কেননা, তিনি আমাকে এ কথাগুলো ছাড়া আর কিছুই বলেননি। এই ঘটনার পর থেকে অ্যালার্ম বাজলেই আমার বুক ধুকপুক শুরু করত। প্রতিমাসেই বেশ কয়েকবার এমন হতো।

কিছু দিন পরেই আমি আমার পুরোনো বন্দুক (এ ধরনের বন্দুক শায়খের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সব সদস্য ব্যবহার করে) আমার এক সহকর্মীকে দিয়ে দিই। তারপর থেকে আমি শায়খের দেওয়া বন্দুক ব্যবহার করা শুরু করি। আমি

সবখানেই এটা ও একটা কালাশনিকভ নিয়ে যেতাম। আমি এ বন্দুকটার নিরাপত্তা নিয়ে এত বেশি চিন্তা করতাম যে আমি এটা কাউকে কখনো রাখতেও দিইনি। আমি প্রতিদিন শায়খের দেওয়া সে দুটো বুলেট চেক করতাম। প্রতিদিন বন্দুকটি মোছার সময় আল্লাহকে বলতাম, "আল্লাহ! আমাকে কোনোদিন যেন এ কাজ করতে না হয়।"

একমাত্র আমিই সেই মোস্ট ওয়ান্টেড মানুষটিকে কোনো বাঁধা ছাড়াই হত্যা করতে পারি যার মাথার জন্য ২৫ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

কিছুদিন পরেই আমি শায়খের হাতে বাইয়াত দিতে গেলাম। শায়খ অবাক হয়ে বললেন, "কিন্তু আবু জান্দাল, এটার তো দরকার নেই এখন।"

পার্থিব দৃষ্টিতে তার জীবন আমার হাতে ছিল। ঠিক এ কারণেই আমি অনেক বেশি ও গভীরভাবে আমার দায়িত্ব নিয়ে ভাবতাম। তার ওপর শায়খ সবসময় বলতেন, "আবু জান্দালের কণ্ঠ না শুনলে আমার নিজেকে নিরাপদ মনে হয় না।"

কয়েক মাসে আগে অতি উৎসাহী এক জিহাদির হাত থেকে শায়খকে রক্ষা করে আমি আলাদা সম্মান অর্জন করি। তার নাম ছিল আবু আশাথা। সে ছিল সুদানী তাকফিরি। সে ১৯৮০'র দশকে আফগান মুজাহিদিনদের সাথে জিহাদে অংশ নিয়েছিল। এখন সে আফগানিস্তানে ফিরে এসেছে। সবাই তার কর্কশ ব্যবহার সম্পর্কে জানত। কম ধার্মিক এমন যে কারো সাথেই সে দুর্ব্যবহার করত। একদিন সে শায়খ ওসামার সাথে দেখা করতে আসে। আমি শায়খের নিরাপত্তাহীন অবস্থায় এমন মুখোমুখি আলোচনা পছন্দ করিনি। আমি শায়খকে বললাম, "শায়খ, আমি আপনার পেছনে থাকি?"

শায়খ বললেন, "না। বাইরে অপেক্ষা করো।"

আমি বাইরে থাকলেও কি-হোল দিয়ে আলোচনার দিকে খেয়াল রাখছিলাম। ওসামা তাকে বিশ্বাস করেননি। হয়তো তাই তিনি তার হাত বন্দুকের ওপর রেখেছিলেন। একসময় আবু আশাথা চিৎকার করে, হাত নাড়িয়ে কথা বলতে থাকে। আমার একসময় মনে হলো, সে হয়তো শায়খের দাঁড়ি ধরে বসবে। আমি দ্রুত ঘরে প্রবেশ করে তাকে মাটিতে ফেলে দিলাম। আমার হাঁটু দিয়ে তার পেট চেপে ধরলাম।

শায়খ বলে উঠলেন, "এ কি! কী করছ তুমি? তুমি তো তাকে মেরেই ফেলবে! ছাড়ো এক্ষুণি।" পরবর্তী সময়ে আমার এ কাজের ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করে শায়খ তাকে বেশ কিছু ডলার দিলেন।

দশ বছর আগে জেদ্দায় আমি দীনের দাওয়াত পাই। তখন থেকেই আমি জিহাদে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখি। আমার স্বপ্ন সত্যিও হয়েছিল কিন্তু আমি কখনোই ভাবিনি যে আমি একদিন বিন লাদেনের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হয়ে উঠছি।

প্রথম অধ্যায় : জিহাদের পথে

বাবার সাথে দ্বন্দ্ব

১৯৭২ সালে সৌদি আরবের জেদ্দায় রেড সী পোর্টে আমার জন্ম। বিন লাদেন পরিবার ও এমন অসংখ্য পরিবারের মতো আমার বাবা আহমদও ষাটের দশকে তার পরিবার নিয়ে ইয়েমেন থেকে চলে আসেন।

আমার বাবা শাবওয়া থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। গ্রেফতার এড়াতে তিনি প্রথমে উত্তর ইয়েমেন পালিয়ে যান। তিনি ছিলেন আরব জাতীয়তাবাদী। স্বাভাবিকভাবে এ কারণেই তিনি জামাল আবদুল নাসেরকে অনেক সম্মান করতেন। এমনকি নিজের চুলও জামালের মতো করে আঁচড়াতেন। আমার মা ছিলেন আমার বাবার কাজিন। এমন বিয়ে করা ছিল আমাদের ঐতিহ্য। আমার মায়েদের পরিবার ছিল শেখ। তাদের গোত্র ছিল ঐতিহ্যবাহী যোদ্ধা গোত্র। তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন।

সেসময় ইয়েমেনি সমাজের অনেক অংশ ছিল। একটা অংশ ছিল সাইয়েদ- তারা ছিল সমাজের নেতা ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ। আরও ছিল কাবিলি—এরা ছিল যোদ্ধা। ফেলাহিনরা ছিল কৃষক ও আখদামরা ছিল চাকর।

আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। আমার বাবা ব্রিটিশদের মেকানিক ছিলেন, পরে তিনি এক ড্যানিশ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ শুরু করেন। সবশেষে তিনি আরবের সেরা কন্সট্রাকশন কোম্পানি 'বিন লাদেন কনস্ট্রাকশন কোম্পানি'তে কাজ শুরু করেন। আমার মা একজন গৃহিনী এবং দশ সন্তানের জননী। আমি ছিলাম জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাই ছোটবেলা থেকেই মা এবং অন্য ভাইবোনদের দেখাশোনা করতে হতো আমাকে। আমার যৌবনে বাবা আমাকে বললেন, "তুমি আমার ছেলে বটে, কিন্তু নিজের দায়িত্ব নিজের কাছে।"

আমাদের দিন ভালোই যাচ্ছিল। বাবা ও চাচার কিছু জমি ছিল। দক্ষিণ সোমালিয়ার কিসমায়োতে তাদের কিছু বিনিয়োগও ছিল। বিশের দশকে আমার দাদা সেখানে যান। সম্পত্তিগুলো আসলে তারই।

আমার বাবা ইউরোপে ছিলেন। তিনি একজন ধার্মিক মুসলিম ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, "আমি সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু সালাত ছেড়ে দেওয়া সহ্য করা যায় না!"

তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন। আমি তাকে ফজরের আগে জায়নামাজ নিয়ে হাঁটতে দেখতাম। তাকে দেখতে মোটেই ধার্মিক মনে হতো না, তার দাঁড়ি ছিল না, তিনি পাগড়ি-থাওব পছন্দ করতেন না। আমি দশ বছর বয়স থেকেই সালাত আদায় করতাম। আমার পক্ষে কোনোভাবেই সালাত ছাড়া সম্ভব ছিল না। স্কুলে সব ছেলেকেই সালাত আদায় করতে হতো। সালাতের সময় সকল দোকান বন্ধ হয়ে যায়, সব গুরুজনরা সালাত পড়তে বলেন।

আমার দেখা প্রথম রাজনৈতিক উত্থান এখনও আমার মনে আছে। সেটা ছিল ১৯৭৯ সালের মক্কার দাঙ্গা। রামাদানের কিছুদিন আগে এ উত্থান হয়। তখন স্কুলের ছুটি চলছিল। আমরা খেলছিলাম, এমন সময় ন্যাশনাল গার্ডের কিছু গাড়ি আসে। স্কুলে আমাদের শিক্ষকরা বলেন, "বিদ্রোহীরা আসলে পথভ্রষ্ট ছিল।" এটার ব্যাপারে আমার বাবার দুই ধরনের মত ছিল। একদিকে তিনি মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-কাহতানি ও জুহাইমান আল-উতাইবিকে সমর্থন করেন, কেননা আরব সরকার আরব জাতীয়তাবাদের ক্ষতি করেছে এবং ব্যাপক দূর্নীতিগ্রস্থ ছিল। আবার তিনি মক্কার মতো পবিত্র স্থানে এ ধরনের সংঘর্ষ সমর্থন করেননি। মক্কা রক্তপাতের জায়গা না।

বাবা সাধারণ মানুষের প্রতি ইসলামি মৌলবাদীদের অবস্থানের বিরোধী ছিলেন। তারা রাস্তায় মানুষকে মেরেধরে মসজিদে পাঠাত, জোর করে দোকান বন্ধ করে দিত। বাবার মনে হতো, মৌলবাদীরা ইসলামের নাম খারাপ করছে। তিনি সৌদি সরকারকে অসম্ভব ঘৃণা করতেন। কারণ, এরা নিজেদেরকেই একমাত্র মুমিন ভাবে, কিন্তু এদের ব্যক্তিগত জীবন মোটেই মুসলিমের মতো না। তিনি কেবল কিং ফয়সালকেই পছন্দ করতেন।

সৌদি আলেমরা যখন ষাটের দশকে নাসেরের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয় তখন তিনি তাদের ওপর প্রচণ্ড ক্ষেপে যান। মুসলিম ব্রাদারহুডবিরোধী অনেক আরব জাতীয়তাবাদী বাবার বন্ধু ছিল।

আমি আর বাবা সারাক্ষণ রাজনীতি ও ধর্ম নিয়েই মেতে থাকতাম। আমাদের সিক্সথ গ্রেডের বইতে অটোম্যান সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের প্রচুর সমালোচনা করা হয়েছে ও সাউদ বংশের যে সাম্রাজ্য, তার প্রশংসা করা হয়েছে। তারা আরব জাতীয়তাবাদীদের প্রচুর সমালোচনা করেছে, বলেছে—তারা নাকি 'মাদকাসক্ত'।

আমার বাবা, যিনি কিনা জীবনে এক ফোঁটা অ্যালকোহলও খাননি এবং আমার মা বাদে অন্য কোনো নারীকে কামনা করেননি, তিনি আমাকে সবকিছু নিয়ে নতুন করে ভাবতে বললেন। স্কুলে-মসজিদে যা বলে, তাই শেষ কথা নয়।

"জীবন সম্পর্কে কী জানো তুমি? কিছুই না। সৌদি রাজপরিবারের বাচ্চারা ঐক্য ও আরব জাতীয়তাবাদ নিয়ে কী জানে? আমরা যুদ্ধ দেখেছি, ওরা দেখেনি।"

তিনি পুরোপুরি ভুল বলেননি। তার সাথে আমার সম্পর্ক ধীরে ধীরে সমস্যা ও শ্রদ্ধার এক মিশ্র, মধুর সম্পর্ক হয়ে উঠতে থাকে। আমি তার কঠিন ব্যক্তিত্ব পছন্দ করতাম, কিন্তু একই সাথে তার কঠিন শাস্তিকে ভয়ও পেতাম। তার সাথে চলতে হলে আপনাকে কষ্ট করতে হবে।

স্কুলে আমি ভালো ছাত্র ছিলাম। জেদ্দা থেকে স্নাতক শেষে এক প্রাইভেট কলেজ থেকে এডমিনিস্ট্রেশনের ওপর ডিপ্লোমা করি। সেসময় বিদেশিরা সরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়তে পারত না। আশির দশকে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান কম ছিল। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই ধর্মীয় রীতি মেনেই চলত। সবখানেই কুরআন শেখানো হতো। কিছু কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠান কিছুটা ভালো ছিল।

আমি ১৯৯০-এ স্নাতক শেষ করি, কিন্তু সৌদিরা আমাকে ডিপ্লোমা দিতে চাচ্ছিল না। কারণ, সৌদিতে আমার থাকার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। সেসময় আমার বাবা ব্যবসার কাজে সোমালিয়ায় ছিলেন।

১৯৯০ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বছর ছিল। সে বছর উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেন এক হয়, সাদ্দাম কুয়েত দখল করে, গাল্ফ যুদ্ধ শুরু হয়। এসব ঘটনার কারণে আমাদের ওপর চাপ বাড়তে থাকে।

অনেক ইয়েমেনি পরিবার পালিয়ে যায়। কিছু প্রতিবেশি ও আমার পরিবারকে দুই বছর লুকিয়ে থাকতে হয়। আমাদের হাতে কোনো কাজ ছিল না, থাকার অনুমতি ছিল না। খুব কঠিন একটা সময় ছিল সেটা আমাদের জন্য। শুধু আমার মা-ই ঘর থেকে বেরোতে পারতেন। কারণ, তিনি নারী। কেউ তাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করত না। মসজিদে যাওয়া বাদে প্রায় পুরোটা সময় আমরা ঘরেই থাকতাম। ইরাকিরা কুয়েত থেকে চলে যাওয়ার পর আমার বাবা ফিরে আসেন সোমালিয়া থেকে। তিনি আসার পর এসব সমস্যা সমাধান হয়। এসব ঘটনার পর আমি সৌদিদের অপছন্দ করা শুরু করি। আমার মনে হতে থাকে, তারা সৎ না। কেবল আলেম ও দাতাসংস্থাগুলোই আমাদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে।

তার কাছের একজনকে ঘুষ দিয়ে আমি একটি আইডি কার্ড জোগাড় করতে পারলাম। আমাদের সাহায্য করেছেন কিং আবদুল্লাহর ভাইয়ের [illegible] আফগানিস্তানে জিহাদ করা মুজাহিদ নায়েফ বিন মাহমুদ বিন আবদুল আজিজ। এ মানে ছিল আমরা মুক্তভাবে চলতে পারব। কিন্তু আমরা কখনোই [illegible] অধিকার পাচ্ছি না। অথচ এ দেশই কিনা একসময় আমাদের হাতে [illegible] শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। সেদিন থেকে সৌদির প্রতি আমার সম্মান অনেকটাই চলে গিয়েছিল।

আফগান জিহাদের বার্তা (১৯৭৯-১৯৮৯)

১৬ বছর বয়সে পৌঁছেই আমি দীনের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে যাই। শাহাদাতের চিন্তায় আমি মরিয়া। আমি আমার বন্ধুদেরকেও বলতাম "আমাকে শহিদ হতেই হবে।" যারা মুসলিমদের ও ইসলামের ভূমি দখল করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদে নামতে চাইলাম আমি। আমার কাছে জিহাদ ছিল সালাত-সিয়ামের মতোই একটা স্তম্ভ।

বলাই বাহুল্য, এ পর্যায়ে আমি আফগানিস্তান ছাড়া আর কোনো পথ দেখতাম না। সেসময় সৌদি সরকারও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় যুবকদের সোভিয়েতবিরোধী জিহাদে অংশ নিতে উৎসাহ দিত। স্কুল-কলেজ, মার্কেট ও মসজিদে জিহাদের জন্য চাঁদা তোলা হতো। মসজিদে মসজিদে জিহাদে জয়ের জন্য দোয়া করা হতো। বড়লোক ব্যবসায়ী, ধনী ব্যক্তি, যুবরাজ, দাতাসংস্থা প্রত্যেকেই সাহায্য করেছে। বসনিয়ার মুসলিমদের সময় সাহায্য আরও বেড়ে যায়। আমার কোয়ার্টারের অনেক ছেলেই আফগানিস্তান চলে যায়। আমি আমার প্রতিবেশীদের বিদায় দিতে এয়ারপোর্টে যাই। আমি তাদের বিদায় দিয়ে বাসায় এসে বসে বসে কাঁদতাম।

মুজাহিদরা যখন ফিরে আসতেন, তাদের বিরাট সংবর্ধনা দেওয়া হতো। সবাই তাদের বিজয়ের গল্প শুনতে চাইত। তারা ছিলেন জাতীয় হিরো। সবাই এমনভাবে তাদের কাছে ঘুরত তারা যেন সাহাবাদের খুঁজে পেয়েছে। এটা একটা জাতীয় ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। অনেক ফ্লাইট ছিল সৌদি থেকে পেশোয়ারে। সেসব এয়ারলিফটে ৭৫% খরচ কমিয়ে দেওয়া হয়। অনেকসময় বাকি ২৫%ও দাতাসংস্থা দিয়ে দিত। পোশাক পর্যন্ত দাতাসংস্থা দিত। বলা যায়, আফগান জিহাদের সমর্থন ছিল জাতীয়, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক।

আমি তখনই চলে যেতাম, কিন্তু আমার বাবা কোনোভাবেই আমাকে যেতে দেননি। তার জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার কারণে তিনি সোভিয়েতের প্রতি দুর্বল ছিলেন। তিনি আফগান-আরব মুজাহিদদের সৌদি ইসলামপন্থীদের মতোই দেখতেন। তাদের প্রতি তার কোনো আস্থা ছিল না। আবার তারা আমেরিকার সাহায্য পাচ্ছিল, এ কারণে বাবা আরও বিতৃষ্ণ হয়ে যান। আমার সাথে তার অনেক তর্ক হতো। তিনি মেরেধরে আমার মুখ বন্ধ করাতেন। তিনি আমাকে বলতেন মুজাহিদিনরা নাকি আসলে আমেরিকা ও সৌদি গোয়েন্দাসংস্থার পুতুল। আমি ভাবতেই পারি না যে মুজাহিদরা পশ্চিমাদের হাতের পুতুল। আমি আমার পাসপোর্ট নিয়ে পালাতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বাবার হাতে ধরা পড়ে যাই। বাবা সেদিন আমাকে মারেননি। হয়তো বয়সের কথা ভেবেছেন, আলোচনার কথা ভেবেছেন।

তিনি আমার দিকে আমার পাসপোর্ট ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "তোমার জিহাদের উৎসাহ ভালো বিষয়। কিন্তু তুমি আমাকে কেবল একটা প্রশ্নের জবাব দাও, কেন আমাদের নেতারা নিজেরা জিহাদে অংশ নেয় না? কেন ওরা মসজিদে সবাইকে জিহাদে যেতে বলে আর তারপর বাসায় গিয়ে ঘুমায়? যদি এর জবাব দিতে পারো তাহলে যেতে পারবে।" আমার কাছে এর জবাব ছিল না। আমি চুপ করে রইলাম।

যদিও আমেরিকার এ অবস্থানটা আপত্তিকর ছিল তবুও আমাদের মধ্যে অনেক তর্ক হতো। এটা সত্য যে, আমেরিকা ওসামা বিন লাদেন ও আফগান মুজাহিদিনদের সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছিল। কিন্তু আমি বেশিই অবুঝ ছিলাম।

তারপরে অনেকদিন ওসামা বিন লাদেনকে নিয়ে প্রচুর মাতামাতি হয়। তিনি আফগানিস্তান থেকে ফিরে এসেছিলেন। ইসলামি পুনর্জাগরণের চিন্তায় বিভোর একদল ছেলেকে নিয়ে কিছু কোর্স পরিচালনা করেন তিনি। আমি এমন দুটো কোর্সে অংশ নিয়েছিলাম. তখন শায়খের সাথে আমার সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। তিনি আফগান জিহাদের জন্য খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। এটা সেসময়কার কথা যখন তিনি সৌদি সরকারের সমালোচনা করা শুরু করেননি। আফগানিস্তানের জন্য অর্থ জোগাড় করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য।

আমি এর আগে আবদুল্লাহ আযযামেরও কয়েকটি কোর্সে অংশ নিই। আফগান জিহাদকে ত্বরান্বিত করাই ছিল এগুলোর উদ্দেশ্য। আবদুল্লাহ আযযাম ছিলেন একজন ফিলিস্তিনি। ওসামা বিন লাদেনের ওপরে তার ব্যাপক প্রভাব ছিল। তারা দুজন মিলে ১৯৮৪ সালে পেশোয়ারে মাকতাব আল-খিদমাত (সার্ভিস ব্যুরো) প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে মূলত সৌদি থেকে আগত মুজাহিদদের অভ্যর্থনা, সহায়তা দেওয়া হতো।

আমি তার বই ও ক্যাসেট নিয়ে ঘুরতাম। তিনি সবসময় জান্নাত, শাহাদাত নিয়ে কথা বলতেন। তিনি মুজাহিদদের কারামত নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি বলতেন, মুজাহিদরা শহিদ হওয়ার সময় কোনো কষ্টই পায় না। জেদ্দায় ফেরত আসা মুজাহিদরাও একই কথাই বলতেন। তারা আফগান জিহাদের অনেক কারামতের কথা শুনেছেন। এক মুজাহিদ নাকি হাতের ইশারায় রুশ হেলিকপ্টার আকাশ থেকে ফেলে দিয়েছিলেন। আমাদের কাছে মনে হতো, সাহাবাদের মতো লোকরাই আফগানিস্তানে ছিলেন। যে সময় সমগ্র বিশ্বে মুসলিমরা মার খাচ্ছিল, সেসময় এদের দেখে আমাদের আস্থা ও বিশ্বাস আবার ফিরে এসেছে। আমাদের মধ্যে এখনো মুজাহিদ আছে, আমরা এখনো লড়াই করতে পারি।

নিদাল নামের একজন ফিলিস্তিনি যুবক ছিলেন। তিনি আমাদের মসজিদে জুমআয় খুতবা দিতেন। বাবা তাকে পছন্দ করতেন। তিনি ছিলেন একজন জাত নেতা। তিনি সবাইকে কেবল জিহাদের ডাকই দিতেন না, বরং নিজে গিয়েও জিহাদ করেছেন। ১৯৯১ সালে নিদাল ও তার কিছু বন্ধু জেদ্দার এক ব্রীজে আমেরিকার সৈন্যদের এক বাসে হামলা করেন। তারপর তিনি গ্রেফতার হয়ে যান। চারবছর সৌদির জেলে আটক থাকার পরে তাকে জর্ডানে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৯১ সালে যখন প্রথম মার্কিন সেনারা সৌদির মাটিতে পা দেয়, সবাই যেন তখন বোবা হয়ে যায়। কিন্তু নিদাল চুপ করে থাকেননি। এতে সৌদির আসল চেহারা বের হয়ে আসে। সৌদি আসলে জিহাদ পছন্দ করে না এবং তারা আমেরিকানদের মুসলিমদের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে যা কিছু দরকার সব করতে প্রস্তুত।

সৌদি সরকারের প্রতি বিন লাদেন ও আলেমদের চ্যালেঞ্জ

১৯৮৯ সালে সোভিয়েত যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দেশীয় অনেক যোদ্ধা নিয়ে দেশে ফিরলেন ওসামা বিন লাদেন। অনেক উলামার সাথেই বিন লাদেনের ওঠাবসা ছিল, যেমন শায়খ মুসা আল-কারনি ও ইয়েমেনি শায়খ আবদুল মাজিদ জিন্দানি।

বিন লাদেন ফিরে আসার পরও এক বছর দেশে কোনো সমস্যা হয়নি। কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতে এক মসজিদে তিনি আলোচনা করতেন। যারা যারা সেসকল আলোচনায় অংশ নিত তারা প্রত্যেকেই দীনের জন্য জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত ছিল। তার কথাগুলোতে অস্পষ্ট কিছু ছিল না। সোজা বাংলায় তিনি উম্মাহর পুনর্জাগরণ চাইতেন। তিনি মনে করতেন জিহাদের মাধ্যমে উম্মাহর হারানো সম্মান ও ক্ষমতা ফিরে আসবে। তিনি মাঝেমধ্যে আমেরিকার পণ্য বয়কটের কথাও

বলতেন। তি
"আলেমরা ব
বিন ল
আরব (বো
অন্যদিকে ১
করা হয়।
১৯৯০
ফোকাস সে
সৌদি
জন্য। বি
মুজাহিদিনদে
মুজাহিদিনদে
জানান। এ
এটা করা
সেক্যুলার,
রিক্রুটমেন্ট
বিন লাদে
বিন
যোদ্ধা প্রস্তু
না, কোনে
লড়ছি। অ
মানু
প্রস্তুত হ
দূতাবাসে
এসে আম
যোগাযোগে
ভাইয়ের
দিয়েছিল।
এ ধরনের

বলতেন। তিনি অন্য উলামাদের সম্মান করতেন। আলোচনায় ছাত্রদেরকে বলতেন, "আলেমরা কথা বলার সময় চুপ থাকবে।"

বিন লাদেন সে সময় কিছুটা মানসিক কষ্টে ছিলেন। আফগানিস্তানে আফগান-আরব (বেশিরভাগ হলো মিশরীয় ও আলজেরিয়ান) সমস্যা ক্রমশ বাড়ছিল। অন্যদিকে ১৯৮৯ সালে পেশোয়ারে শায়খ আবদুল্লাহ আযযামকে তার ছেলেসহ হত্যা করা হয়।

১৯৯০ সালের অগাস্টে সাদ্দাম হুসেইন কুয়েত দখলের পর বিন লাদেনের ফোকাস সেদিকে চলে যায়।

সৌদি সরকার নিজের দেশের ভূমি আমেরিকাকে দেয় কুয়েতে হস্তক্ষেপের জন্য। বিন লাদেন প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে কাফের আর্মি আনার চেয়ে মুজাহিদিনদেরকে দিয়ে কাজ করালে ভালো হবে। সৌদি সরকার চাইলে হাজারো মুজাহিদিনকে এনে কুয়েত থেকে সাদ্দামকে বের করে দিতেও প্রস্তুত আছেন বলে জানান। এভাবে সাদ্দামের হাত থেকে মক্কা-মদিনাও রক্ষা করা যাবে। সত্যি বলতে, এটা করা সম্ভব ছিল। আফগান ফেরত বেকার অনেক মুজাহিদ ছিলেন। সাদ্দামের সেক্যুলার, বাথিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য তো পাকিস্তানের পেশোয়ারে রিক্রুটমেন্ট পর্যন্ত শুরু হয়ে যায়। এদের অনেক বছরের সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল। বিন লাদেন কেবল একটা স্ফুলিঙ্গের কথা বলেছেন।

বিন লাদেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রিন্স সুলতানকে বলেন, "আমি তিন মাসে এক লক্ষ যোদ্ধা প্রস্তুত করে ফেলতে পারব ইনশাআল্লাহ। আপনার কোনো আমেরিকান লাগবে না, কোনো কাফের যোদ্ধা লাগবে না। আমরাই যথেষ্ট ও আমরা দীনের জন্যই লড়ছি। আমরা ইতোমধ্যেই আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েতদের তাড়িয়ে দিয়েছি।"

মানুষ দলে দলে বিন লাদেনের ডাকে সাড়া দিচ্ছিল। আমি নিজে দুই বন্ধুসহ প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম যুদ্ধে যেতে। গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে জেদ্দার কুয়েত দূতাবাসে প্রতি যোদ্ধাকে ৩০০০ দিনার বা ৪০০০ ডলার দেওয়া হবে। কে একজন এসে আমাদের একটা ফরমও দিয়ে যায়। সেটা পূরণ করে দিতে বলে। এটা নাকি যোগাযোগের জন্য দরকার হবে। আমি আফগানিস্তানে লড়াই করা এক সৌদি ভাইয়ের সাথে কাং-ফু শেখা শুরু করি। কুয়েতিরা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প খুলবে বলে কথা দিয়েছিল। সৌদি সরকার কিছু যোদ্ধা নেয়, কিন্তু তারা সব সৌদি নাগরিক। জিহাদে এ ধরনের বৈষম্য দেখে আমি অবাক হয়ে যাই।

খেলা এখানেই শেষ। কয়েকমাস পর কুয়েত দূতাবাস জানিয়ে দেয় যে, আমাদের যেহেতু সরকারি কোনো প্রশিক্ষণ নেই, তাই আমরা এ যুদ্ধে অংশ নিতে পারব না। সৌদি সরকারও ওসামাকে একই ধরনের কথা বলে। তাদের মতে, "সাদ্দামের সেরা, প্রশিক্ষিত আর্মির সামনে ওসামার আর্মি দাঁড়াতেই পারবে না।"

কিন্তু সরকার যুবকদের মধ্যকার জিহাদের উদ্যম থামাতে পারেনি। তারা কাফেরদের মাধ্যমে নিজেদের আত্মরক্ষার বিষয়ে ফতোয়া নিয়ে আসে। শেষমেশ ১৯৯১ সালে শায়খ আবদুল আযিয বিন বায ফতোয়া দেন যে কাফের সেনাবাহিনীকে সাহায্যের জন্য সৌদির মাটিতে ডাকতে সমস্যা নেই। তার মানে আমেরিকার সৈন্য ঢুকতে পারবে সৌদিতে।

বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার জন্য আমি দীনের পড়ালেখা শুরু করি। সেখানে পরিষ্কার বিষয়টি বর্ণিত আছে, নিজেদের পবিত্র ভূমি রক্ষার্থে কাফেরদের সাহায্য নেওয়া নিষিদ্ধ। বলে রাখা ভালো, সুন্নি বা সালাফি না—এমন সবাই সৌদির কাছে অমুসলিম। সিরিয়া ও ইরাকের বাথ পার্টি হলো মুরতাদ ও কাফের।

বিন লাদেন হতাশ হয়ে গেলেন। একদিকে মুজাহিদিনদের না করে দেওয়া হলো, অন্যদিকে আলেমরা তাড়াতাড়ি সরকারের আঁচলে ঢুকে যাচ্ছে।

তিনি আমাদের একদিন বলেছিলেন, তিনি একসময় কিছু উলামার সাথে দেখা করেন। তারা তাকে বলেছিল, "তুমি আমাদের আর কী করতে বলো? আমরা কীভাবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাচ্ছি?" এদের মধ্যে শায়খ মুহাম্মদ সালিহ উসাইমিন নামের একজন আলেম হাত দিয়ে ইশারা করে দেখিয়েছিলেন, "রাষ্ট্রকে না মানলে তারা তোমাকে হত্যা করবে।"

সরকারের বিরুদ্ধে গোপন সমালোচনা, বিরোধিতা শুরু হলো। কিছু উলামা সরকারের বিরুদ্ধে খুতবা দেওয়া শুরু করেছিলেন। বিভিন্ন স্থান থেকে সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা আসতে থাকে।

১৯৯১ সালে সরকারের ভয়াবহ ক্ষমতাচর্চা ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি চিঠিতে স্বাক্ষর করেন চারশ উলামা। তাদের মধ্যে শায়খ সালমান আল-আওদা ও শায়খ সফর আল-হাওয়ালিকে সরকার ১৯৯৪ সালে গ্রেফতার করে।

সরকার থেকে তাদের প্রতি পাঠানো চিঠি দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। তাতে লেখা, "তোমাদের উপদেশ আমাদের লাগবে না!"

অনেক ধরনের আলোচনা-সমালোচনা, প্রশ্ন, তর্ক উঠতে থাকে। কেউ কেউ প্রশ্ন করা শুরু করে, "আহলে সাউদ কি আসলেই রাসুলুল্লাহর ﷺ বংশধর? নাকি

কেবল একটা আরব গোত্র?" একটা বিষয় নিশ্চিত, কানায় কানায় পরিপূর্ণ গ্লাসে এক ফোঁটা পানি দেওয়ার পর সেখান থেকে যেভাবে পানি উপচে বেড়িয়ে আসে, এ ফতোয়ার ইস্যুটি ছিল তেমন এক পানির ফোঁটা।

১৯৯০ সালে ইয়েমেনে বিন লাদেনের কাজকর্ম সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সৌদির অনেক জিহাদিই দক্ষিণ ইয়েমেনে কমিউনিস্টদের সাথে জিহাদ করতে চাচ্ছিল। বিন লাদেনেরও এমন ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি গেলেন উত্তর ইয়েমেনের সানাআয়। সেখানে গিয়ে তিনি দেখা করেন উবাদা আল-ওয়াহিদি নামে এক তরুণ মুজাহিদের সাথে। উবাদা আফগানিস্তানে জিহাদ করেছেন। এছাড়াও তিনি মাকবাল আল-ওয়াদিহির সাথে দেখা করেন। তিনি ছিলেন একজন সালাফি। তিনি সৌদিতে পড়ালেখা করেছেন। তিনি তার অঞ্চলে সহিহ আকিদাহর প্রচার ও সেখানকার শিয়াদের প্রভাবের জবাব দিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মাকবাল দক্ষিণ ইয়েমেনে জিহাদের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু তার আগে উত্তর ইয়েমেনের ওয়াউলিয়াতে প্রশিক্ষণ শিবির করার পরিকল্পনা দেন। তাদের আলোচনা ফলপ্রসূ হয়। বিন লাদেনের দায়িত্ব ছিল যুদ্ধপরিচালনা এবং মাকবাল তৈরি করবে যোদ্ধা।

ক্যাম্প তৈরি হয়। সে ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়েছে এমন কিছু ইয়েমেনির সাথে আমার সৌদিতে দেখা হয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে কিছুদিন পরই মাকবাল, বিন লাদেনের শত্রু হয়ে যান। তিনি ক্যাম্পের ২৫ মিলিয়ন রিয়াল বা সাড়ে ৬ মিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ করেন।

এদিকে সৌদি সরকার কোনোভাবেই সৌদি নাগরিকদের ইয়েমেনের জিহাদে অংশ নেওয়ার পক্ষে সম্মতি দিচ্ছিল না। ফলে শায়খ ওসামার সাথে সরকারের সম্পর্ক আরও খারাপ হয়ে ওঠে।

শেষমেশ ১৯৯২ সালে শায়খ ওসামা বিন লাদেন সৌদি আরব ছেড়ে পাকিস্তান চলে যান এবং সেখান থেকে চলে যান সুদানে। কিন্তু শায়খ সালমান আল-আওদা, সফর আল-হাওয়ালি, নাসির আল-উমরের মতো উলামাদের সাথে তার যোগাযোগ ছিল। তিনি তাদের খুব ভরসা করতেন ও তাদের সাথে সবসময় পরামর্শ করতেন। সোমালিয়ার কাজ তিনি অনেকটাই তাদের পরামর্শ অনুসারে করেছেন।

১৯৯২ সাল থেকে সৌদি সরকার 'ইসলামি রেনেসাঁ'র ওপর প্রবল নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

আমি এসব আলেমদের অনেকের সাথেই সময় কাটিয়েছি। সবচেয়ে বেশি দেখা করতাম শায়খ আল-কারনির সাথে। শায়খ আল-উমর রিয়াদে, শায়খ আল-আওদাহ বুরাইদায় থাকা সত্ত্বেও মক্কার পবিত্র মসজিদগুলোয় গ্রীষ্মের ছুটিতে বা হজের সময় তাদের সাথে আমাদের দেখা হতো।

আমার গোপন রাজনৈতিক কার্যক্রম

১৯৮৮ সাল থেকেই আমি এসব উলামার পক্ষে গোপন রাজনৈতিক কার্যক্রমে জড়িয়ে যাই। আমি সরকারবিরোধী যুবকদের একজন ছিলাম। আমাদের মতোই একজন ছিলেন জর্দানের শায়খ মুহাম্মদ আল-মাক্বদিসী। আমি জেদ্দা ও রিয়াদে প্লেন বা কারে ঘুরে ঘুরে লিফলেট, ক্যাসেট ও বই বিতরণ করতাম। আমি প্রায়ই তিন-চার দিনের জন্য বাসা থেকে বেরিয়ে যেতাম। আমার বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করতেন যে আমি এতদিন কোথায় ছিলাম। আমি বলতাম, বন্ধুদের সাথে ক্যাম্পে।

শায়খ আল-আওদার ক্যাসেট, অন্য সংস্কারপন্থী উলামাদের ক্যাসেট এ পথভ্রষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলছিল। তারা সরকারের অপকর্ম ও তাদের বিরুদ্ধে হওয়া জুলুমের বিরুদ্ধে কথা বলতেন। তারা জেল-জুলুমের ভয় করতেন না।

ইবনে সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বন্ধুর সাথে আমি এসব প্রতিবাদমুখর উলামাদের 'প্রতিরোধের চিঠি' বিলি করতাম। সরকার এ চিঠির প্রতি ভীষণ ক্ষেপে ছিল। ১৯৯১ সালের প্রথমদিকে আমাকে আমার কাজের জন্য ১০০০ রিয়াল বা ২৬০০ ডলার দেওয়া হয়। এ টাকা দিয়ে আমরা চিঠির ১৫০০ কপি তৈরি করি। আমরা পরবর্তী কয়েকদিন সেগুলো মক্কা ও তায়েফে বিলি করি। আমরা কার্টনে 'Islamic Welfare Committee' বা 'Islamic Youth Forum' এর লেভেল লাগিয়ে রাখতাম। গাড়ির পেছনেই সিটেই রাখতাম এসব। যেন পুলিশ ধরলেও মনে করে যে আমরা আসলে কিছু লুকোচ্ছি না। আমাদের কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতাম ওগুলো ইসলামি বই। বাক্সে 'ইসলামি' শব্দটা দেখে তারা আমাদের সালাম দিয়ে ছেড়ে দিত।

মাগরিবের সালাতের পরে চিঠির কপি আমরা বিভিন্ন মসজিদের মেইলবক্সে ও মুসল্লিদের গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন উয়াইপারের নিচে রেখে দিতাম। আমরা সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, স্কলারসহ বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ঘরে বিভিন্ন নিষিদ্ধ বই রেখে আসতাম। তায়েফ ও মক্কার বিভিন্ন সহকর্মীদের সাথে আমরা ভিডিওগুলোর অনেক অনেক কপি বানাতাম।

এসব কাজে অর্থ প্রয়োজন হতো। সে অর্থ জোগাড়ের জন্য আমি জেদ্দা ও রিয়াদে নারীদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দিতাম। এরা বেশিরভাগ ছিলেন ইথিওপিয়ান ও সোমালিয়ান। এরা কাজের জন্য আসা-যাওয়া করতেন। অনেকসময় এয়ারপোর্টে কন্ট্রোল ডেস্কে নিজেকে তাদের স্বামী হিসেবে পরিচয় দিতাম। এ নারীরা আমাকে ডিপার্চার লাউঞ্জে ৫০০ রিয়াল ও প্লেনে ওঠার পর ৩০০০ রিয়াল দিতেন। মোট ১০০০ ডলার। আমি ঝুঁকি নিতে দুইবার ভাবতাম না। জেল-জুলুমকে আমি কখনো ভয় করিনি। আমি হয়তো অস্ত্র বহন করিনি, কিন্তু এ কাজে ধরা খেলে আমাকে কঠিন শাস্তি দিত সরকার। আর সেই শাস্তি হলো আমাকে আমার পৈতৃক দেশ ইয়েমেনে ফেরত পাঠাত। নায়েফ বিন মাহমুদ বিন আল-আযিযের দেওয়া আইডি আমার অনেক কাজে দিচ্ছিল, আমাকে নিরাপত্তা দিচ্ছিল। আসলে সে সময় সরকারের নিরাপত্তাব্যবস্থা অনেক শিথিল ছিল। তখনও ১৯৯৫-এর আক্রমণ হয়নি। সরকারের চোখ ফাঁকি দেওয়া মোটামুটি সহজ ছিল।

বেশিরভাগ আলেম গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার পরে ক্যাসেট, লিফলেট আসত বিন লাদেন ও শায়খ মুহাম্মদ আল-মাসরির কাছ থেকে। আল-মাসরিকেও ১৯৯০ সালে সৌদি সরকার জেলে পাঠিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে তিনি লন্ডনে চলে যান। এ দুজন ছিলেন আমাদের সাহস, উৎসাহ ও গর্ব। শায়খ মাসরি সরকারের ভণ্ডামির বিরোধিতা করতেন। প্রিন্সরা যেভাবে জনগণের টাকা মেরে ছুটি ও ক্যাসিনোতে ফুর্তি করে তার প্রতিও তিনি বিরক্ত ছিলেন।

বিন লাদেনের বার্তাগুলো ছিল সোজাসাপ্টা। তিনি সবাইকেই দাওয়াহ দিতেন। কিং ফাহাদ, শায়খ বিন বাজ থেকে শুরু করে সাধারণ পুলিশকে পর্যন্ত তিনি তার লেখায় সম্বোধন করতেন। লন্ডনে বিন লাদেনের অফিস ছিল। লেখাগুলো সুদান থেকে লন্ডনে আসত ও সেখান থেকে জেদ্দায় ফ্যাক্স করা হতো। বিন লাদেন মুসলিম ভূমিতে আমেরিকার হস্তক্ষেপের কঠোর বিরোধী ছিলেন। তিনি সমাজ ও সেনাবাহিনীর আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন।

আমি বিন লাদেন পরিবারকে আগে থেকে চিনতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে একসময় আমরা বিন লাদেন পরিবারের প্রতিবেশী ছিলাম। আমি তার বড় মেয়েকে চিনতাম। তার নাম ছিল শাহিরা। তিনি মুজাহিদিনদের বড়মাপের সমর্থক ছিলেন। বিন লাদেন সরকারের দোষক্রটি নিয়ে কিছু কথা বললেও এর পতনের কথা বলতেন না সেসময়। আমার এখনো মনে পড়ে, বিন লাদেন তার বাচ্চাদের নিয়ে

জেদ্দার রাস্তায় ঘুরছেন। বিন লাদেন নিজে ড্রাইভ করছিলেন। তার বয়স ছিল তখন ৩৫ এর মতো।

১৯৯২ সাল পর্যন্ত আমি ব্যাপক প্রচারণা চালাতে থাকি। এক পর্যায়ে কিছু আলেম আমাকে বললেন যে আমার নাম বেশি ছড়িয়ে যাচ্ছে, সরকারও আমাকে নজরে রাখছে; আমার উচিত এখন এ কাজ বন্ধ করা। সেসময় আমি কাজ বন্ধ করি। আমার অনেক বন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৯২ সালের শেষের দিকে আমি কিছু দাতাসংস্থায় কাজ শুরু করি। সরকার এদের দিকে অতো নজর দিত না। কিন্তু আমি আমার উদ্দেশ্য ভুলে যাইনি। চাতকপাখির মতো আমি জিহাদের চিন্তায় মগ্ন থাকতাম। এসব গোপন দাওয়াহর কাজ ছিল প্রস্তুতি। আমি এসব কাজ শেষ করে বাসায় এসে ভীষণ উৎফুল্ল থাকতাম, যেন আমি একটা মিশন শেষ করে এসেছি। আমি অন্যপথের মুজাহিদ ছিলাম একটা হাদিস আছে না এ ব্যাপারে? "একটি তির ছোঁড়ার ক্ষেত্রে তিন ধরনের সাওয়াব আছে। একটা সাওয়াব যে তিরটা বানায় তার জন্য, আরেকটা সাওয়াব যে সেটা যোদ্ধা পর্যন্ত নিয়ে যায় তার জন্য, আরেকটি যে ছোঁড়ে তার জন্য।"

দ্বিতীয় অধ্যায় : বসনিয়া, আমার প্রথম জিহাদ

১৯৯৩ সালের এক বিকেলে আমার ফিলিস্তিনি বন্ধু আবু কুতাইবা বলল, চলো, একটা ফিল্ম দেখি। ফিল্মটি ছিল সারাজেভোর একটি যুদ্ধ নিয়ে। মুহাম্মদ আল-হাবিসী এবং আব্বাস আল-মাদানি নামের দুজন বন্ধু সেখানে শহিদ হয়। ফিল্মে যুদ্ধের পর পরই তাদের দুজনের লাশ দেখা যায়। হাবিসির লাশ চেনা যাচ্ছিল না। কিন্তু মাদানিকে দেখে মনে হচ্ছিল সে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। যেন সে ঘুমিয়ে আছে। তারা একসাথে মদিনা থেকে আফগানিস্তানে রওনা দিয়েছিল। সেখানে গিয়ে তারা বিন লাদেনের হাতে বাইয়াত (আনুগত্য শপথ) দেয়। তাদের কাহিনী দেখে আমি কাঁদতে শুরু করি। আমার বন্ধুরা অবাক হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "এত পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হয়েও তুমি কীভাবে কাঁদছ?"

মাদানির হাসি আমার মাথায় যেন তীব্র আঘাত করল। আমি সাথে সাথেই বুঝতে পারলাম মাদানির পথই ছিল সঠিক পথ। আমার সাথে সাথেই শহিদদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহর ﷺ হাদিস মনে পড়ে গেল। তখন থেকে জিহাদ ছাড়া একটা মুহূর্ত আমার কাছে হাজার বছরের মতো মনে হচ্ছিল। এখন আমাকে যেকোনো মূল্যে বসনিয়ায় যেতে হবে।

আমার বন্ধু মারওয়ান আল-আমোদি হঠাৎ একদিন হারিয়ে যায়। তার মাকে কল করার পর জানলাম যে সে কেবল একটি চিঠিই রেখে গেছে। তাতে কেবল এ লেখা ছিল যে, সে জিহাদের রাস্তায় চলে গিয়েছে। আমি নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম। সবাই চলে যাচ্ছে আর আমি কিনা বসে আছি। অথচ মারওয়ান সবসময় আমার চেয়ে কম উৎসাহী ছিল। তার এক মাস পর হঠাৎ আমার অফিসের জানালা দিয়ে কালো শেমাঘ পরা দাঁড়িওয়ালা এক লোককে দেখতে পেলাম। লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছিল। আরে! এ তো মারওয়ান! সেদিন রাতের খাবার খাওয়ার সময় সে আমাকে জানাল যে সে ইরিত্রিয়া যেতে পারেনি।

কিছুদিন পরে মারওয়ান কিছু লোকের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়। এরা বিরাট একটা গেস্ট হাউজ চালায়। এরাই মুসলিম যুবকদেরকে বসনিয়া জিহাদ নিয়ে যাচ্ছিল। অনেকে আবার চেচনিয়া ও সোমালিয়ায়ও যাচ্ছিল। আমি সেদিন রাতে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম।

পরের দিন যখনই বাবা ফজরের সালাত পড়ে শুতে গেলেন সে সময় আমি কিছু বই ও জামাকাপড় প্যাক করে তৈরি হয়ে নিলাম। যাওয়ার আগে ছোট একটি

বার্তা লিখে টেলিভিশনের সাথে লাগিয়ে দিলাম, "আমাকে খোঁজার চেষ্টা করবেন না। চাইলেও খুঁজে পাবেন না।" ১৫ বছর আগে আমি ঘর ছেড়েছি, এখনও আমি জেদ্দায় আমার বাড়ি ফিরে যাইনি।

আগের সব বন্ধুদের সাথে আমি সম্পর্ক ছিন্ন করি। আমি আমার আগের জীবনকে পুরোপুরি ভুলে যেতে চাচ্ছিলাম কারণ আমি জানতাম কেবল এভাবেই আমি আমার বাবার চোখ ফাঁকি দিতে পারব। আমি গেস্ট হাউসে গিয়েই মারওয়ানকে রাজি করানোর চেষ্টা করলাম সে যেন ইরিত্রিয়া না গিয়ে আমার সাথে বসনিয়া যায়।

"সেখানে ফিতনা বেশি হবে", মারওয়ান আমাকে বুঝানোর চেষ্টা করল, "বসনিয়ায় ইউরোপের মেয়েরা আমাদের জন্য বড় ফিতনা হয়ে দাঁড়াবে।" তবে আমি মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম যে, ইরিত্রিয়ার জিহাদ পুরোপুরি ব্যর্থ হতে যাচ্ছে। শেষমেশ সে আমার সাথে বসনিয়া যেতে রাজি হলো।

আমি প্রায় দুই মাসের মতো সেই গেস্ট হাউজে ছিলাম। সেখানে আমার সাথে আবু মুসআব নামে এক ফিলিস্তিনির দেখা হয়। তিনি আমাকে অনেক সাহায্য করেন। তিনি সবেমাত্র বসনিয়া থেকে ফিরেছেন। মাউন্ট ইগমানের যুদ্ধে তিনি হাঁটুতে আঘাত পান। তার প্রতিদিনের কাজে আমি তাকে সাহায্য করতাম। বসনিয়ায় আমি কী কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছি, তার সবগুলোই তিনি আমাকে বলেছেন।

আবু যুবাইর আল-জেদ্দাউয়ি নামের একজন মুজাহিদ গেস্ট হাউজ চালাতেন। আফগান জিহাদে তার শরীরের ডান অংশ প্যারালাইজড হয়ে যায়। তার বাবা তার জন্য বড় এই বাড়িটি রেখে যান। এর আশেপাশে অনেক সুন্দর কিছু বাগান আছে। সেখানে তিনি কিছু ভেড়া পালতেন। আমরা এখন এখানে চারজন থাকি। আমরা খুবই সতর্ক থাকতাম। কারণ সৌদি সরকার জিহাদিদের একেবারেই পছন্দ করত না। আল্লাহর অশেষ রহমত যে, সে সময়ও কিছু দাতাসংস্থা জিহাদের পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিল।

জেদ্দায় অনেক গেস্ট হাউজই খোলা হয়েছিল। তবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো সুযোগ ছিল আমাদেরটাতে। আমরা কেবল জিহাদের জন্য অর্থ সংগ্রহই করতাম না, বরং এখানে সবচেয়ে ভালো দিকটা ছিল আমরা শায়খ ওসামার বার্তা পেতাম। আবু মুসআব জানতেন কীভাবে তরুণদের উৎসাহিত করতে হয়। আমরা

আমি ইয়েমেনের হদিদায় পৌঁছলাম। হাবাদের ইয়েমেনি সীমান্তের সেনাদের কিছু উপঢৌকন দিয়ে আমরা প্রায় দেড় দিন পর পৌঁছলাম। আমার এখন একটি ইয়েমেনি পাসপোর্ট ও বসনিয়ার একটি ভিসা দরকার।

পাসপোর্টের জন্য অনেক ঝামেলা পোহাতে হলো। পাসপোর্ট পেতে চার মাস লাগল। কিন্তু বসনিয়ার ভিসা পেলাম না, তাই তুরস্কের ভিসা জোগাড় করতে হলো। ভিসার জন্য সময় লাগল আরও আট মাস। ইউরোপের কোনো দেশের ভিসা জোগাড় করা ইয়েমেনিদের জন্য বেজায় কঠিন ব্যাপার ছিল। সানাআয় আমার এক বন্ধু ছিল, সে মরক্কোর এক মেয়েকে চিনত, যে কিনা জার্মান দূতাবাসে কাজ করত। আমার ঐ বন্ধু মেয়েটিকে উপহার দিচ্ছিল, যেন মেয়েটিকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু রাষ্ট্রদূত আমাদের পাসপোর্ট দেখে বলল, "এদের দেখে মনে হয় না এরা কেবল কিছুটা ঘোরাঘুরি করতে সেখানে যাচ্ছে।"

ফরাসি দূতাবাসও আমাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল। বসনিয়ায় যাওয়ার আগে আমি পুরো এক বছর হদিদায় ছিলাম। আমার কিছুই করার ছিল না। আমি ইব্রাহিম আল-মাকতারির সাথেই ছিলাম। প্রচুর লোক আমাকে বসনিয়ার পরিবর্তে সোমালিয়া, ইথিওপিয়া বা আফগানিস্তানে যেতে রাজি করানোর চেষ্টা করেছিল, তবে আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল রইলাম। কারণ, বসনিয়া থেকে জীবিত ফিরে আসা মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল খুব কম। আমি আরও শুনেছিলাম যে, সেখানে জিহাদ খুব সুসংগঠিত ছিল। এক বছর অপেক্ষার পর শেষ পর্যন্ত আমি দামেস্কের একটি ফ্লাইটে উঠলাম। ভিসা থাক বা না থাক, সিরিয়া সমস্ত আরব দর্শনার্থীকেই স্বাগত জানিয়েছিল। সেখান থেকে একটি বাসে উঠে আঙ্কারায় এবং এরপর সেখান থেকে একটি ট্রেনে করে ইস্তাম্বুলে যাব। ইস্তাম্বুলে গিয়ে ক্রোয়েশিয়ান ভিসা নেওয়ার চেষ্টা করব।

কিন্তু ইস্তাম্বুলে গিয়ে পড়লাম বড় এক সমস্যায়। আমার টাকা শেষ হয়ে গেছে এবং আমার চিকিৎসার জন্য কাতারে থাকা আবু মুসআবকে ডাকতে হয়েছিল। সে বলেছিল যে, সে আমাকে আরও ২০০০ ডলার পাঠিয়ে দেবে। আমার বন্ধু মারওয়ানও আমাকে ২০০০ ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। মারওয়ান বলেছিল যে সে নিজেই অস্ট্রিয়া চলে যাবে, সেখান থেকে তার বসনিয়ায় যাওয়ার কথা। তার কথা আমার বিশ্বাস হলো না। তাকে আমি মিথ্যাবাদী অপবাদও দিয়েছিলাম। কিন্তু অস্ট্রিয়ায় পৌঁছেই মারওয়ান আমাকে কল করল।

আমি ইয়েমেন থেকে যাত্রা করি ত্বহা আল-আহদা নামে এক ব্যক্তির সাথে। সে মক্কায় থাকত। হুদিদায় থাকাকালীন পুরোটা সময় ধরে আমি তাকে চিনি। সে কট্টর সালাফি। অমুসলিমদের মাঝে থাকা সে খুব অপছন্দ করত। দামেস্কে আমরা আমাদের ক্রোয়েশিয়ান ভিসার জন্য দিন গুনছিলাম। আমি তাকে বললাম, আমাদের হোটেল থেকে বের হয়ে শহরটা একটু ঘুরে দেখা উচিত। ঠিক তখনই আমাদের সমস্যা শুরু হলো।

ত্বহা বলে উঠল, 'রাস্তায় অর্ধনগ্ন মহিলারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই রাস্তা দিয়ে আমি হাটতে পারব না।' আমি যখন নিচে নামলাম, রিসেপশনিস্ট আমাকে দেখে বলল, 'আপনারা কি আদৌও ঘুরতে এসেছেন? আপনার বন্ধু তো সারাদিন তার বেডরুমে পড়ে থাকে।' আমার মনে হচ্ছিল আমরা শীঘ্রই ধরা পড়ে যাব। কিন্তু দুসপ্তাহ পরই আমরা বাসে করে তুরস্কের পথে যাত্রা করলাম।

আমাদের হোস্টেল ছিল আয়া-সোফিয়া মসজিদের কাছাকাছি। একদিন আমরা আমাদের হোস্টেলের দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম বসফরাস প্রণালীর পাশে দাঁড়িয়ে এক কাপল একে অপরকে চুমু খাচ্ছে। এ দেখে ত্বহার মাথা একেবারে বিগড়ে গেল। সে লোকটাকে ধরে মারতে শুরু করে দিল।

ত্বহার আচরণ দেখে আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল। তার এমন আচরণ আমাদের মিশনের জন্যও ক্ষতিকর। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, তাকে ইয়েমেন ফিরিয়ে নিয়ে যাব। ঐ দিনই সন্ধ্যায় আমরা ফ্লাইটে চড়লাম এবং পরদিন সকাল ৭টায় আমরা ইয়েমেন পৌঁছে গেলাম। সেখানে তার বাবার কাছে তাকে দিয়ে এলাম। এই ঘটনা ১৯৯৫-এর শুরুর দিকের। এই ঘটনায় আমার দেড় মাস সময় নষ্ট হলো। আবার বসনিয়া যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত টাকা জোগাড় করতে আমার আরও ছ'মাস লেগে গেল। এক ইয়েমেনি মুজাহিদের সাথে পরিচয় হলো আমার। তিনি বসনিয়ার জিহাদে এক পা হারিয়েছেন। তিনি আমাকে ইস্তাম্বুলের কিছু ভালো লোকের সন্ধান দিলেন। এবার আমি এক ছোট মুজাহিদ গ্রুপের সাথে যাত্রা করলাম। তারা আমাকে তাদের আমির নিযুক্ত করল। আমরা খুব দ্রুতই মধ্যস্থতাকারীদের সংস্পর্শে এলাম, যারা আমাদের ক্রোয়েশিয়ার যাগরেবে যেতে সহায়তা করবে। মধ্যস্থতাকারীরা ছিলেন সিরিয়ান মুজাহিদ যারা ছদ্মবেশে ট্রাভেল এজেন্সি চালাচ্ছিলেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় তারা আমাদের সাথে দেখা করতে এলেন। ক্রোয়েশিয়ার দূতাবাসে ভিসার জন্য আবেদন করার সময় কী বলতে হবে সে-সব

কিছু আমাদের বলে দিলেন। পরদিন দূতাবাসে গিয়ে আমরা বললাম যে আমরা এক সপ্তাহের জন্য যাগরেবে ঘুরতে যাব।

দূতাবাসের করণিক আমাদের বলল, 'আমি আপনাদের ২১ দিন সময় দিচ্ছি।' ইস্তাম্বুলে আমরা আরও তিনজন আরব মুজাহিদের সাথে পরিচিত হলাম। তারা প্রত্যেকে ছিলেন ইয়েমেনি। তাদের একজনের নাম—হাসান আল-খামেরী। পরবর্তী সময়ে ২০০০ সালে এডেনের ইউএসএস কোল হামলায় আল-কায়েদার হয়ে তিনি আত্মঘাতী বোমা হামলা করেন।

যাগরেব এয়ারপোর্টে পৌঁছে আমি ও আমার তিন সাথি বাকি যাত্রীদের আগে নেমে যেতে দিলাম। আমাদের নতুন ইয়েমেনি বন্ধুরাও অপেক্ষা করলেন। আমরা সকলে একসাথে নামলাম। এরপর আমরা পাসপোর্ট কন্ট্রোলে গেলাম। সেখানকার অফিসার আমাদের সাতজনকে দেখে বলল, 'আপনারা আরব না? এদিকে আসুন।'

আমাদের ইয়েমেনি বন্ধুদের গ্রুপের আমির গোপনে আমার হাতে ২০,০০০ ডলার দিয়ে কানে কানে বললেন, 'এটা আপনার সাথে রাখুন।' তার কাছে আগে থেকেই রেসিডেন্সি পারমিট ছিল। তিনি অফিসারকে পারমিটটি দিখিয়ে বললেন যে তিনি ক্রোয়েশিয়ার রাজধানীতে থাকেন এবং বাকি দুজন তার বন্ধু, এখানে বেড়াতে এসেছে। তিনি যাগরেবের এক ইসলামি দাতাসংস্থায় কর্মরত ছিলেন। কিন্তু আমাদের এয়ারপোর্টে চার ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো। এরপর পাসপোর্ট কন্ট্রোলের পরিচালক এসে আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, আমরা আরব কি না। আমি বললাম যে আমরা আরব।

পরিচালক আমাদের বললেন, 'আমার সাথে আসুন।' 'আপনারা এখানে কেন এসেছেন?'

'আমরা পর্যটক, এখানে ঘুরতে এসেছি।'

'অসম্ভব, আপনারা জিহাদি।'

'জিহাদি! আমরা কেন জিহাদি হতে যাব?'

'কারণ, অনেক আরব এখানে আসে কিন্তু আর ফিরে যায় না। আমরা তাদের এখানে আসতে দেখি ঠিকই, কিন্তু কখনো তাদের ফিরে যেতে দেখি না।'

আমি বললাম, 'পরবর্তী ফিরতি ফ্লাইটেই আমি ফিরে যাচ্ছি। গিয়ে সবাইকে আপনাদের এই আচরণের কথা জানাচ্ছি। ক্রোয়েশিয়ার সুনাম মাটিতে মিশে যাবে। আপনারা এভাবে অতিথিদের স্বাগত জানান! আপনাদের আচরণ আমার খুবই বাজে লেগেছে। আমি বেড়ানোর জন্য সাথে করে টাকাও নিয়ে এসেছি!' এ বলে আমি

টেবিলে ওপর ২০,০০০ ডলার ছুড়ে ফেললাম। এ দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। আমার সাথিদের যার সাথে যা টাকা ছিল সব বের করে রাখল। পরিচালক আমাদের জিজ্ঞেস করলেন আমরা কোথায় থাকছি। 'যাগরেবের হোটেল লুবিলিয়ানে উঠছি আমরা। দুই সপ্তাহের মধ্যে আমরা ফিরে যাচ্ছি। আমার কথা বিশ্বাস না হলে আপনি অঙ্গিকারনামায় আমার স্বাক্ষর নিয়ে রাখতে পারেন। আমার তাতে কোনো সমস্যা নেই।'

আমি কাগজে স্বাক্ষর করলাম এবং সেখান থেকে প্রস্থান করলাম। এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। অন্য দলের আমির স্থানীয় লোকজনের মানসিকতা ও রীতিনীতি ভালো করেই বুঝতেন। আমরা ভোর প্রায় তিনটায় হোটেলে এসে পৌঁছলাম। আধঘণ্টা পর রিসেপশনিস্ট দরজায় নক করল। তার সাথে ছিল একটি মেয়ে। মেয়েটির পরনে কেবল পাতলা কাপড়ের নাইটি। বাইরে থেকে সবই দেখা যাচ্ছিল। রিসেপশনিস্ট বলল, 'আপনারা কি আরব?'

'হ্যাঁ।'

'এ বসনিয়ার মেয়ে। সে কি আপনাদের সাথে শুতে পারে?'

'না, ধন্যবাদ। আমরা এইমাত্র ডিস্কো থেকে এলাম। আমরা খুব ক্লান্ত। আজ রাতে আমাদের লাগবে না। আর পরের বার সুন্দরী দেখে একজনকে নিয়ে আসবেন, ঠিক আছে?' আমি চলে আসার আগে আমার বন্ধুর দেওয়া পরামর্শটি আমার মনে পড়ে গেল। তাছাড়া জৈবিক আনন্দের মাঝে ডুবে থাকার ইচ্ছা আমার মোটেও ছিল না। পরদিন আমি এক মধ্যস্থতাকারীকে কল করলাম। তিনি একজন ফিলিস্তিনি চিকিৎসক। তিনি এক ক্রোয়েশিয়ান নারীকে বিয়ে করেছেন। তিনি বিশেষ করে সেসব মুজাহিদ গ্রুপের সাথে কাজ করেন, যারা মাউন্ট ইগমানে লড়াই করতে চায়। ফোনের ওপার থেকে তিনি বললেন, 'কোথায় আপনি? আবু মুসআব আমাকে আপনার ব্যাপারে বলেছেন। তারপর তো অনেকদিন পেরিয়ে গেল। আপনারা কয়জন?'

'আমরা চারজন।'

তিনি আমাদের বসনিয়ার জেনিকাগামী একটি বাসে উঠিয়ে দিলেন। তিনি বাসের ড্রাইভারকে বললেন, 'এরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আরব; ভিআইপি। এদের দিকে খেয়াল রাখবে।' বাসের ড্রাইভারও জিহাদি ছিল। রাস্তাটি কন্ট্রোল পয়েন্টে ভর্তি ছিল। বসনিয়ান এবং ক্রোয়েশিয়ান উভয় কন্ট্রোল পয়েন্ট ছিল। শেষ কন্ট্রোল পয়েন্টে এক পুলিশ বাসে উঠল। ড্রাইভার বলে উঠল, 'এই লোকেরা আরব, এরা মুজাহিদ।'

আমরা ভীষণ ভয়ে ছিলাম। আমাদের পুলিশ ডাকার পর আমরা যখন বাস থেকে নেমে যাচ্ছিলাম তখন আমি ভাবছিলাম, এই তো এখনই আমাদের বিক্রি করে দেবে, এখনই আমাদের ক্রসফায়ারে দেবে। লড়াই করা ছাড়াই খুন হওয়ার লজ্জা কি ডেকে আনা যায়! পুলিশ আমাকে আমার স্যুটকেস খুলতে বলল। আমার বন্ধুদেরও গাড়ি থেকে নামতে বলল। বাস আমাদের রেখেই চলে গেল। পুলিশ আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি মুজাহিদ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি নিজেও মুজাহিদ। আপনারা দেড় ঘন্টার মধ্যেই জেনিকায় পৌঁছে যাবেন।'

কালো পতাকা দেখেই আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা মুজাহিদদের ঘাঁটির কাছেই চলে এসেছি। এক আলজেরিয়ান ভাই গেইট খুলে দিলেন। আমি অল্পক্ষণের জন্য দরজাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। এ দরজাই আমাকে নিয়ে যাবে জীবনের নতুন এক অধ্যায়ে। আমার আরামদায়ক জীবন এখন আমার অতীত। আর আমার ভবিষ্যৎ হলো তা, যার জন্য আমি অপেক্ষার ক্ষণ গুনেছি এত বছর; আল-জিহাদ। আমার স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে। ১৯৯৩-এর গ্রীষ্মে জেদ্দা ছাড়ার পর থেকে ষোলো মাস পেরিয়ে গেল। আমি দরজার যত নিকটে যেতে লাগলাম, ততই যেন একটা নিদারুণ শান্তি অনুভব করতে লাগলাম। হঠাৎ একজন ডাক দিল। দেখেই চিনতে পারলাম, জেদ্দার থাকাকালীন সময়ের এক পরিচিত বন্ধু। আমাকে জড়িয়ে ধরল এবং কানের কাছে নিম্নস্বরে বলল, 'আমাকে আসল নামে এখানে কেউ চেনে না, সবাই ইয়াকুব ডাকে। এখানে সবারই কোনো না কোনো ছদ্মনাম আছে।'

আমার ছদ্মনাম 'আবু জান্দাল'। আমার নতুন পরিচয়।

তৃতীয় অধ্যায় : বসনিয়ায় আমার জিহাদ

১৯৯৫-এর গ্রীষ্মের শুরুর দিকে আমি বসনিয়ার জিহাদে যাই। আমার সাথে ছিল আমার চারজন বন্ধু; আবু মুসআব আল-আদানি, আবু হাতাব আল-ইয়েমেনি, আবু সাঈদ আল-মাদানি, মুরাদ আল-ওয়ালি। জেনিকায় মুজাহিদ ব্রিগেডের হেডকোয়ার্টার ছিল অরওয়াসিচ (Orwasitch) মিলিটারি ক্যাম্পে। সেখানে প্রায় পাঁচশ যোদ্ধা ছিল। তাদের প্রায় অর্ধেক যোদ্ধা আরব উপদ্বীপ থেকে এসেছে। এই ব্রিগেডের নেতৃত্বে ছিলেন একজন আলজেরিয়ান, নাম আবু আল-মাআলি। আমরা আমাদের পাসপোর্ট এবং ব্যক্তিগত জিনিসপত্র উকবা আল-জানুবি নামে এক সৌদির হাতে দিলাম। তিনি আমাদের জিনিসপত্র ঘেঁটে দেখতে দেখতে আমাদের জিজ্ঞেস করলেন যে আমাদের কোনো বিশেষ দক্ষতা আছে কি না। আমাদের টাকা-পয়সা কম্বিনেশন লকওয়ালা একটি সিন্দুকে তুলে রাখা হলো।

আমি জামাআতে ইসলামিয়্যার এক নেতার সাথে দেখা করতে গেলাম। তার নাম ঈসা আল-মাসরি। তিনি ছিলেন মিশরীয়। এর আগে আমি আমার জেদ্দার বন্ধু ইয়াকুবের সাথে কিছুটা সময় কাটালাম।

আল-মাসরি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এখানে কেন এসেছ?'

'বাস্কেটবল খেলতে এসেছি!'

আল-মাসরি মুচকি হেঁসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি আফগানিস্তানে গিয়েছিলাম কি না।

তিনি বললেন, 'কি ছদ্মনাম ব্যবহার করবে?'

'আবু আল-হারিস।'

'এই নামে তো এখানে অনেকে আছে।'

'আবু মুসআব।'

'এই নাম তো আরও বেশি জনপ্রিয়।'

'আমার জন্য একটা ছদ্মনাম ঠিক করে দিন তবে।'

তিনি বললেন, 'আবু জন্দাল।'

এরপর আমাদের একটি গুদামে পাঠানো হলো। সেখানে আমাদের দুই সেট কাপড় এবং কিছু জুতো দেওয়া হলো। অস্ত্র বাদে একজন মুজাহিদের যা কিছু দরকার তা সব দেওয়া হলো।

আমাদের ছোট গ্রুপের মধ্যে কেবল হাতাব আল-ইয়েমেনি আফগানিস্তানে গিয়েছিল। বাকিদের কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। আমাদের দেড় মাসের জন্য আল-ফারুক প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পাঠানো হলো। সেখানে আমাদের টপোগ্রাফি ও রণকৌশল শেখানো হবে। এছাড়াও কীভাবে কালাশনিকভ, রকেট লঞ্চার ও RPGS চালাতে হয়, তাও শেখানো হবে।

আমরা সকলে বাসে বসে গান গাইছিলাম। হঠাৎ একজন প্রশিক্ষক বাসের দরজা হালকা করে খুলে বললেন, 'সবাই বাস থেকে নামো।' আমি তার কথা বলার ধরনেই বুঝতে পারলাম যে, তিনি ফিলিস্তিনি। আরেকজন ফিলিস্তিনি হাসিমুখে বললেন, 'তোমাদের সকলকে স্বাগতম।'

আমি ভাবতে লাগলাম, যুদ্ধের বিষয়ে আমাদের জ্ঞান যে শূন্যের কোঠায় এটা জানার পর তারা আবার আমাদের নিয়ে মজা করবে না তো!

আমাকে যে গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করা হলো তার নেতৃত্বে ছিলেন সাইফ আল-উতাইবি। তিনি যুহাইমান আল-উতাইবির ভাতিজা। ১৯৭৯ সালে যুহাইমান মক্কার মাসজিদ দখল করেছিলেন। ক্যাম্পে আমি একটি পরিচিত মুখ দেখতে পেলাম, জেদ্দার গেস্ট হাউজের নাসের আল-কাহতানি। তার মা এক রাজকন্যা এবং তার তার বাবা আল-কাহতান শেখদের একজন। আমরা চল্লিশজন রিক্রুট ছিলাম, সবাই সৌদি আরবের, আমরা দুজন জন্মগতভাবে ইয়েমেনি। আমাদের প্রশিক্ষক আবু আশাহিদ একজন ফিলিস্তিনি। একজন ইসলামপন্থী হওয়ার পূর্বে তিনি PLO (Palestine Liberation Organisation) এর হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি ক্যাম্পের কমান্ডার ছিলেন। তিনি সাইফ আল-উতাইবিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার সহযোগী কে?'

'এরা সবাই আমার সহযোগী।'

'না, তোমার কেবল একজন সহযোগী দরকার। একজনকে বেছে নাও।'

আর সহযোগীর ভূমিকা আমার কাঁধে এসে পড়ল।

প্রশিক্ষণ দুটি অংশে বিভক্ত ছিল—ধর্মীয় প্রশিক্ষণ এবং সামরিক প্রশিক্ষণ। সূর্যোদয়ের একটু আগে আমরা শারীরিক ব্যয়ামের জন্য একত্রিত হতাম। এরপর সকালের নাস্তা করতাম। নাস্তায় থাকত স্যুপ, লবণ, পেঁয়াজ ও তিন দিনের বাসি রুটি, যা টুকরো করতে আপনার করাত লাগবে। শুক্রবারে আমাদের এক চা-চামচ জ্যাম এবং কিছুটা মাখন দেওয়া হতো। এত কঠোর ডায়েটের ফলে শীগ্রই আমি বুঝতে পারলাম যে, আমি আমার বেল্ট আরও কয়েকধাপ টাইট করতে পারছিলাম।

সকালের নাস্তার পরে বন্দুক ও রকেট লঞ্চার দিয়ে আমাদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। আমরা ম্যাপ রিডিং শিখলাম। রাতে কীভাবে অপারেশন চালাতে হয় এবং কীভাবে বিস্ফোরক ও মাইন নিয়ে কাজ করতে হয় তাও শিখলাম।

প্রশিক্ষণের প্রথম ধাপ শেষ করার পর আমরা গেরিলা রণকৌশলের ওপর দু'সপ্তাহের প্রশিক্ষণ নিলাম এবং আসল গোলাবারুদ ব্যবহার করা শুরু করলাম।

সূর্যোদয়ের পর থেকে দিনকে সালাতের মাধ্যমে ভাগ করা হতো। সালাতের জন্য বিরতি দেওয়া হতো। আমরা গোল হয়ে বসে কুরআন পড়তাম। প্রশিক্ষকরা হৃদয় দিয়ে কুরআন শিখতে আমাদের সহায়তা করতেন। সূর্যাস্তের সময় আমরা রাতের খাবার খেয়ে ফেলতাম। এরপর ধর্মীয় নির্দেশনার জন্য মসজিদে যেতাম। সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে দিনের সমাপ্তি ঘটত। সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্যে প্রায়শই আফগান জিহাদের চলচ্চিত্র বা এক মুজাহিদ কাবুলে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার চলচ্চিত্র অন্তর্ভুক্ত থাকত। শৃঙ্খলা এবং নিয়ম ভঙ্গ করার শাস্তি উভয়ই ছিল কঠোর। প্রশিক্ষকের নির্দেশে তারা আমাদের পুরো ক্যাম্প পাঁচবার দৌড়ে ঘুরে আসার শাস্তি দিত। এই দূরত্ব ছিল প্রায় আড়াই কিলোমিটার।

জামাআতে ইসলামিয়্যাহ পরিচালিত এই ক্যাম্প এর কঠোরতার জন্য পরিচিত ছিল। সৌদিদের দ্বারা পরিচালিত ক্যাম্পগুলো ছিল এর ঠিক বিপরীত। আমার এক বন্ধু একবার বলেছিল, 'আমাদের জন্য এটা ছিল সহজ। কারণ আমরা সৌদিরা ধনী। তুমি যদি শক্তিশালী হয়ে উঠতে চাও তবে আলজেরীয় বা মিশরীয়দের কাছে যাও। তারা জানে জীবন কতটা কঠিন।'

অন্যান্য ক্যাম্পের রিক্রুটরা কেবল ইউনিফর্ম পরেই খুশি হয়ে যেত এবং সম্মুখসমরে প্রেরিত হওয়ার অপেক্ষা করত।

আমার সহযোদ্ধাদের মধ্যে বাহরাইনের রাজপরিবারের এক সদস্য ছিলেন। তার ছদ্মনাম ছিল মুহাম্মদ আল-ফাতিহ। বিভিন্ন জাতীয়তার শতাধিক মুজাহিদদের মধ্যকার পরিবেশ বেশ ভালোই ছিল। ভাষাগত কারণে প্রত্যেক জাতীয়তার মুজাহিদদের আলাদা আলাদা গ্রুপে রাখা হতো। কিন্তু একদিন হঠাৎ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। একজন গুরুত্বপূর্ণ সৌদি আলেম শায়খ মুহাম্মদ বিন জিবরিনের পুত্র আমাদের একটি কোর্স করাতে এসেছিলেন। যাওয়ার সময় তিনি বললেন,

'জিহাদ ফরজ নয়। এটা যথেষ্ট যে কয়েকজন আসলেই জিহাদে অংশগ্রহণ করুক এবং বাকিরা তাদের সাহায্য করার মাধ্যমে জিহাদে অংশ নিক।'

আমরা কিছুটা হতাশ হলাম। মুজাহিদদের এক ব্যারাকে কেন তিনি এমনটা বললেন? বিষয়টা অবাক করার ছিল। আসলে তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তা হলো, আমাদের বেশিরভাগেরই বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত।

প্রশিক্ষণ শেষ হতে হতে আমার মনোবল খুব বেড়ে গেল। আমি সম্মুখসমরে সার্বিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছিলাম।

জিহাদের প্রথম দিনগুলো আজীবন আমার স্মৃতিতে গেঁথে থাকবে। আমরা বাহাত্তর ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ করলাম। আমাদের খাবার এবং পানি শেষ হয়ে গিয়েছিল তিন দিনের শেষে আমাদের আহতের সংখ্যা ছিল আট। কিন্তু আমরা সার্বিয়ানদের পিছু হটতে বাধ্য করলাম।

মুজাহিদদের আরেকটি ব্রিগেড সারাজেভোর অবরোধ ভাঙার জন্য লড়াই চালাচ্ছিল। আমরা বানজা লুকা (Banja Luka) আক্রমণ করতে চেয়েছিলাম, যা সার্বিয়ানদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল কিন্তু যুদ্ধ চলাকালীন আমাদের আমির আল-মুতাতাজ বিল্লাহ আল-মাসরি শহিদ হন। পাঁচ দিন পর আমরা যাভিডেনিচে (Zavidenich) মুজাহিদ ঘাঁটিতে ফিরে যাওয়ার আদেশ পেলাম, এরপর ডিবয় (Diboy) গ্রামে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হলো। এই সময়ে শায়খ আনওয়ার শাবান আল-মাসরির সাথে আবু আল-হারিস আল-লিবি, আবু হামজা আল-জাযেরি, আবু যিয়াদ আল-নাসরি এবং আবু হামাম আল-নাজাশি শহিদ হন। ক্রোয়েশিয়ার সেক্টরে আমাদের দেখতে আসার সময় তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করা হয়।

এক সপ্তাহ পর, ১৯৯৬-এর শুরুতে ডেটন চুক্তি (Dayton Accords) স্বাক্ষরিত হয় এবং আমাদের বসনিয়া ছাড়তে বলা হয়। আমার খুব রাগ হলো. সেরাজেভোতে গিয়ে সেখানে একটি নতুন ব্যাটালিয়ন গঠন করার জন্য বসনিয়ার সেনাবাহিনী আমাকে সিলেক্ট করল। আমি কেবল পাঁচ মাস যুদ্ধ করেছি। চূড়ান্ত লড়াই হয়েছিল বানজা লুকায়। কিন্তু আমরা অতদূর পৌঁছতে পারিনি। আমরা কুচেগোরা (Kuchegora) গ্রাম পর্যন্ত যেতে পেরেছিলাম। আমি চেয়েছিলাম সবার শেষে বসনিয়া ছাড়তে, যাতে মুজাহিদ বাহিনীর পতাকাটি শেষবারের মতো উড়িয়ে যেতে পারি। সে যাত্রা আমরা কতই না কেঁদেছি!

আমরা জেনিকায় পৌঁছার পর একজন এসে আমাকে বলল, 'সব শেষ! ইউনিফর্ম খুলে ফেলো।'

কিন্তু আমি লড়াই ছেড়ে দিতে চাচ্ছিলাম না। যদিও আমাদের নেতারা বলেছিলেন যে বসনিয়ার মুসলিমরা তাদের যথাযথ অধিকার লাভ করেছে, তাই

জিহাদ শেষ। আমি নিজের হাতে গোলোজন শহিদকে কবর দিয়েছি এবং তাদের জন্য কেঁদেছি। তাদের মধ্যে আমার বন্ধু মারওয়ান আল-আমুদি-ও ছিল। সে আমার আগে শহিদ হওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। আমি চেয়েছিলাম কেউ আমাকে কবর দিক। কিন্তু তা হয়নি। বরং আমি তাদের কবর দিলাম। আমি আমার উদ্দেশ্য অপূর্ণ রেখেই বসনিয়া ছাড়তে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার বন্ধু সাওবান আল-আহসায়ী এসে আমাকে বলল, 'আমার কাছে একটি সমাধান আছে। চলো, চেচনিয়ায় যাই।'

আমি গোসল করলাম এবং লম্বা দাঁড়ি ও চুল ছেঁটে ছোট করলাম। আমার সহযোদ্ধারা যখন আমাকে গোসলখানা থেকে বের হতে দেখল, তখনই তারা বুঝতে পারল যে বসনিয়ার জিহাদ আসলেই শেষ।

বসনিয়া ছাড়ার সময় আমার মনে হলো যে, এই উম্মাহর জন্য আমি কিছুই করতে পারিনি। এই অবিলম্বিত প্রস্থান এবং আমার কল্পনার মধ্যে ছিল যোজন যোজনের দূরত্ব। আমি কি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছি? ইসলামের প্রতি আমার ভালোবাসা থেকে আমি যুদ্ধ করেছি। কারণ, সার্বিয়া বসনিয়ানদের ওপর নয়, মূলত বসনিয়ান মুসলিম ও ইসলামের ওপর হামলা করেছিল। ফুয়াদ, মুহাম্মদ বা হামিদ—এমন নাম থাকার কারণে সার্বিয়ানরা তাদের খুঁজে খুঁজে আক্রমণ করছিল। যদিও বসনিয়ার মুসলিমরা তাদের দীন সম্পর্কে খুব কমই জানত। তারা নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দিত, কিন্তু তাদের কেউ কেউ আবার গলায় ক্রুশ ঝুলাত। সার্বিয়ান ছেলেদের সাথে প্রেম করা ছিল বসনিয়ার মুসলিম মেয়েদের কাছে অহংকার করার মতো বিষয়। কিন্তু এসবের কোনো কিছুই সার্বিয়ানদের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করতে পারেনি। সার্বিয়া কেবল মুসলিমদের হত্যা করতে চাইত, এমনকি তারা নামের মুসলিম হলেও। এই যুদ্ধের একটি ভালো দিক হলো, এই যুদ্ধের ফলে অসংখ্য বসনিয়ান মুসলিম ইসলামে ফিরে এসেছে। আগে বলতে গেলে কোনো মহিলাই পর্দা করত না। কিন্তু যুদ্ধের পরে দেখা গেল অনেক পুরুষ লম্বা দাঁড়ি রেখেছে এবং মহিলারা সম্পূর্ণ পর্দা করছে। ইসলামের ভুলে যাওয়া শহিদদের নামে বাচ্চাদের নামকরণ করা হতো। আরব মুজাহিদদের কবরস্থানগুলো হয়ে উঠল পবিত্র স্থান। যদিও আমরা বেশি লড়াই করিনি, কিন্তু আমরা অনুভব করলাম যে আমরা বসনিয়ার মুসলিমদের মধ্যে একটি ইসলামি পুনর্জাগরণে ভূমিকা রাখতে পেরেছি।

বসনিয়ায় অনেকের সাথে আমার পরিচয় হয়। বসনিয়া ছাড়ার আগে এক বসনিয়ান ভাই আমাকে তার বাসায় দাওয়াত দিলেন। তিনি তার ছয় মেয়েকে আমার সামনে উপস্থিত করে বললেন, 'তাদের মধ্য হতে একজনকে পছন্দ করে আপনার

সাথে নিয়ে যেতে পারবেন। বড় মেয়ের বয়স একুশ এবং সবচেয়ে ছোটটির বয়স পনেরো।'

আমি নিজেকে তা থেকে বিরত রাখলাম। জিহাদের পথ আরও অনেক লম্বা।

ডেটন চুক্তির শর্তানুযায়ী মুজাহিদদের তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যেতে হবে। রামাদানের প্রথম দুসপ্তাহ আমি বিহাকে কাটালাম। এরপর যাগরেব থেকে বিমানে উঠে ইস্তাম্বুল ও আম্মান হয়ে সানাআর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এয়ারপোর্টে এক এফবিআই অফিসার আমাকে প্রশ্ন করল, 'আবার যুদ্ধ শুরু হলে কি আপনি আবার আসবেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু সব বর্ডার তো বন্ধ থাকবে।'

'আমরা পায়ে হেঁটে পাহাড় পেরিয়ে আসব।'

শায়খ মুহাম্মদ সালিহ আল-উসাইমিন আমাদের বাড়ি ফেরার ফ্লাইটের খরচ দিলেন। আমাদের প্রত্যেককে অর্থ সরবরাহ করার জন্য সৌদি আরবে অনুদান সংগ্রহ করা হয়েছিল। অর্থের পরিমাণ নির্ভর করত মুজাহিদের জাতীয়তা এবং কতটা আহত হয়েছেন তার ওপর। আমি ৪০০০ ডলার সমমূল্যের অনুদান পেলাম। যা সেসময় মোটামুটি ভালো পরিমাণ অর্থ ছিল।

বসনিয়া ছাড়ার আগে আমি আমার পরিবারের কাছে ফোন করি। মা খুব কাঁদলেন। তিনি মারওয়ানের মৃত্যুর খবর শুনে ভেবেছিলেন আমিও হয়তো মারা গিয়েছি। আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম,

'চিন্তা করবেন না। আমার মতো অকম্মার ঢেঁকিদের কৈ মাছের প্রাণ।'

চতুর্থ অধ্যায় : সোমালিয়ায় টাকার জিহাদ

১৯৯৬-এর বসন্তে আমি সানাআয় ফিরে গেলাম। সেখানে গিয়ে আবদুল আযিয আল-মুকরিনের সাথে দেখা হলো। সে ছিল আরব। বসনিয়ায় তার সাথে পরিচয় হয়। রামাদানের বাকি অংশ এবং ঈদ তার সাথে কাটালাম। আমি এডেনে যেতে চেয়েছিলাম। সেখানে আমাদের পরিবারের ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমার কাজিন ওয়ারদার সাথে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু মুকরিন চেয়েছিল আমরা এখান থেকে সরাসরি সোমালিয়ায় গিয়ে সেখানে জিহাদে যোগদান করব।

সে বলল, 'আরে চেচনিয়ার কথা বাদ দাও। পাশেই সোমালিয়া থাকতে এতদূরে কেন যাচ্ছি।' এ কথাই সে বারবার বলতে লাগল।

মুকরিন বন্ধু হিসেবে খুব ভালো ছিল। সে অত্যন্ত সাহসী ছিল, যার পরিচয় সে আফগানিস্তান ও বসনিয়ায় দিয়েছে।

শেষমেশ ১৯৯৬ সালের জুনে মুকরিন ও আহমেদ আল-বেদানি নামে এক ইয়েমেনি মুজাহিদের সাথে আমি বেরিয়ে পড়লাম সোমালিয়ার উদ্দেশ্যে। অন্যদের কেউ গিয়েছে চেচনিয়ায়, কেউ বা ফিলিপাইনে। হামজা আল-কুয়েতি আমাদের যাত্রার সকল ব্যবস্থা করে দেন। তার সাথে আমার পরিচয় সানাআয়। যাত্রা শুরুর পূর্বে তিনি আমাদের বলেছিলেন যে আমরা যখন নাইরোবিতে রামাদা হোটেলে পৌঁছব, হুজাইফা আল-সোমালি নামের এক লোক আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য একজনকে পাঠাবে। কোনো প্রশ্ন ছাড়াই আমাদের তার সাথে যেতে হবে। পরবর্তী সময়ে আমি জানতে পারি যে হুজাইফা হলেন একজন সোমালিয়। তিনি সানাআয় থাকতেন।

আমি এর আগে কখনো সোমালিয়ায় যাইনি। কিন্তু দাদি এবং বাবার কাছে সোমালিয়ার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি। আমার দাদি ছিলেন সোমালিয়। আমার বাবা ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত সোমালিয়ায় ছিলেন। আমি সেখানকার স্থানীয় ভাষায় কথা বলতে পারতাম। আত্মীয়দের কাছ থেকে এই ভাষা শিখেছিলাম। আমাকে দেখতেও মোটামুটি সোমালিয়দের মতো লাগত।

নাইরোবি এয়ারপোর্টে পৌঁছার পর আমরা এক সমস্যার মুখোমুখি হলাম। একই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলাম ক্রোয়েশিয়ায়। এক মহিলা পুলিশ অফিসার আমাদের কাগজপত্রে স্ট্যাম্প করতে চাচ্ছিল না। আমি কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ

জানালাম এবং একজন ম্যানেজার এল। কিছু কথাবার্তার পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কী চান?'

সে বলল, 'একশ ডলার।'

'না, বিশ।'

'আর মেয়েটার ব্যাপারে কী হবে?'

'মেয়েটাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমার হাতে ছেড়ে দিন।'

আমি তাকে হোটেলের এক ভুয়া নম্বর দিয়ে বললাম সেখানে গিয়ে তাকে ঠিক নিয়ে আসতে।

যেভাবে ঠিক করা হয়েছিল, আমাদের হোটেলে সেই লোক এল। সে দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার ঘাদ অঞ্চলের লুক শহরে যাওয়ার কথা বলল। এটা ছিল ICU (Islamic Courts Union)-এর শক্ত ঘাঁটি। ১৯৯৬-এ ICU-এর ক্ষমতার শিখরে ছিল। আমরা ওগাদেনে ইথিওপিয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়ব। আমাদের লুকে নেওয়ার জন্য যেই বিমানটি ছিল সেটি এত ছোট ছিল যে প্রথম ফ্লাইটে আমাদের কেবল একজনের বসার জায়গা ছিল। আমরা এর জন্য টস করলাম এবং টসে আমি জিতলাম। বিমানে Islamic relief দাতাসংস্থার দুজন সৌদির সাথে আমার পরিচয় হলো। প্রথম যেই প্রশ্নটি তারা আমাকে করল তা হলো, 'তোমার বাবা কী করেন?'

আমি তাদের বললাম, 'আমার বাবার মাংসের বড় ব্যবসা আছে।'

আমি নিজের ব্যাপারে বেশি কিছু বলি না। নিরাপত্তাজনিত কারণে আমি আমার ছদ্মনাম পরিবর্তন করে 'আবু বাশির' রাখলাম।

সোমালিয়ায় পৌঁছার পর একটি ল্যান্ড ক্রুজারে করে আমাকে এক মিলিটারি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হলো। মুকরিন ও আল-বেদানির পৌঁছানোর অপেক্ষায় আমি সেখানে দুই সপ্তাহ ছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই আমি বুঝতে পারলাম যে সোমালি জিহাদিরা মিথ্যে বলছে। সেখানে আসলে কোনো জিহাদ চলছিলই না। ইথিওপিয়ানদের সাথে যে তাদের যুদ্ধ চলছে তা প্রমাণ করার চেষ্টায় তারা বলল যে তারা আমাকে অনেকগুলো অস্ত্র দেখাবে যা কি না তারা শত্রুদের থেকে উদ্ধার করেছে। কিন্তু সেখানে তিনটি নিম্নমানের মিসাইল বাদে আর কিছুই ছিল না। কী হচ্ছে এসব? আমরা আসার আগে তাদের সাথে যখন যোগাযোগ হয়েছিল তখন তারা দাবি করেছিল যে, তারা একদিনের যুদ্ধেই দশ হাজারের বেশি হালকা অস্ত্র জব্দ করেছে।

কোথেকে জব্দ করেছে তারা? তাছাড়া আমি কখনো তাদের প্রশিক্ষণ নিতে দেখিনি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তারা কেবল তায়কোন্দো অনুশীলন করত।

কয়েকদিন পরে বিশ জন ব্যক্তির সাথে আমাদের দেখা করালো। তারা নিজেদেরকে ICU-র সরকারি মন্ত্রী বলে দাবি করছিল। তাদের পরীক্ষা করার জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'যদি একজন সৈন্য মারা যায় তবে কী করেন?'

'তাকে ওখানেই রেখে আসি।'

'আর যদি কোনো সৈন্য আহত হয়?'

'তাকেও রেখে যাই।'

'আহত সৈন্যদের সাথে নিয়ে যান না?'

'না, সাধারণত কোনো এক স্থানীয় এর দায়িত্ব নেয়।'

'সবচেয়ে নিকটে থাকবে শত্রু, কোনো স্থানীয় নয়। শত্রুরা এসে হয় তাকে তুলে নিয়ে যাবে অথবা তার খুলিতে একটি 'ক্ষমার বুলেট' ঢুকিয়ে দেবে।'

এখন আমার কাছে তাদের অপেশাদারত্বের প্রমাণ আছে। কিন্তু এই নাম-কা-ওয়াস্তে মন্ত্রীরা জানত না যে আমি তাদের ভাষা বুঝি। তারা নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল, 'এই লোকগুলোর কাছে কোনো টাকা-পয়সা আছে কি না দেখেছ? এই জিহাদিরা এখন পর্যন্ত তোমাদের কিছু দিয়েছে?'

তারা মনে করেছিল যে আমার কাছে টাকা আছে। কারণ, আমি কয়েকটা ছাগল কিনেছিলাম। কয়েকজন ভিনদেশী মুজাহিদ না খেয়ে মারা যাচ্ছিলেন। সকাল, দুপুর এবং রাত—তাদের খাওয়ার জন্য ছিল কেবল গমের স্যুপ। তাদের বাঁচানোর জন্য আমি ছাগলগুলো কিনেছিলাম।

আমরা তাদের বললাম যে মুসলিমদের ওপর ইথিওপিয়ার আগ্রাসন প্রতিরোধ করার জন্য আমরা ওগাদেনে যেতে আগ্রহী। তারা বলল যে, কেবল আমি যেতে পারব, কারণ আমি কৃষ্ণবর্ণ। তাদের ভাষায় 'জটিলতা এড়াতে' তারা সাদা চামড়ার লোকদের নিতে চায় না। আমি তাদের বললাম, হয় আমরা সকলে যাব অথবা কেউই যাব না।

এক মন্ত্রী আমাদের জিজ্ঞেস করল, আমাদের কাছে টাকা আছে কি-না এবং সোমালিয়ার জিহাদে আমরা কেমন অর্থনৈতিক সহায়তা করতে পারব। আমি প্রত্যুত্তরে বললাম, আমরা এখানে টাকার জিহাদ বা গায়ের রঙের জিহাদ করতে আসিনি। তাদের আচরণ আমার একদম পছন্দ হচ্ছিল না।

সবমিলিয়ে আমি তিন মাস কোনো লড়াই ছাড়া কাটালাম। আমি বললাম যে, এই লড়াইয়ে তাদের উচিত ছাত্রদের, গোত্রের লোকজন ও নেতাদের নিয়ে আসা। আমি বললাম যে, আমরা দেড়শজন অতিরিক্ত মুজাহিদের ব্যবস্থা করতে পারব, অস্ত্র কিনতে পারব, একটি সুষ্ঠু ও সুসংগঠিত জিহাদ পরিচালনা করতে পারব এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলতে পারব। কিন্তু সোমালিয়রা এসবের কিছুই চায়নি, ICU-র আগ্রহ ছিল কেবল টাকা। তারা দাবি করেছিল যে মুজাহিদদের অর্থনৈতিক সহায়তা করার জন্য তাদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্র আছে। কিন্তু যখন আমরা একটি মাদরাসা দেখতে গেলাম তখন তারা বলল যে মাদরাসার অমুক অমুক কাজের জন্য একহাজার ডলার লাগবে, তবে একশ দিলেও চলবে। এটা নিশ্চিত যে আমাদের কাছ থেকে যদি টাকা পায় তবে তা সরাসরি তাদের নিজেদের পকেটে যাবে।

ICU-র নেতাদের মধ্যে ইসলামপন্থী ও গোত্রপ্রধানরা ছিল। তারা একে অপরকে সমর্থন করত সুরক্ষার জন্য এবং সেই সাথে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে। কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের সাথে আমার কথা-কাটাকাটি হয়। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি আল-কায়েদার সদস্য?'

'আমি কোনো সংগঠনের সাথে নেই।'

সোমালিয় ইসলামপন্থীরা আল-কায়েদা সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করত। তারা মনে করত আল-কায়েদা তাদের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক।

সোমালিয়ায় যাওয়ার অনেক আগে এক তরুণ সোমালিয়র সাথে আমার ঝগড়া হয়। সে আরবদের কটূক্তি করছিল। সে বলছিল, 'তারা আফগানিস্তান ও বসনিয়ায় গিয়েছে কোনো পুরস্কারের আশা ছাড়াই।'

আমি তাকে বললাম, 'শহিদ হওয়া আমাদের জন্য সর্বোচ্চ সম্মানের। আরবরা যখন ঐসব জায়গায় জিহাদ করছিল, তখন তুমি তোমার মায়ের বাসায় বাস্কেটবল খেলছিলে। তুমি যেহেতু একটা বুলেটও ফায়ার করোনি তাই শহিদদের ব্যাপারে কথা বলার কোনো অধিকার তোমার নেই।'

আমি অনেক হতাশ হলাম। ICU-র অফিসগুলোয় বড় বড় করে লেখা ছিল 'ইসলাম একমাত্র সমাধান'। কিন্তু আমি প্রতারিত অনুভব করলাম। ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগে তাদের বললাম,

'এ জীবনে তোমাদের আমি ক্ষমা করব না।'

আমি চলে যাওয়ার পর মুকরিন এক ফাঁদে পড়ল। সোমালিয়রা তাকে ঐ সেক্টরের প্রধান নিযুক্ত করার কথা দিয়েছিল। কিন্তু সে বুঝতে পারেনি যে ওগাদেনে

যাওয়ার জন্য ICU-কে টাকা দিতে হবে। দেশের উত্তর-পশ্চিম দিকে যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার রাস্তা তারা অবরুদ্ধ করে রাখত।

সে আটজন সোমালিয়র সাথে বের হয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কেবল দশজনের কাছে কোনোরকম অস্ত্র ও অল্প গোলাবারুদ ছিল। ইথিওপিয়ানরা তাদের জন্য ফাঁদ পাতল এবং মুকরিন সেই ফাঁদে পা দিল। ইথিওপিয়ানদের হাতে সে আটক হলো এবং চার বছরের জেল হলো। পরে তারা তাকে সৌদি আরবে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে গিয়ে সে মুক্তি পায়। আফগানিস্তানে ফিরে যাওয়ার পূর্বে সে কয়েকমাস ইয়েমেনে কাটাল। ২০০০ সালের শুরুর দিকে সে সৌদি আরবে আল-কায়েদার আমির নিযুক্ত হয়। ২০০৪-এ রিয়াদে প্রতিরক্ষা বাহিনীর হাতে সে শহিদ হয়।

কয়েকবছর পর তাজিকিস্তানেও সোমালিয়ার মতো আমি কেবল ডাকাতদের দেখা পেলাম, যারা নিজেদের যোদ্ধা বলে দাবি করত। কিন্তু এই কালিমাময় হৃদয়ের অধিকারী এসব জিহাদিদের কোনোভাবেই আমি প্রকৃত মুজাহিদদের কাতারে রাখব না।

পঞ্চম অধ্যায় : তাজিকিস্তান অভিমুখে

১৯৯৬-এর শরতে ইয়েমেনে পৌঁছেই আমি হাকিম আল-আশসাইয়ির খোঁজ করলাম। বসনিয়া ছাড়ার পর তিনিই আমাদের চেচনিয়া যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাকে পেলাম না। তিনি চেচনিয়া চলে গেছেন। আমি হতাশ হলাম। আমার তখন টাকা-পয়সা নেই, থাকার জায়গা নেই, জিহাদ করতে যাওয়ার মতো কোনো দেশও নেই। যদিও আমি একটি গেস্ট হাউজে বিনা ভাড়ায় থাকতাম, সেখানে আমার খুব একাকী লাগত। পরে আবদুর রহমান আল-লাহজির সাথে আমার পরিচয় ঘটে। তিনি আফগানিস্তানে ইয়েমেনি মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে যুদ্ধ করেছেন। পরবর্তী সময়ে সেনাবাহিনীর একজন অফিসার হিসেবে তার কমিশন হয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি কেন আফগানিস্তানের জিহাদে যাইনি। আফগানিস্তান আমার আগ্রহের স্থান ছিল না। আমার কাছে আফগানিস্তানের লড়াই কেবল এক গৃহযুদ্ধ। পরে তিনি বললেন যে কেউ একজন আমার সাথে দেখা করতে চায়। ঐ ব্যক্তি হল আবু আইয়ুব আল শামরানি। তিনি বসনিয়ায় মুজাহিদ ব্রিগেডের দীনের দায়িত্বে ছিলেন। এক উষ্ণ পুণর্মিলনের পর তিনি আমাকে তার বাড়িতে গিয়ে থাকতে বললেন। তার বাড়িটি ছিল বড় এক ভিলা যা বসনিয়া জিহাদের অভিজ্ঞ মুজাহিদদের আলোচনার স্থানে পরিনত হয়েছিল।

কিন্তু মুসলিম ব্রাদারহুডের এক গ্রুপ পুলিশকে জানিয়ে দিল। তারা পুলিশকে বলল যে সৌদিরা জিহাদি ট্রেনিং ক্যাম্প শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মুসলিম ব্রাদারহুডের লোকেরা প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল, কারণ বসনিয়ায় তারা নিজেদের ব্রিগেড তৈরি করতে পারেনি। সৌভাগ্যবশত, ইব্রাহিম আল সুরি, যিনি USS Cole হামলা করেছিলেন, তিনি আমাদের সতর্ক করে দিলেন এবং পুলিশ আসার পূর্বেই আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম।

আমি হদিদায় এক সপ্তাহ কাটিয়ে সানাআয় ফিরে গেলাম। কিন্তু আমি নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগলাম, আমি সন্দিহান হয়ে পড়লাম এবং এ নিয়ে রাতে কাঁদতাম। আমার মুজাহিদ জীবন কি এখানেই শেষ হয়ে যাবে? আমি জিহাদে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু কীভাবে যাব? সোমালিয়ার জিহাদ শেষ, বসনিয়ারও। কোথায় যাব আমি? পরিচিতি আর কোনো ব্যক্তিও বাকি নেই।

ইতোমধ্যে আমার পরিবার জেনে গিয়েছিল যে আমি দেশে ফিরেছি। আমি বাবাকে ফোন করলাম। তিনি একই সাথে অবাক ও রাগান্বিত হলেন। তিনি বললেন, 'তুমি সোমালিয়ায় কেন গিয়েছিলে?'

'জিহাদ করতে।'

'আল্লাহর দোহাই, তুমি আমাদের থেকে দূরে থাকো।'

সানাআর গেস্ট হাউজে ফিরে দুই ইয়েমেনির সাথে পরিচিত হলাম; আবু সাহিন আল-মাদানি এবং মোহানাদ আল-জাওয়াদি। এক সৌদির সাথেও পরিচয় হলো; সালিম খামদানি, তিনি পরবর্তী সময়ে আমার ভায়রা ভাই হয়েছিলেন। আবু সাহিন শীঘ্রই চেচনিয়ার উদ্দেশ্য চলে যান এবং সেখানে শহিদ হন। মোহানাদ তাজিকিস্তান যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। খামদানি আফগানিস্তানে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন। তিনি তাজিকিস্তান জিহাদের জন্য সৈন্য রিক্রুট নিতে ইয়েমেনে ফিরে এসেছেন।

মোহানাদ শেষমেশ সেখানে গিয়ে তার সাথে যোগ দিতে আমাকে রাজি করিয়ে ফেললেন। সেখানে গিয়ে পৌঁছার দুসপ্তাহ পর তিনি আমাকে ফ্যাক্স করে নিশ্চিত করলেন যে, 'জিহাদের ময়দান এখনো খোলা'। প্রথমে আমার দরকার একটি পাকিস্তানি ভিসা। সানাআয় পাকিস্তানি দূতাবাসে যে অফিসার ভিসার দায়িত্বে ছিল, আমরা তাকে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানালাম। আমরা তাকে আশ্বস্ত করলাম যে আমরা তার দেশে কেবল ঘুরতে যাচ্ছি। আমরা তাকে এক বিলাসবহুল ম্যানশনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম এবং সে কেবল গাড়ি আর টাকা দেখছিল। সম্ভবত সে মনে করেছিল আমরা সামর্থ্যবান তরুণ যারা পাকিস্তানে ঘুরতে যাচ্ছি। আমি ভিসা পেয়ে গেলাম।

১৯৯৬-এর শেষে আমি আবুধাবি এবং মুসকাট হয়ে গাল্ফ এয়ারের বিজনেস ক্লাসে করে করাচীতে যাত্রা করলাম। আমি এমন এক যাত্রাপথ বেছে নিলাম যাতে যাত্রাবিরতি রয়েছে। যাতে করে কোনো সমস্যার মুখোমুখি হলে পালিয়ে যেতে পারি। করাচীতে পৌঁছেই আমি পাকিস্তানি এবং আফগানি পোশাক কিনে নিলাম। এরপর পেশোয়ারের ফ্লাইটে উঠলাম। সেখানে পৌঁছে আমি আবু আইয়ুব আল-কুর্দির সাথে যোগাযোগ করলাম। তিনি আফগানিস্তানে যেতে ইচ্ছুক মুজাহিদদের মধ্যস্থতাকারী। আমার এক ইয়েমেনি বন্ধু আবু দাহাক আল ইয়েমেনি তাকে রেকমেন্ড করেছিল। আমি আফগানিস্তানে চলে গেলাম এবং এক তিউনিসীয় গাইড আমাকে জালালাবাদে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। সেখানে সালিম খামদানির সাথে দেখা হলো এবং আমরা

একত্রে সাযনুর নামক এক গেস্ট হাউজে গেলাম। সেখানে গিয়ে আমরা তাজিকিস্তানে যাচ্ছেন এমন ত্রিশ মুজাহিদের এক গ্রুপের আমিরের সাথে পরিচিত হলাম। এই আমির ছিলেন হামজা আল-ঘামদি, ওসামা বিন লাদেনের খুব কাছের সহযোগী। ১৯৯৬-এর মে মাসে সুদান থেকে ফেরার পর থেকেই তিনি জালালাবাদে থাকছেন। আল-ঘামদি ছিলেন একজন আফগান-আরব। আফগান জিহাদের একজন অভিজ্ঞ মুজাহিদ। তিনি বিন লাদেনের সাথে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন জালালাবাদের অদূরে জাজির যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সুঠাম দেহের অধিকারী এবং একজন ভালো কুস্তিগির। তিনি আফগানিস্তান ভালো করেই চিনতেন। আজ তিনি শায়খ ওসামার পাশেই থাকতেন।

আল-ঘামদি আমাদের তার জন্য দুদিন অপেক্ষা করতে বললেন। তাকে বিন লাদেনের সাথে দেখা করতে যেতে হবে। বিন লাদেন তাকে এবং সাথে আরও কিছু কাছের সহযোগীকে ডেকেছেন সম্প্রতি তার আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা নিয়ে আলোচনা করতে।[২] এই উপলক্ষে আমরা যেসব মুজাহিদ তাজিকিস্তান যাচ্ছি তাদের জন্য বিন লাদেন ৩৫ হাজার ডলার তাকে দিয়েছেন।

পরবর্তীতে আমরা মোল্লা তাজ মুহাম্মদের সুরক্ষায় কাবুলের উত্তরে এক গ্রাম গেলাম। তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা এবং তিনি স্পষ্ট আরবিতে কথা বলতেন। তিনি কমান্ডার সাইয়াফের খুব কাছের ছিলেন। আমরা সেখানে দেড় মাস ছিলাম। এরপর আমরা জাবাল আল-সিরাজে গেলাম। সেখান থেকে পানশির উপত্যকা অতিক্রম করলাম। পানশির উপত্যকা ছিল আহমেদ শাহ মাসউদের[৩] আওতাধীন।

কুন্দুজে আমাদের একটি PIR (Party for Islamic Revival) কেন্দ্রে রাখা হলো। এরপর আমারা ছত্রিশজনের গ্রুপ একটি লরিতে করে ফাইজাবাদে যাত্রা করলাম। সেখানে এক নদীর পাশে আরেক PIR কেন্দ্রে আমরা একমাসের জন্য আমাদের তাঁবু খাটালাম। আমাদের গ্রুপের নাম ছিল 'নর্দার্ন গ্রুপ'। আমাদের গ্রুপের

---

২. বিশ্বজুড়ে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে ১৯৯৬ সালের ২৩ অগাস্ট বিন লাদেন সৌদি আরবের আল-খোবারে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলার সূত্রপাত করেন।

৩. আহমেদ শাহ মাসউদ মূলত মুজাহিদের একজন নেতা ছিলেন, যারা সোভিয়েতদের নাস্তানাবুদ করেছিল। তিনি তালেবানের ইসলামের ব্যাখ্যার বিরোধী ছিলেন। তিনি ১৯৯৬ সালে নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের কমান্ডার হয়েছিলেন এবং আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণের জন্য তার অতীত সহযোদ্ধাদের সাথে লড়াই করেছিলেন।

বেশ কয়েকজন পরবর্তী সময়ে আল-কায়েদার নেতৃস্থানীয় পদ লাভ করে। যেমন ১৯৯৮-এর অগাস্টে নাইরোবির আমেরিকান দূতাবাসে হামলা চালিয়েছিল, আবু উবাইদা আল-মাক্কি ছিলেন তাদের একজন। ২০০০-এ এডেনে USS Cole হামলার পেছনের অন্যতম মাথা ছিলেন আবদুর রহিম আল-নাশিরি। খালিদ আল-জুহানি বিন লাদেনের একজন কাছের সহযোগীতে পরিণত হন।

ফাইজাবাদে আমাদের লরি ছাড়তে হয়। সেখান থেকে পার্বত্য রাস্তা অনুসরণ করে আমরা হাঁটতে থাকি। কোটাল রোক (সাদা পাহাড়) নামক তুষারাবৃত এক শৃঙ্গ বেয়ে উঠতে দুদিন লেগে গেল। এরপরেই আছে ওর্গে (Orge) উপত্যকার দ্রেইজাও (Dreijao) এলাকা। একে আমরা 'মৃত্যুর উপত্যকা' নামে ডাকতে শুরু করলাম। ইতোমধ্যেই তুষারপাত শুরু হয়ে গিয়েছে। শীতকালে রাস্তা পার হওয়া ছিল খুব কঠিন। আমাদের মধ্য হতে আঠারোজন অসুস্থ হয়ে পড়ল। আফগানিরা আমাদের একটি গুদামঘরে থাকতে দিল। ঘরটি খুব তাড়াহুড়ো করে পরিষ্কার করা হয়েছিল। বড় একটি কার্পেটে আমরা সকলে একসাথে ঘুমালাম। আমাদের বিভক্ত অবস্থা ছিল। গ্রুপের অর্ধেক সদস্য এই ঠান্ডায় হেঁটে তাজিকিস্তানমুখী যাত্রা অব্যাহত রাখতে চাচ্ছিল, বাকি অর্ধেক চাচ্ছিল ফিরে যেতে। অসুস্থদের কয়েকজনের চোখ ফুলে গিয়েছিল। ফাঁদ পেতে যা পাখি ধরতাম কেবল তা-ই পুড়িয়ে খেতাম আমরা। গ্রুপের নেতা আবুল ফারুক আল-কুয়েতিকে আমি বললাম কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে যেন তিনি কয়েকদিন অপেক্ষা করেন।

আমাদের তাজিক গাইডদের একজনের আচরণ আমার কাছে একটু অদ্ভুত ঠেকল। সে ছিল বিশ্বাসঘাতক। সে রাশিয়ানদের সাথে যোগাযোগ রাখত। আমাদের রাশিয়ানদের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য রাশিয়ানদের সাথে তার কথা হয়েছিল। রাশিয়ানরা তাকে মাথাপিছু ১ লক্ষ ডলার করে তাকে দেবে। এই কাজ করার জন্য তার আমাদের বড় এক উপত্যকায় নিয়ে যেতে হবে যেখানে রাশিয়ান সৈন্যের এক বড় দল লুকিয়ে অপেক্ষা করবে। মূলত আরেক তাজিক আমাকে তার এই চক্রান্তের বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিল। ঐ তাজিক গাইড আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। কারণ, শৃঙ্গ বেয়ে উঠার সময় আমাদের অসুস্থ সদস্যদের কয়েকজন তাদের খাবার থেকে তাকে দিয়েছিল। বিশ্বাসঘাতকের মুখোশ উন্মোচনের পর অবশেষে আমরা আবার তাজিকিস্তান অভিমুখে যাত্রা শুরু করলাম।

অবশেষে আমরা যখন বর্ডার পার করলাম তখন জানতে পারলাম যে PIR তাজিক সরকারের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সোমালিয় এবং তাজিকরা

তাদের জাতীয়তা নিয়ে গর্বিত। কিন্তু তাদের সাথে আমাদের অভিজ্ঞতা ছিল মন্দ। সোমালিয়রা আমাদের টাকা আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল আর তাজিকরা টাকার জন্য আমাদের বিক্রি করে দিতে চেয়েছিল। এখন আমরা বুঝতে পারলাম যে সোমালিয়ার ICU-এর মতো তাজিক PIR-ও মূলত একটি রাজনৈতিক আন্দোলন, যারা আপোস করতে সবসময় প্রস্তুত। আমরা যেই জিহাদের সন্ধানে ছিলাম, সে জিহাদে তাদের আমাদের আর করার কিছুই ছিল না।

ষষ্ঠ অধ্যায় : বিন লাদেনের সাক্ষাতে

সোমালিয়া ও তাজিকিস্তানে আমি কেবল বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছি। আফগানিস্তানে তারা নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত ছিল। এই হতাশা আমার বিয়ে করার সিদ্ধান্তকে আবার তরতাজা করে তুলল। নিজেকে নিজে বললাম, 'আমি হয় এখন বিয়ে করব অথবা পরে, একমাত্র আল্লাহই জানেন কী হবে।'

জালালাবাদ ফেরার পথে নানগারহার অঞ্চলের কিছু তালেবানের সাথে আমাদের দেখা হলো। তাজিক এবং তাদের আচরণের মধ্যকার বৈসাদৃশ্য দেখে আমরা অবাক হলাম। এক তালেবান চেকপয়েন্টে পৌঁছার পরই তারা আমাদের জিজ্ঞেস করল আমরা আরব কি না। তারা আমাদের দেখে খুশি হলো। আমাদের সাথে আরবিতে কথা বলল। তারা আমাদের আতিথেয়তা প্রদর্শন করল। আমাদের রুটি ও পানি খেতে দিল। এরপর একটি ট্যাক্সি থামিয়ে ড্রাইভারকে বলল, 'এদের জালালাবাদ নিয়ে যাও। আর এদের যদি কিছু হয় তবে তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করব আমরা।' তাজিকদের তুলনায় তালেবানরা অনেক বেশি সুসংগঠিত।

আমরা যেসব ইক্যুইপমেন্ট আফগানিস্তানে নিয়ে যাচ্ছিলাম তার দায়িত্বে সালিম খামদানি এবং হামজা আল-ঘামদির সাথে আমিও ছিলাম। আমরা দুপুরে জালালাবাদ পৌঁছলাম। সেই সময়টা ছিল ১৯৯৭ সালের শুরু, রামাদান মাস শুরুর কয়েকদিন পূর্বে। Islamic Relief দাতাসংস্থার একটি বিল্ডিংয়ে আমরা আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে উঠলাম। আমরা রেডিওতে মোহানাদ আল-জাওয়াদিকে কল করলাম। সে বিন লাদেনের সাথে ছিল। আমি এসেছি শুনে আমার বন্ধু মোহানাদ খুশি হলো এবং আমাকে নিতে চলে এল। আমরা আরব মুজাহিদদের আরেকটি গ্রুপের সাথে এক সেইফ হাউজে থাকছি। ঐ গ্রুপ আমাদের দুসপ্তাহ আগে এসেছে এবং ইতোমধ্যেই বিন লাদেনের সাথে দেখা করেছে। প্রথম দুদিন আমার সাথিদের আলোচনার বিষয় ছিল কেবল শায়খ ওসামা এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত। আমি তাদের আগে থেকেই বলতাম, 'আমাদের কেবল একটিই শত্রু—আমেরিকা।'

তারা জোর দিয়ে বলল, 'তুমি তাহলে একই শত্রুর কথা বলছ।'

আমাদের ধারণা যে মিলে গিয়েছে এ নিয়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম না। মোহানাদ জোর করছিল আমি যেন গ্রুপের বাকিদের নিয়ে বিন লাদেনের সাথে দেখা করতে যাই। সে বারবার বলতে লাগল যে, বিন লাদেন আমাদের তার 'উদ্দেশ্য' খুলে বলতে চান। বিন লাদেন আমাকে দুপুরের খাবারের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু

আমি যেতে চাচ্ছিলাম না। আমি চাচ্ছিলাম না ব্রেইন-ওয়াশড হতে। আমি মোহানাদকে বললাম, 'তাকে ছিল যে আমি তার সাথে দেখা করতে যেতে না পারার জন্য দুঃখিত এবং ছিল যে আমি বিয়ে করতে ইয়েমেনে ফিরে যাচ্ছি।'

কিন্তু শায়খ ওসামা তার দুজন সহযোগীকে পাঠালেন আমার সাথে দেখা করতে। আবু মুহাম্মদ আল-মাসরি ও আসাদ আল-রাহমান আল-মাসরি[৪]। আসাদ আল-রহমান আল-মাসরি রাসুলের ﷺ একটি উক্তি উদ্ধৃত করলেন এবং আমার মনে হলো যে একটি আমন্ত্রণকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত হবে না। আমি বিন লাদেনের সাথে দেখা করতে রাজি হলাম।

পরের দিন একটি টয়োটা পিক-আপ ট্রাক আমাকে 'Star of Jihad' কমপ্লেক্সে নিয়ে গেল। ১৯৯৬-এ সুদান থেকে ফেরার পর আল-কায়েদার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সেখানে তাদের ক্যাম্প স্থাপন করেছেন। তাজিকিস্তান ফেরত গ্রুপের ছত্রিশজনই সেখানে ছিল। বিন লাদেন একটি বড় কাউচের মাঝখানে বসে ছিলেন। তাকে দেখে একটু উৎসুক মনে হচ্ছিল। আমি গিয়ে এক পাশে বসলাম যাতে করে তিনি আমাকে সরাসরি দেখতে না পান। আমি তার চোখে পড়তে চাচ্ছিলাম না। মাঝেমধ্যে বিন লাদেন বলতে লাগলেন,

'যা বললাম বুঝলে তো, আবু জান্দাল?'

অথবা,

'তুমি খেয়াল করেছ, আবু জান্দাল?'

মনে হচ্ছে আমার সাথিরা তাকে আমার ব্যাপারে সব জানিয়ে দিয়েছে।

মোহানাদ আল-জাওয়াদি, সাইফ আল-আদেল ও আবু হাফস আল-মাসরি তার সাথে বসেছিলেন, কিন্তু কেবল বিন লাদেনই কথা বলছিলেন। তিনি আফগানিস্তানের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরেছিলেন। তিনি আরব উপদ্বীপে আমেরিকার হস্তক্ষেপ, আমাদের তেল চুরি করে নেওয়া এবং আমাদের পবিত্র মুসলিম ভূমি দখলের বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন, 'আমেরিকা পৃথিবীর একমাত্র পরাশক্তি হতে পারে কিন্তু তাদের সৈন্যদের মানসিকতা দুর্বল। নিজ ভূমি থেকে এত দূরে এসে যখন তারা যুদ্ধে সহযোদ্ধাদের প্রাণ হারাতে দেখে তখন তারা কেবল ঘরে ফিরে যাওয়ার কথাই চিন্তা করতে পারে। তাদের ক্ষমতা কেবলই মোহ।'

---

৪. মিশরীয় জামাআতে ইসলামিয়ার প্রধান শায়খ উমর আবদুর রহমানের পুত্র। ১৯৯৩ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার হামলার পেছনের মূল হোতা হিসেবে প্রমাণিত হওয়ায় বর্তমানে তিনি আমেরিকায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন।

'আমরা আফগানিস্তানে রুশদের বিরুদ্ধে এবং সোমালিয়ায় আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আমি তোমাদের হলফ করে বলতে পারি যে একজন রুশ সেনা পঁচিশজন আমেরিকান সেনার সমান। রুশদের নিজস্ব আদর্শ আছে, মূল্যবোধ আছে কিন্তু আমেরিকানরা কেবল ছদ্মবেশী। তাদের বেশিরভাগই কেবল পেটের দায়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। শত্রুর মুখোমুখি হলে তাদের মনোবল আর দৃঢ় থাকে না। ইউরোপীয় সেনাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা কঠিন। তোমাদের কি মনে হয়, ইউরোপকে তারা 'Old Continent' কেন বলে? কারণ এটি প্রজ্ঞা পুঞ্জীভূত করেছে।'

এই কারণেই আমেরিকাকে আফগানিস্তানে যুদ্ধে টেনে আনতে আল-কায়েদার নেতারা এতটা ইচ্ছুক ছিলেন। আমেরিকার সেনাবাহিনী দীর্ঘদিনব্যাপী যুদ্ধের জন্য সমর্থ ছিল না। তিনি মাঝেমধ্যেই আমাদের মনোবল ঝালাই করার জন্য শত্রুর দুর্বলতা নিয়ে বক্তব্য রাখতেন। তিনি আমাদের মনে করিয়ে দিলেন যে কুয়েত থেকে ইরাকিদের উচ্ছেদ করার জন্য মুজাহিদ বাহিনী পাঠিয়ে সাহায্য করার অফার সৌদি নেতাদের তিনি দিয়েছিলেন। তিনি সৌদি আলেমদের দুর্বলতা নিয়ে সমালোচনা করতেন, বসনিয়ার জিহাদ এবং সোমালিয়ার অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতেন। অন্যকথায় তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে, সকল বিষয়ে তার জ্ঞান আপ-টু-ডেট।

দুপুরের খাবারের মাঝখানে তিনি জালালাবাদের গভর্নরের সাথে দেখা করতে চলে গেলেন। দুয়েক ঘন্টা পর ফিরে এসে তার অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমা চাইলেন। এরপর আমাকে বললেন,

'আবু জান্দাল, তুমি শেষ কবে আল-কামিদির[৫] শিম খেয়েছ?'

'চার বছর আগে।'

'আচ্ছা...কাল আমরা আল-কামিদি স্টাইল শিম খাব। আমার তিনজন স্ত্রী খুব ভালোভাবে এটা রান্না করতে পারে।'

বিন লাদেনের সাথে এই প্রথম সাক্ষাতগুলো আমাকে তেমন একটা প্রভাবিত করল না। আমাদের গ্রুপের সদস্যরা তার সাধারণ বার্তা এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে 'নতুন জিহাদ'-এর ধারণাটা বুঝতে পারেনি। এমনকি আমাদের কয়েকজন আলোচনা শেষ হওয়ার আগেই চলে গিয়েছিল। আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে আমরা হলাম এমন যোদ্ধা যারা 'শত্রুর মুখোমুখী হয়ে যুদ্ধ করে, একেবারে সামনাসামনি'।

দ্বিতীয় দিন তিনি বুঝিয়ে বললেন আমেরিকার বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ ঘোষণার পেছনে কারণ কি ছিল এবং আমাদের মনে করিয়ে দিলেন যে রাসুল ﷺ অনেক

---

৫. জেদ্দার এক সুপরিচিত রেস্তোরাঁ।

আগেই কাফেরদেরকে পবিত্র আরব ভূমি থেকে উচ্ছেদ করার আদেশ দিয়ে গেছেন। তিনি বললেন কীভাবে তিনি সৌদি রাজপরিবারকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন যে মুসলিমদের উচিত সাদ্দাম হুসেইনের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা যেহেতু সে কুয়েত দখল করেছিল। কিন্তু সৌদি রাজপরিবার তার পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করল এবং বিপরীতে কাফের আমেরিকানদের আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করার অনুমতি দিল।

তৃতীয় দিন তিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে আসন্ন যুদ্ধের ব্যাপারে আমাদের আরও বিস্তারিত তথ্য দিলেন। তার মতে আমরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই যুদ্ধে বিজয় লাভ করতে সক্ষম। তিনি আমাদের ভিডিও এবং বিবিসি ডকুমেন্টারি দেখিয়ে বোঝালেন যে গাফে আমেরিকানদের উপস্থিতি সকল দিক থেকেই ছিল উপনিবেশ। ঐদিন প্রত্যেকে আলাদাভাবে ওসামা বিন লাদেনের সাথে দেখা করল। তিনি আমাকে বললেন,'তোমার মাথার ভিতর কী চলছে?'

'আমার মস্তিষ্ক হতবিহ্বল। আমি অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে চাচ্ছি না।'

'এখানে যা শুনলে তাতে তোমার কী মনে হয়?'

'আপনি যা বলেছেন তার সবকিছুই অত্যন্ত বিশ্বাসজাগানিয়া, এ বিষয়টি আমি লুকোচ্ছি না। কিন্তু শায়খ, একটা বিষয় নিয়ে আমি চিন্তিত। আপনার কাছের লোকেদের মধ্যে আরবের একজনও নেই কেন?'

'তুমি ঠিক বলেছ। আমার চারপাশের বেশিরভাগ ভাইয়েরা মিশরীয় এবং উত্তর আফ্রিকার। এজন্যই আমি তোমাদেরকে আমাদের কাফেলায় যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

আমাদের যে ব্যক্তি স্বাগত জানিয়েছিল সে মিশরীয়, বিন লাদেনের দেহরক্ষী মিশরীয়, যে আমাদের নিতে এসেছিল সে-ও মিশরীয়—এসব আমাকে খুব অবাক করল। বিন লাদেনের আশপাশের লোকেদের মধ্যে কেবল মোহানাদ ছিল ইয়েমেনি। কিছু সময় পূর্বে সে আমাকে বলেছিল যে 'ওসামার চারপাশের মিশরীয়রা হলো হাতকড়ার মতো'। সে বোঝাতে চেয়েছিল যে ওসামাকে তারা নিয়ন্ত্রণ করছে এবং তাকে তাদের কাজের জন্য ব্যবহার করছে। বিন লাদেন বলেছিলেন, 'আমার চারপাশের আল-কায়েদার মিশরীয়রা কাঠের মধ্যে লোহার পেরেকের মতো'।

তিনি একটি প্রচলিত আরব প্রবাদ বলে আমাকে এটি বোঝালেন, 'তোমার ভাই যদি হুমকির মুখে থাকে, তবে সে বীর নয়'। এই কথা দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে মিশরীয়রা আফগানিস্তানে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছিল। তারা বীর

নয়। আসলে তাদের যাওয়ার মতো আর কোনো জায়গা ছিল না যেহেতু তাদের দেশ মিশরে তারা ওয়ান্টেড ছিল। লিবিয়ানদের অবস্থাও একই।

বিন লাদেনের আফগানিস্তানে অবস্থান করার আমন্ত্রণ আমাকে একটু থেমে চিন্তা করতে বাধ্য করল। নিজেকে নিজে বললাম, 'কিছুদিনের জন্য আফগানিস্তানে থেকে যাই না! দেখি কি হয়।' অবশেষে আমি তাকে আমার উত্তর জানালাম, 'আমি আপনার কাছে কোনো নিশ্চিত অঙ্গীকার করব না। আমাকে একজন ভলেন্টিয়ার মনে করুন। কিন্তু আমি এখনও আপনার হাতে বাইয়াত (আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা) দিতে প্রস্তুত নই'।

শায়খ ওসামা গ্রুপের সদস্যদের আল্লাহর আদেশ মেনে চলার এবং আরব উপদ্বীপ থেকে কাফেরদের উচ্ছেদ করার কথা বললেন। তিনি বললেন এটি এমন একটি দ্বীনি দায়িত্ব যা প্রত্যেক মুসলিমের পালনীয়।

শেষে তিনি বললেন কোনো সমস্যা হলে মোহানাদকে জানাতে। কিন্তু এ পর্যায়ে আমরা অনিচ্ছুক ছিলাম। মোহানাদ বোঝাতে চাচ্ছিল যে সে গ্রুপের নেতা। আমরা সন্দেহ করলাম যে সে হয়তো আমাদের সকলের হয়ে বিন লাদেনের হাতে বাইয়াত দিবে। তিন দিন বিন লাদেনের কথা শুনার পর ছত্রিশজনের গ্রুপের মধ্য হতে কেবল সতেরোজন রয়ে গিয়েছিল, বেশিরভাগই আরব উপদ্বীপের বাসিন্দা। বাংলাদেশ, মরক্কো ও তিউনিসিয়া থেকে যে তরুণরা এসেছিল তারা নিজেদের দেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। মোহানাদ এই বলে আত্মপক্ষ সমর্থন করল যে আমরা যারা আরব আছি তাদের উচিত বিন লাদেনের পরিষদে যোগ দেওয়া যাতে করে মিশরীয়রা সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ নিতে না পারে। গ্রুপের বেশিরভাগ সদস্যই মোহানাদকে নিজেদের এবং শায়খ ওসামার মধ্যস্থতাকরী হিসেবে মানতে নারাজ ছিল। আমরা শায়খ ওসামার সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিছু ভাই গিয়ে তাকে 'শর্তসাপেক্ষ আনুগত্য' দিল, অর্থাৎ অন্য কোথাও নতুন করে জিহাদ শুরু হলে তারা সেচ্ছায় সেখানে চলে যেতে পারবে। আর বাকি সকলে বিন লাদেনকে পূর্ণ আনুগত্য দিল।

এই তিন দিনের আলোচনায় বিন লাদেনের সাথে তার সবচেয়ে কাছের সহযোগীরা ছিলেন। আবু হাফস আল-মাসরি, তার সে সময়কার সহকারী প্রধান এবং সাইফ আল-আদেল যিনি 'আবু আবদুল্লাহ' (বিন লাদেন)-এর সুরক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। আল-কায়েদা প্রধানের সবচেয়ে কাছের লোকেরা তাকে এই নাম দিয়েছিল।

আরও উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ আল-মাসরি, অন্যতম প্রধান নেতা এবং হুসসাম আল-দীন; এক সৌদি।

১৯৯৭-এর রামাদানের প্রথম কয়েকদিন আমি গ্রুপের সদস্যদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করলাম। আলোচনায় আমি প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির গুরুত্বের ওপর জোর দিলাম। আমি তাদের বললাম অন্য জায়গার চেয়ে এখানকার প্রশিক্ষণ অনেক ভালো কারণ আল-কায়েদার কাছে উপকরণ এবং জনবল উভয়ই ছিল। তারা জানে কীভাবে অস্ত্র চালাতে হয়। আমরা আল-কায়েদা হাই কমান্ডের মিলিটারি দক্ষতা থেকে উপকৃত হতে পারব। কিন্তু গ্রুপের কয়েকজন তাদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তের ওপর অটল রইল। আমি তাদের কিছু সময় অপেক্ষা করার উপদেশ দিলাম। রামাদান মাস শেষ হলে আমরা ব্যারাকে যেতে পারব এবং বিন লাদেনের ওয়াদাগুলো পরীক্ষা করে দেখতে পারব। সব দেখে শুনে তারপর আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারব।

অবশেষে আমরা তালেবানের সাথে জেনারেল মাসউদের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাজি হলাম। এবং রামাদানের দুদিন পর শায়খ ওসামা আমাদের খোস্তের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

কিন্তু আমি যাওয়ার পূর্বে একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটল যা আমাকে বিন লাদেনের কাছাকাছি নিয়ে এল। রামাদানে সৌদি সরকার পেশোয়ারে কিছু ভাড়াটে সৈন্যের সাথে যোগাযোগ করল এবং তাদের জালালাবাদের 'Star of Jihad' কমপ্লেক্সে হামলা করতে বলল যেখানে বিন লাদেন থাকতেন। এই গ্রুপে কয়েক ডজন আফগান ছিল। তাদের অর্থায়ন করছিল পেশোয়ারের সৌদি দূতাবাস। তাদের কাজ ছিল বিন লাদেনকে বন্দি করা বা হত্যা করা।

সকলে এশার সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। মধ্যরাতে ব্যারাকে তালেবানের সাঁজোয়া গাড়ির শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। তালেবান ব্যারাক আল-কায়েদা ক্যাম্পের পাশেই ছিল। কী হতে চলছে আমরা জানতে পারলাম। বিন লাদেনের মিশরীয় রক্ষীরা আমাদের এখান থেকে পালাতে বলল। তারা আমাদের আরেক বাড়িতে আশ্রয় দিল এবং আমার হাতে একটি কালাশনিকভ ধরিয়ে দিল। আমরা বিন লাদেনকে একটি বড় রুমে রাখলাম এবং অপ্রত্যাশিতভাবেই তাকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব আমার কাঁধে এসে পড়ল। এমন বিপদের সময়েও আমার মস্তিষ্কের স্থিরতা দেখে তিনি আমার প্রশংসা করলেন।

তালেবানের গোয়েন্দা সংস্থা হামলাকারীদের চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের কিছু মারা গিয়েছে বাকিরা আটক হয়েছে। যারা বেঁচে ছিল তাদের মধ্যে ভাড়াটে সৈন্যদের নেতাও ছিল। তালেবান তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাদের নেতা স্বীকার করে যে এই হত্যাচেষ্টার অর্থায়ন করেছে পেশোয়ারের সৌদি দূতাবাস। সে আরও বলে যে সে একাই দু'লক্ষ ডলার পেয়েছে। বিন লাদেনের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সাইফ আল-আদেলও এই জিজ্ঞাসাবাদে উপস্থিত ছিলেন।

রামাদান চলাকালীন সৌদি রাষ্ট্রদূত মোল্লা ইউনিস খালিসের সাথে দেখা করে। মোল্লা ইউনিস খালিস ছিলেন একজন ধর্মীয় নেতা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জিহাদের একজন বিজ্ঞ মুজাহিদ। সৌদি রাষ্ট্রদূত তাকে বিন লাদেন ও তার বাহিনীকে তাদের কাছে হস্তান্তর করতে বলে। শোনা যায় মোল্লা ইউনিস উত্তরে বলেছিলেন,

'আমরা আফগান, আর যদি মক্কার কোনো পবিত্র প্রাণী[৬] এসেও আমাদের নিরাপত্তায় আশ্রয় নেয়, আমরা ঐ প্রাণীকেও তোমাদের কাছে হস্তান্তর করব না! ওসামা আমাদের অতিথি, আমাদের ভাই। তোরখুম কবরস্থান এর প্রমাণ, যেখানে আরব মুজাহিদরা শায়িত আছে।'

রামাদানের পরে শায়খ ওসামা আমাদের এই গল্প শোনালেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,

'তোমার কী মনে হয়, আবু জান্দাল?'

'তাদের বলতে দিন। আরবদের একটি প্রবাদ আছে, "কাজ তা নয় যা তুমি শুনতে পাও, সেটাই কাজ যা তুমি দেখতে পাও" '।

আমার কথা শায়খ ওসামার পছন্দ হলো। এতে আরও বোঝা গেল যে আমরা তার জন্য যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত।

---

৬. হজ্জের শেষে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে ভেড়া কুরবানী দেওয়া হয়।

সপ্তম অধ্যায় : দেহরক্ষী হওয়ার প্রস্তুতি

ঈদের কয়েকদিন পর শায়খ ওসামা আমাকে এবং সাথে আরও কয়েকজনকে খোস্তের 'Jihad Wal' নামক মিলিটারি ক্যাম্পে পাঠান।

আমরা যাওয়ার সময় তিনি আমাদের বললেন, 'যদি তুমি মাথামোটা হও বা খুব বেশি বোঝা বহন করো, তবে তুমি সেখানে টিকতে পারবে না।'

আমি জানতাম তিনি কথাগুলো আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। তিনি হেঁসে বললেন, 'স্বপ্ন দেখতে থাকো!'

আমার 'সিকিউরিটি অফেনসিভ' নামক পঁয়তাল্লিশ দিনব্যাপী একটি কোর্স করার কথা। কোর্সটির ফোকাস ছিল স্পেশাল অপারেশন (গুপ্তহত্যা, কিডন্যাপ) এবং কালাশনিকভ রাইফেল ব্যবহার করে টার্গেট প্র্যাকটিস করা। আমাদের টার্গেটের গায়ে আমেরিকার ইউনিফর্ম থাকত। আমাদের তাদের যানবাহন বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে হতো। আমরা আসল গোলাবারুদ ব্যবহার করতাম। আমাদের প্রশিক্ষকরা সকলে ছিলেন মিশরীয় এবং তাদের নেতৃত্বে ছিলেন সাইফ আল-আদেল। সেখানকার প্রশিক্ষণ বসনিয়ার চেয়ে অনেক ভালো ছিল। এর কারণ সেখানকার অস্ত্রের মান এবং প্রশিক্ষকদের অভিজ্ঞতা। তাছাড়া প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আমাদের হাতে অনেক সময়ও ছিল।

আমরা সার্ভেইলেন্স, টার্গেট সনাক্তকরণ ও তথ্য সংগ্রহের ওপরও একটি কোর্স করেছিলাম। আমাদের শেখানো হয়েছিল কীভাবে দিনে দুপুরে ধরা না পড়ে কোনো ক্যাম্পে প্রবেশ করতে হয়। আমরা সারাদিন কাটিয়ে দিতাম আমাদের টার্গেটের রুটিন সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার জন্য। কখন তারা খাচ্ছে, মসজিদ এবং ক্যান্টিনের অবস্থান কোথায়, খাবার ও ইবাদাতের সময় কতজন গার্ডে থাকে, তারা কীভাবে তাদের ডিউটি বিন্যস্ত করে ইত্যাদি।

অনুশীলন হিসেবে সাইফ আল-আদেল আমাকে বললেন, আমাদের ক্যাম্প থেকে তিন কিলোমিটার দূরের আরেক ক্যাম্প থেকে তিনজন জিহাদিকে কিডন্যাপ করে আনতে। তারা কীভাবে কাজ করে তা বোঝার জন্য আমি ঘন্টার পর ঘন্টা তাদের ব্যারাক পর্যবেক্ষণ করতাম। আমি এক অন্ধকার রাত বেছে নিলাম এবং চারজন সাথি নিয়ে সেখানে গেলাম। আমরা তিনজনকে অপহরণ করলাম এবং মেরে মেরে নতি স্বীকার করালাম। এক সিম্যুলেশন অনুশীলনে আমাকে এক আমেরিকানকে গুপ্তহত্যা করতে হবে, কিন্তু আমার এক সাথিকে বিসর্জন দিতে হবে।

আমি এতে আমি তর্ক জুড়ে দিয়ে বললাম, 'না, আমি এই অপারেশন এখানেই ক্ষান্তি দিচ্ছি। কারণ, আমি আমার এক সাথিকে হারিয়েছি'। আমার এই আচরণের ফলে সাইফ আল-আদেলের নোটিশের দেখা মিলল। আমি পরে এটি তার অধস্তন আসাদ আল-রহমানের[৭] কাছে জানতে পারি। তিনি আমাকে বললেন যে কোর্সের মূল্যায়ন সনদে আদেল আমার ব্যাপারে—'নেতৃত্বের প্রবণতা', 'বিরক্তিকর'—শব্দগুলো লিখেছেন। এটা সত্য যে, কোনো বিষয়ের অধিকতর স্পষ্টতার আবদার রাখার একটি প্রবণতা আমার মধ্যে আছে। যখন কোনো অপারেশনের প্রস্তুতি চলছে তখন এটা আদৌও কোনো প্রত্যাশিত গুণ নয়। অপরদিকে একজন ভালো দেহরক্ষী হওয়ার জন্য আপনার এমন বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরি। প্রশিক্ষণ শেষে আমরা জালালাবাদ ফিরে গেলাম। সেখানে শায়খ ওসামা আমাদের একে একে স্বাগত জানালেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,

'তো...তোমার মাথা কি আগের মতোই বড় আছে?'

'আগে যেমন ছিল তেমনই আছে', আমি বললাম।

আমার সঙ্গীদের কয়েকজন নিজেদের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য তার অনুমতি চাইল।

'আর তুমি, আবু জান্দাল[৮]?'

'আমি ফিরে গিয়ে বিয়ে করতে চাই।'

'তুমি অবশ্যই বিয়ে করবে। কিন্তু আরও কয়েকদিন থাকো, আমার এখন তোমাকে প্রয়োজন।'

শেষমেশ আমাদের গ্রুপের সাতজন সদস্য আফগানিস্তান ছেড়ে চলে গেল।

অবশিষ্ট দশজনকে বিন লাদেন বললেন, 'তোমাদেরকে একটি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে'।

জালালাবাদে আমাদের একটি লিডারশীপ কোর্স শুরু হলো—কীভাবে টার্গেট সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, কীভাবে চেহারার বৈশিষ্ট্য লুকাতে হয়, টার্গেটের আশপাশের ব্যক্তিদের সাথে আচরণ কেমন হতে হয়। আমার ইচ্ছা ছিল ইয়েমেনে ফিরে গিয়ে বিয়ে করতে যাওয়া বা চেচনিয়ায় জিহাদে অংশগ্রহণ করার আগে আল-

---

৭. শায়খ উমর আবদুর রহমানের পুত্র. শায়খ উমর 'দ্য ব্লাইন্ড শায়খ' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯৯৩ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলা চালানোর দরুন আমেরিকায় তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

৮. নাসের আল-বাহরির ছদ্মনাম।

কায়েদা থেকে যতটুকু পারা যায় শিখে নেওয়া এবং নিজের প্রশিক্ষণকে ঝালাই করে নেওয়া। এই নতুন ও কঠিন কোর্সগুলোর মাধ্যমে বিন লাদেন যেন আমাকে পরিপুষ্ট করছিলেন।

কিন্তু এই কোর্সটি কেবল দুসপ্তাহ স্থায়ী হলো। কারণ ১৯৯৭-এর মার্চের শেষে আল-কায়েদার নেতৃত্বকে জালালাবাদ থেকে কান্দাহারে স্থানান্তরিত হতে হয়েছিল। শায়খ ওসামাকে তালেবানের নেতা মোল্লা উমর তাদের ঘাঁটি কান্দাহারে আমন্ত্রণ করেছিলেন। মাসউদের বাহিনী জালালাবাদের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল, তাই তালেবান আল-কায়েদার নেতৃত্বের ওপর আক্রমণের আশঙ্কা করেছিল। বিশেষ করে সৌদিরা চাপ দিচ্ছিল। তারা হতাশ ছিল যে তালেবান বিন লাদেনকে তাদের কাছে হস্তান্তর করবে না। মোল্লা উমর জালালাবাদে বিন লাদেনের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। কারণ, সেখানে বিন লাদেন সকল সংগঠন ও জাতীয়তার লোকদের সাদরে গ্রহণ করছিলেন, যাদের মধ্যে কিছু গোয়েন্দা সংস্থার লোক থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি। সেখানকার চেয়ে কান্দাহার বেশি নিরাপদ।

দুদিন পর হেলিকপ্টারে করে এসে ওসামা সকল পরিবারকে কান্দাহারে স্থানান্তর হতে বললেন। তার নিজের তিনজন স্ত্রী, তাদের সন্তানাদি, আল-কায়েদার বাকি সদস্যদের পরিবার, আবু হাফসসহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সকলে একটি মিলিটারি বিমানে উঠলেন। বিমানটি তালেবান তাকে ধার দিয়েছিল। শায়খ ওসামা গাড়িতে করে যাত্রা করলেন। তাকে এস্কর্ট করার জন্য ছিল তিনটি গাড়ি, যার নেতৃত্বে ছিলেন সাইফ আল-আদেল।

বিমানে এমন একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল যা আল-কায়েদাকে ধ্বংস করে দিতে পারত। বিন লাদেনের দ্বিতীয় পুত্র আবদুর রহমান। বয়স তখন ষোলো। সে হ্যান্ড গ্রেনেডে পূর্ণ একটি বেল্ট পরে ছিল। যাত্রাকালে একটি সেফটি ক্যাচের রিং তার সিটের সাথে আটকে যায়। সৌভাগ্যবশত গ্রেনেড থেকে পিনটি বের হয়ে যায়নি এবং আবদুর রহমান প্রাণপণে সেটি ধরে রেখেছিল। সে আবু হাফসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় এবং কী ঘটছে তা তাকে দেখায়। আবু হাফস এক হাতে গ্রেনেডেটি ধরে স্ট্রাইকার লিভারটি নিচের দিকে শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন। অন্যদিকে আবদুর রহমান তার সিট থেকে রিংটা আলাদা করে নিয়েছিল। সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। তারা একটুর জন্য মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে বেঁচে গেল। বিমানে প্রায় আড়াই'শ লোক ছিল। মূলত বিন লাদেন ও সাইফ আল-আদেল ছাড়া

আল-কায়েদার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা বিমানেই ছিল। যদি গ্রেনেড বিস্ফোরিত হতো তবে সেখানেই আল-কায়েদার সমাপ্তি ঘটে যেত।

কান্দাহারে গিয়ে সব স্থিতিশীল হলে আমি শায়খ ওসামার সাথে আমার পরিকল্পনা নিয়ে কথা বললাম।

'হয় আমাকে বাড়ি ফিরে গিয়ে বিয়ে করতে দিন অথবা আল-ফারুক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিন যাতে সেখানকার প্রশিক্ষকদের সাহায্য করতে পারি। অন্তত সেখানে কিছু অ্যাকশান আছে, কান্দাহার একেবারে শান্ত।'

বিন লাদেন আমাকে খোস্তে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। সেখানে আমি তিন মাস অবস্থান করলাম। সেখানে একটি ডিফেন্সিভ সিকিউরিটি কোর্সের নেতৃত্বে ছিলাম। কোর্সটি ছিল স্লিপার-সেলের সদস্যদের জন্য যারা কোর্স শেষে নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবে। কীভাবে তারা তাদের ক্রিয়াকলাপ লুকোবে; কীভাবে নিরাপদে যাত্রা করতে হয়; নজর এড়ানোর জন্য দাঁড়ি শেভ করে ফেলা; যদি তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বা সার্ভেইলেন্সে রাখা হয় তখন কেমন আচরণ করতে হবে; কীভাবে নিজের বাড়ি, বন্ধু ও সম্পদ সুরক্ষিত রাখতে হয় এগুলো শেখানো হয়েছিল কোর্সে।

নতুন আসা প্রত্যেককে এই কোর্সটি করতে হয় যেখানে তাদের আরও দেখানো হয় কীভাবে কোডেড লেটার লিখতে হয়। সেল বা নেটওয়ার্কের অন্যান্য সদস্যদের সাথে কীভাবে নিরাপদে স্পর্শকাতর তথ্য শেয়ার করার জন্য 'dead drops'* ব্যবহার করতে হয়।

এই কোর্স শেষে আমি কাবুল যেতে চাইলাম নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, যারা রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। শায়খ ওসামা তার আগের অবস্থান পরিবর্তন করে তালেবানদের সাথে আল-কায়েদা বাহিনীর মোবিলাইজেশনের অনুমোদন দিলেন। ১৯৯৬ সালের বসন্তে তিনি যখন প্রথম জালালাবাদে আসেন তখন তিনি কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আরব মুজাহিদদের লড়াইয়ের ধারণার পক্ষে ছিলেন না। তালেবান তাদের পূর্ববর্তী শত্রু সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক

---

*. ডেড ড্রপস হলো বিশেষত্বহীন কিছু স্থান—যেমন কোনো দেওয়ালের আলগা ইট বা কোনো দোকানের একটি বই। এসব জায়গায় কোনো সেলের কোনো সদস্য তথ্য বা টাকা লুকিয়ে রেখে যায় এবং সাধারণ জনগণ বা পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ না করেই অন্য কোনো সদস্য গোপনে সেই তথ্য বা টাকা সংগ্রহ করে।

অবস্থান গ্রহণ করেছে—এমন প্রোপাগাণ্ডা মাসউদপন্থী গ্রুপগুলো সক্রিয়ভাবে ছড়াচ্ছিল।

এই প্রথম লড়াইয়ে আমার অংশগ্রহণ দুসপ্তাহ স্থায়ী হয়েছিল। আমি আবু আল-ফারাজ আল-লিবি[১০] ও হুসসাম আল-মাদানির সাথে ছিলাম। কাবুল থেকে সত্তর কিলোমিটার উত্তরে আর্টিলারিতে আমাকে মোতায়েন করা হয়, সাথে ছিল আটজন সহযোদ্ধা, যাদের একজন ছিলেন আবু হাফস। মাসউদের সৈন্যরা ছিল পেশাদার গেরিলা যোদ্ধা, তালেবানরা যা ছিল না। শত্রুদের অবস্থানে ওপেন ফায়ার করে তালেবানরা আমাদের না জানিয়েই পিছু হটল। এদিকে মাসউদের লোকেরা তাদের পেছন পেছন এগোচ্ছিল। আবু হাফস চিৎকার করে বললেন, 'ট্রাকে উঠে পড়ো, আমরা পিছু হটতে যাচ্ছি।'

আমাদের পিক-আপগুলো আক্রমণের সম্মুখীন হয়। তালেবানরা মনে করেছিল মাসউদ বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আসলে তারা কেবল দ্রাক্ষাক্ষেত্রে পিছু হটেছে আর এখন আমরা এবং তলেবানরা মুখোমুখি। সকলে ফায়ার করতে শুরু করল, কিন্তু তারা আমাদের লাল ও সাদা কেফিয়া দেখে বুঝতে পারল যে আমরা আরব এবং সাদা পতাকা উড়াল। সেসময় তালেবান এবং আল-কায়েদা নেতৃত্বের মধ্যে কোনো সমন্বয় ছিল না। যার ফল ছিল চরম বিশৃঙ্খলা।

লড়াইয়ের ফলাফল ছিল মাসউদের পরাজয়। লড়াই শেষ হবার পর আবু হাফস আমাকে কাবুল ফিরে গিয়ে সেখানকার আবাসিক কোয়ার্টারে ওয়াযির আকাবার খান নামক একটি গেস্ট হাউজের দায়িত্ব নিতে বলেন। সেখানে বেশিরভাগ সময় আমি আহত এবং অসুস্থ লোকেদের দেখভাল করায় ব্যস্ত ছিলাম। মাঝেমাঝে সেখানে সৌদি আরব থেকে ধর্মীয় শিক্ষার্থীরা আসত। তারা মুজাহিদদের ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করত। সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমাকে মুজাহিদদের দৃঢ়পদ রাখতে হতো।

আমি গেস্ট হাউজে কেবল এক মাস ছিলাম। যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আমি অস্থির হয়ে পড়ছিলাম। কিন্তু যতবারই আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছিলাম ততবারই আমাকে কাবুলে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হচ্ছিল। একজন সহযোগী নিয়োগের মাধ্যমে আমি একটি উপায় খুঁজে বের করলাম, যার সাথে আমি রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ করতাম। দুর্ভাগ্যবশত একটি বিস্ফোরিত শেল দ্বারা আমি বাম গোড়ালিতে আহত

১০. আবু আল-ফারাজ আল-লিবি খোস্ত প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের কমান্ডার ছিলেন। ২০০৫ সালে পাকিস্তানে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং গুয়ান্তানামোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

হয়। সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য আমাকে একমাস সময় দেওয়া হয়। কিন্তু আমার আরোগ্যলাভের সময় শেষ হওয়ার আগেই আমি হাসপাতাল ছেড়ে গেস্ট হাউজে এসে পড়ি।

এক বিকেলে আহত ব্যক্তিদের দেখতে বিন লাদেন হাসপাতালে গেলেন। তিউনিসিয়ান ডাক্তারকে তিনি বললেন, 'আপনি তো বলেছিলেন আমাদের সাতজন আহত হয়েছে। এখানে তো কেবল ছয়জন।'

'আরেকজন হয়তো অন্য রুমে আছে।'

ওরা খুঁজে এসে বলল, 'যেই একজন চলে গেছে সে হলো আবু জান্দাল।'

ওসামা পরে গেস্ট হাউজে এলেন যেখানে সিঁড়িতে আমাদের দেখা হয়ে গেল। আমাকে দেখেই তিনি হাসিতে ফেটে পড়লেন। বললেন, 'একে দেখে তো কোনো আহত সৈন্য মনে হয় না। তাকে এখানে থাকতে দাও। সে এই গেস্ট হাউজের নতুন আমির হতে পারে।'

'আমি আপনার কি করেছি যে আপনি আমাকে এই গেস্ট হাউজের আমির করতে চাচ্ছেন? আপনি কি আমার ওপর অসন্তুষ্ট?'

'না, কেবল দুয়েক মাসের জন্য এ কাজ করো। তাতেই হবে।'

কিছু সময় বাদে, যখন আরও আহত লোকদের গেস্ট হাউজে আনা হলো, ওসামা সকলকে খোস্তে স্থানান্তর করার আদেশ দিলেন। এই সুযোগে আমি তাকে আমার পরিকল্পনাগুলো মনে করিয়ে দিলাম।

'আমি এখন সুস্থ। দাঁড়াতে পারব।'

'না, তুমি আহত।'

'আমি যুদ্ধের ময়দানে যাই এমনটা আপনি কেন চাচ্ছেন না?'

'তুমি এখনো অসুস্থ। তাছাড়া কান্দাহারে তোমাকে আমাদের দরকার। নিজের যত্ন নাও।'

আমি কাঁদতে শুরু করলাম। আমি অনুভব করতে শুরু করলাম যে যুদ্ধের ময়দানে আমাকে হয়তো তার আর দরকার নেই। সময়টা ছিল ১৯৯৮-এর রামাদানের ঠিক পূর্বে। আমি তাকে বললাম,

'আমাকে আমার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিন।'

'আচ্ছা, সমস্যা নেই। তুমি আমাদের সাথে কান্দাহারে ফিরে যাবে। আরেকটু অপেক্ষা করো।'

কান্দাহারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বে তিনি আমাকে আবু আত্তার[১১] সাথে নতুন রিক্রুটদের প্রশিক্ষণ দিতে বললেন। আমি কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করলাম। কিন্তু রামাদানের শুরুতে পালিয়ে কান্দাহার চলে গেলাম। আমি ওসামার সাথে দেখা করলাম এবং সাফ সাফ বললাম,

'আমি ইয়েমেনে ফিরে যেতে চাই'।

'আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু রামাদান মাসটা আমাদের সাথে থাকো। এরপর তুমি সানাআয় চলে যেও'।

'ঠিক আছে'।

আবু আত্তাকে খোস্তে ফেলে এসেছি বলে অসন্তোষ প্রকাশ করতে সে-ও একই সময় কান্দাহার এসে পৌঁছল। আমি বললাম, 'আচ্ছা, আমি ফিরে যাচ্ছি কিন্তু রামাদানের পরে'।

আমি খোস্তের জিহাদ ওয়াল ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। সেখানে আমি এবং আবু আত্তা বিস্ফোরকের ব্যবহার নিয়ে একটি কোর্স পরিচালনা করলাম। আমি নতুনদের আল-কায়েদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবহিত করলাম, যদিও আমি নিজে তখনও এই সংগঠনের সদস্য ছিলাম না। আমার তখনও বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ইচ্ছা ছিল জিহাদের ময়দানে গিয়ে জিহাদ করে শহিদ হওয়ার। এ কারণে আমি এই উপসংহারে পৌঁছলাম যে আমার ইচ্ছা পূরণের জন্য চেচনিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আফগানিস্তানে আল-কায়েদা কমান্ডাররা পিছু হটতে খুব আগ্রহী ছিল এবং তা আমার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। আমি হতাশ হয়ে পড়লাম।

সারা রামাদান মাস জুড়ে আবু আত্তা আমাকে থাকাতে রাজি করানোর চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, 'জিহাদ মানে কেবল শহিদ হওয়া নয়। আমি ১৯৮৭ সাল থেকে ক্যাম্পগুলোয় কাজ করছি। পৃথিবীর যেখানো জায়গায় একজন মুজাহিদের অস্ত্র থেকে একটা গুলি বের হলে তার প্রশিক্ষক হিসেবে সেই সওয়াব আমিও পাচ্ছি।'

মাঝেমধ্যে আমার ও আবু আত্তার আলোচনা সারারাত ধরে চলত। আলোচনাগুলো ছিল সমৃদ্ধ। আবু আত্তা সময় নিয়ে আমাকে জিহাদের বিভিন্ন বিষয় বুঝাতেন এবং সেসব বিষয়ের ওপর রাসূলের ﷺ উক্তিগুলো তুলে ধরতেন।

---

১১. তিউনিসিয়ান আবু আত্তা মাসউদের সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মারা যাওয়ার আগে আল-কায়েদার আফগান প্রশিক্ষণ ক্যাম্পগুলোয় সামরিক প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি ছিলেন নাসের আল-বাহরির 'গাইড।

অন্যদিকে বিন লাদেনের সাথে আমার সত্যিকারের কোনো আলোচনাই হতো না। আমাদের কথোপকথন তার আমাকে আদেশ দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ ব্যাপারেও আমি হতাশ।

সৌভাগ্যক্রমে এই রুটিনের ছেদ ঘটল ১৯৯৮-এর এপ্রিলে কোর্স চলাকালীন শায়খ ওসামার আচমকা আগমনে। তার আসার দুদিন পর আমাদের জানানো হলো যে তিনি খোস্তে একটি প্রেস কনফারেন্স রাখতে চান। বিন লাদেন আমাদের পাকিস্তানি ও এশিয়ান মিডিয়ার উপস্থিতিতে তার সিকিউরিটি দ্বিগুণ করতে বললেন। আমরা মুজাহিদদের জিহাদ ওয়াল ক্যাম্প খালি করে দিলাম। যারা স্পেশাল কমান্ডো প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল, তারা বাদে ক্যাম্পে আর কাউকে রাখা হলো না। পাকিস্তান থেকে সাংবাদিকরা এসে পৌঁছলে তাদের সীমান্ত থেকে আল-আনসার গ্রুপের কিছু লোক স্বাগত জানিয়ে নিয়ে আসেন। আল-আনসার হলো আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল একটি পাকিস্তানি গ্রুপ। ইতোমধ্যে শায়খ ওসামা আস-সিদ্দিক ক্যাম্প থেকে এক আর্মোর্ড ল্যান্ড ক্রুজারে করে এসে পৌঁছলেন। এর কিছুক্ষণ পরেই আমরা সেনা বহর নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

প্রেসের সামনে তিনি পবিত্র ভূমিগুলোয় আমেরিকার দখলদারত্বের সমালোচনা করলেন এবং বললেন যে জিহাদের মাধ্যমেই এর সমাপ্তি ঘটবে। এরপর তিনি এক নতুন আমব্রেলা গ্রুপ গঠনের ঘোষণা দেন, ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফ্রন্ট (World Islamic Front)। যার কাজ ইহুদি ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। তিনি একটি ফতোয়া দেন যে, আমেরিকানদের হত্যা করা প্রত্যেক মুসলিমের দ্বীনি দায়িত্ব। ফতোয়ায় স্বাক্ষরকারীরা সেসকল গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করতেন যেগুলো ইতোমধ্যেই ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত। সেখানে বিন লাদেন ছাড়াও আরও ছিলেন আয়মান আল-জাওয়াহিরি, মিশরের জিহাদি গ্রুপের আমির; আবু ইয়াসির রিফায়ী আহমাদ ত্বহা, মিশরীয় ইসলামিক গ্রুপের সদস্য; শায়খ মির হামজা, পাকিস্তানের 'জামিয়াতুল উলামায়ে পাকিস্তান'-এর সেক্রেটারি এবং ফজলুর রহমান, বাংলাদেশের জিহাদি আন্দোলনের আমির। একই মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারী দল এবং ব্যক্তিবর্গকে ওয়ার্ল্ড ইসলামির ফ্রন্টে যোগদান করার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিন লাদেন বক্তব্য শেষ করলেন।

প্রেস কনফারেন্স শেষে ওসামা বিন লাদেন, আয়মান আল-জাওয়াহিরি এবং আবু হাফস এক ছাতার নিচে করে চলে গেলেন। ডা. আয়মান সাংবাদিকদের সাথে ইংরেজিতে কিছু কথা বলেছিলেন। শায়খ ওসামার দায়িত্বপ্রাপ্ত দোভাষী ছিলেন

আবদুল হাদি আল-অরদোনি, একজন জর্ডানিয়ান। ৯/১১-র প্রস্তুতি সম্পর্কিত ভিডিওতে তাকে দেখা যায়।

পরের দিন ওসামা চ্যানেল ABC-এর একজন সাংবাদিককে একটি সাক্ষাৎকার দেন। সাংবাদিকের সাথে ছিল এক ইরাকি দোভাষী এবং এক কানাডিয়ান ক্যামেরাম্যান। এই তিনজন লোক খোস্ত ক্যাম্পে এসেছিল। ওসামা আমাকে সালিম খামদানি এবং খালিদ আল-মাসসাহর সাথে পাঠালেন তাদের নিয়ে আসতে। আমরা অনানুষ্ঠানিকভাবে তাদের খোঁজার মাধ্যমে আমাদের অভিনয় শুরু করি। এরপর তাদের ক্যামেরা জব্দ করে তাদের একটি গাড়িতে তুললাম। আমরা ইচ্ছে করেই খুব দীর্ঘ একটি রাস্তা ধরলাম, তাদের এটা দেখানোর জন্য যে, ক্যাম্পে পৌঁছা অত সহজ না। কানাডিয়ান ও ইরাকি—এ দুজন ছিল ড্রাইভারের সাথে পিক-আপের সামনের সিটে আর আমরা ছিলাম পেছনে। আমাদের গাড়িকে পাকিস্তানি মুজাহিদদের অনেকগুলো চেকপয়েন্ট পার হতে হলো। আমেরিকান সাংবাদিক একবার প্রস্রাব করার জন্য বাইরে যেতে চেয়ে গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করল। আমি তাকে ইংরেজিতে বললাম, 'Don't move, please!'।

সে আমার কথা শুনল এবং তার সহকর্মীদের এ-ও জানিয়ে দিল যে গার্ডদের একজন ইংরেজি বলতে পারে, তাই তারা যেন ভেবেচিন্তে কথা বলে।

আমরা ক্যাম্প ফারুকে পৌঁছলে শায়খ ওসামা আমাদের সাথে যোগ দেন। আকাশের দিকে বন্দুক ফায়ার করা হলো, দেখে মনে হচ্ছিল যে, আকাশটা বিস্ফোরণের চাদরে ঢেকে গেছে। ওসামার সাথে ছিলেন সাইফ আল-আদেল (যেহেতু তিনি এক সামরিক প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন, তাই ABC-র রিপোর্টে তিনি উপস্থিত ছিলেন) আবু আত্তা, যিনি কি না দোভাষীর কাজ করবেন, এবং আয়মান আল-জাওয়াহিরি।

গাড়ি থেকে নেমেই কানাডিয়ান ক্যামেরাম্যান গোপনে ভিডিও করা শুরু করল। সে মুজাহিদদের উন্মোচিত চেহারার ভিডিও করছিল। তাদের মধ্যে সেসকল মুজাহিদরাও ছিল, যারা নাইরোবি ও দারুস সালামে হামলা চালাবে। আমি আমার সঙ্গীদের বললাম সাংবাদিকদের আবার গাড়ির ভেতরে নিয়ে যেতে। তারপর আমরা তাদের ক্যামেরা থেকে অননুমোদিত ফুটেজ ডিলিট করে তাদের নিকট ক্যামেরা ফিরিয়ে দিলাম।

পাকিস্তানে ফেরার পর ইরাকি দোভাষী খালিদ আল-ফাওয়াযকে ফোন করে বলে যে, আবু জান্দাল তার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে। খালিদ আল-ফাওয়ায

হলেন লন্ডনে বিন লাদেনের দাপ্তরিক প্রধান। আল-ফাওয়াম এই অভিযোগ বিন লাদেনকে জানান। বিন লাদেন আমাকে ডেকে বললেন,

'লোকজন তোমার নামে অভিযোগ দিচ্ছে, এ তো ভালো কথা না। তুমি আমাদের মেহমানদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছ'।

আমি আমার রেডিও ও কালাশনিকভ ওসামা সামনে রেখে বললাম,

'এই আমার ইকুইপমেন্ট। আমি ইস্তফা দিলাম। আপনার আশেপাশে আরও ডজনখানেক দেহরক্ষী আছে, আবু জান্দালকে আপনার দরকার নেই'।

পরে সাইফ আল-আদেল আমাকে দেখতে এলেন। তিনি বললেন,

'তুমি যা করেছ তা একশভাগ ঠিক। কিন্তু কিছু মনে কোরো না। শায়খ তোমাকে পিতৃসুলভ বকাঝকা করেছেন। তাকে মাফ করে দাও।'

আমি তাকে পুরো ঘটনা খুলে বললাম।

'যখন দেখলাম কানাডিয়ান ক্যামেরাম্যান মুজাহিদদের ভিডিও করছে তখন তাকে আমি বললাম, "দয়া করে এটা বন্ধ করুন"। ইরাকি উত্তরে আমাকে বলল, "তুমি এর মধ্যে কেন জড়াচ্ছ? এর সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই"। আমি তার কলার ধরে ধাক্কা দিয়ে গাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে দিলাম এবং আমার সঙ্গীদের বললাম, "এই কুকুরটার উপরে নজর রেখো"।'

আমি সাইফ আল-আদেলকে বললাম বিন লাদেনের সাথে একটা মিটিংয়ের ব্যবস্থা করতে। আমি আমার সঙ্গীদের নিয়ে বিন লাদেনের সাথে দেখা করতে গেলাম। ঐ ইরাকি দোভাষীর ঘটনায় এই সঙ্গীরা আমার সাথে ছিল। ওসামা বুঝতে পারলেন যে তিনি আমাকে বিচার করতে একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলছেন। তিনি মাফ চাইলেন। শায়খ ওসামাকে তার একজন রক্ষীর কাছে মাফ চাইতে দেখে সোরাক আল-ইয়েমেনি কান্না জুড়ে দিলেন। আমি বিন লাদেনের কপালে চুমু খেলাম এবং এই ঘটনা এখানেই শেষ।

এই ঘটনার পর থেকে আমি তাকে আর 'শায়খ' বলে ডাকিনি, বরং 'খাল' অর্থাৎ চাচা বলে ডাকা শুরু করলাম।

এক মাস পর আল-কায়েদা নেতৃত্ব আবু আত্তাকে ওসামা বিন লাদেনের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য ষোলোজন ব্যাচেলর যুবক জোগাড় করতে বলে। আবু আত্তা ও আমি শায়খের নতুন নিরাপত্তা পর্ষদ গঠনের জন্য বাকি পনেরোজন সদস্য বেছে নিলাম। সময়টা ছিল ১৯৯৮-এর জুন মাস, নাইরোবি ও দারুস সালামে হামলার চল্লিশদিন পূর্বে।

অষ্টম অধ্যায় : ওসামা বিন লাদেনের সাথে প্রাত্যহিক জীবন

ওসামা বিন লাদেন সবসময় তার সাথে বন্দুক রাখতেন, এমনকি রাতে যখন তিনি ঘুমাতেন, তখনও। এটি ছিল একটা 5.45 mm ক্লিনকভ অ্যাসল্ট রাইফেল AKSU-74। এটি তিনি ১৯৮০-র যুদ্ধে এক সোভিয়েত অফিসারকে হত্যা করে তার থেকে জব্দ করেছিলেন।

এই সতর্কতা যে বিষয়টিকে প্রভাবিত করতে পারেনি তা হলো—শায়খ সবসময় নিজের নিরাপত্তা নিয়ে সচেতন থাকতেন না। মাঝেমধ্যে তাকে একাই পাওয়া যেত, কোনো দেহরক্ষী ছাড়াই। একবার আমি তাকে তার গাড়িতে করে ক্যাম্পের বাইরে যেতে দেখলাম। তার সাথে কেবল দুজন দেহরক্ষী ছিল। আমি গাড়িটি থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'আমি বাইরে যাচ্ছি।'

'কেবল দুজন দেহরক্ষী নিয়ে? এটা তো নিরাপদ নয়।'

আমি তখন অন্যদের ডেকে তার সাথে যেতে বললাম।

আল-কায়েদার হয়তো ইন্টারনেট ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে পারে, কিন্তু বিন লাদেন নিজে প্রযুক্তির ওপর তেমন ভরসা করতেন না। ১৯৯০-এ সুদানে তিনি একটি Inmarsat স্যাটেলাইট ফোন কিনেছিলেন। নিরাপত্তা ঝুঁকির দরুন তিনি সেটা আর ব্যবহার করতেন না। কিন্তু তিনি তার সহযোগীদের সেটা ব্যবহার করতে দিতেন, এমনকি তার উপস্থিতিতেও। একদিন আমি বিন লাদেনের রুমে গেলাম। সেখানে আল-জাওয়াহিরি ঐ Inmarsat স্যাটেলাইট ফোন দিয়ে লন্ডনের আল-কুদস আল-আরাবি সংবাদপত্রকে বলছিলেন যে নাইরোবি এবং দারুস সালামে আমেরিকার দূতাবাসে হামলার প্রতিশোধে আমেরিকা যে বোমা হামলা শুরু করেছে আল-কায়েদা তার জবাব দেবে। এ দেখে আমি ওসামাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা এটা কেন ব্যবহার করছেন? তারা আপনাকে লোকেট করতে পারে। এই ফোনের আশেপাশে থাকাও বিপদজনক।'

দেখে মনে হলো বিন লাদেন অবাক হলেন। তিনি হঠাৎ বুঝতে পারলেন তারা নিজেদের ওপর কী বিপদ ডেকে আনছেন এবং আল-জাওয়াহিরিকে কল কাটতে বললেন। ত্রিশ মিনিট পর অবস্থান পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত হলো, যেহেতু আমাদের ঘাঁটির অবস্থান তারা জেনে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

এই ঘটনার পর যদি কারও স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করার দরকার পড়ত (যেমনটা আবু হাফসের প্রায় সময়ই পড়ে) তাহলে সে গাড়ি নিয়ে একা মরুভূমির মাঝে চলে যেত।

ক্যাম্পে আসা যেকোনো জিহাদি বিন লাদেনের সাথে দেখা করতে পারত। মাঝেমধ্যে তিনি তার দেহরক্ষীদের বলতেন,

'আমাকে ছেড়ে দাও। আমি নতুন আগত একজনকে গ্রহণ করতে যাচ্ছি'।

'আপনি কি তাকে চেনেন?'

'না।'

'কি বলছেন? কিন্তু আমরা তো আপনাকে একা ছেড়ে দিতে পারি না।'

একদিন আমরা এক ব্যক্তিকে বিন লাদেনের সাথে দেখা করতে দিচ্ছিলাম না। ঐ ব্যক্তি দাবি করছিল যে তার গ্রুপ বাদে বাকি সবাই কাফের। কিন্তু শায়খ বললেন অতিথিকে তার কাছে যেতে দিতে এবং আমাদের সেখান থেকে চলে যেতে। আমরা আমাদের অস্ত্র ও ওয়াকিটকি রেখে দিলাম এবং তিনি যেন আমাদের যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে দেন এই বলে আমাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলাম। শায়খ জিজ্ঞেস করলেন,

'কেন?'

'আপনি খুবই জেদী। এই লোকের সাথে আপনার একা একা দেখা করা উচিত না। আপনি জানেন সে কোন গ্রুপের?'

বিন লাদেন বাগ্মী ছিলেন না। তিনি খুব কম কথা বলতেন। তার বাক্যগুলো সাধারণত ছোট হতো। এবং তিনি কী বলতে চাচ্ছেন তা বোঝানোর জন্য প্রায়শই উপমা ব্যবহার করতেন।

তাকে দেখে মনে হতো তিনি সবসময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখছেন। আমরা যখন কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতাম, তিনি হাসিখুশি থাকতেন এবং তার সহযোগীদের আশ্বস্ত করতেন। আমি কখনো তাকে অন্য কাউকে অপমান বা আঘাত করতে দেখিনি। তিনি রাগতেন না বললেই চলে। যদি কখনো তিনি কারও ওপর রাগতেন, তিনি ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাতেন না, মাথা নিচু করে রাখতেন।

কড়া স্বভাবের না হলেও বিন লাদেন সবসময় কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতেন। নিয়ম ভঙ্গ করলে আপনাকে তিরস্কার করা হতে পারে, কখনো বা শাস্তিও দেওয়া হতে পারে।

একদিন আমি এক রিক্রুটকে অপমান করায় তার সাথে আমার কথা-কাটাকাটি হয়। আমি তার কাছে মাফ চেয়ে নিই। কিন্তু ঐ ব্যক্তি গিয়ে বিন লাদেনের কাছে

বিচার দিল, 'আবু জান্দালকে শাস্তি দিতে হবে, নইলে আমি এ কথা তালেবানকে গিয়ে বলছি।'

বিন লাদেন বললেন, 'তালেবান কেন? আমি আছি তো এখানে। তারপরও তুমি যদি তাদের কাছে যেতে চাও, যেতে পারো। তোমাকে কেউ আটকাবে না'।

ঐ ব্যক্তি শান্ত হলো এবং বিন লাদেন দুজন মৌরিতানিয়ান আলেমকে ডাকলেন, তারা আইন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তারা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, বিন লাদেন আমার কথা শুনলেন। এরপর আমাকে তিন দিনের জন্য বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমার যোগাযোগের সরঞ্জাম নিয়ে নেওয়া হলো এবং আমাকে তিন দিনের জন্য ক্যাম্পের নিরাপত্তার কাজ দেওয়া হলো। আমি বিন লাদেনের কাছে ফিরে আসলে তিনি বললেন, 'আমি সত্যিই তোমার ওপর রেগে আছি। কারণ তুমি আমাদের বন্ধুকে অপমান করেছ।'

তিনি প্রায়শই সারকাস্টিক হওয়ার দিকে ঝুঁকতেন।

'তুমি তো ভাগ্যবান। একজন জিহাদি হিসেবে তুমি বিলাসিতার জীবন কাটাচ্ছ।'

তার কৌতুক সেখানকার সবাইকে হাসাত। উদাহরণস্বরূপ, সেখানে এক ইয়েমেনি বংশভূত সৌদি ছিল। গায়ের রং গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। সে দেখাত যে সে তাজিকিস্তানের অধিবাসী। বিন লাদেন তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন,

'জান্নাতের হুরেরা যদি তোমার মতো হয়, আমরা সেখানে যেতে চাই না।'

একদিন আমি দুই বন্ধুর সাথে বসে হাসি তামাশা করছিলাম। কিন্তু আমাদের কৌতুকগুলো কিছুটা ছাড়া ছাড়া ছিল। বিন লাদেন আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন,

'বারমুডা ট্রাইঅ্যাঙ্গেল ঐ যে ঐদিকে!'

আমারা কাবুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার দিন সকালে তিনি আমাকে একটি উপহার দিয়েছিলেন। আমি সেটা যত্ন করে রেখে দিয়েছি। এটি একটি লম্বা কাশ্মীরি শাল। আমরা ক্যাম্প ছেড়ে আসার পর আমি বুঝতে পারলাম যে এই শীত থেকে নিজেকে রক্ষা করার মতো কিছু আমি আনিনি। বিন লাদেন বিষয়টা খেয়াল করলেন।

'আমি তোমাকে বলেছিলাম না খুব ঠান্ডা পড়বে!'

আমি কিছু বললাম না। তিনি আমার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

'আমি তোমাকে এই শালটা দিচ্ছি। এটা খুব দামী, যত্ন সহকারে ব্যবহার কোরো এবং নিজের জন্যই রেখো।'

এটাই আমাকে শায়খের দেওয়া একমাত্র ব্যক্তিগত উপহার। আমি তার সাথে ছবি তুলিনি, কারণ তিনি ছবি তোলা পছন্দ করতেন না। আমিও নিরাপত্তাজনিত কারণে আর জোর করিনি।

বিন লাদেন বিশেষ ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তি ছিলেন না। কিন্তু তার ঐতিহাসিক বৈধতা তাকে সকলের সম্মানের ভাগিদার করেছে। তিনি ছিলেন সহজ-সরল। তিনি আমাদের সাথে খেতেন। আমাদের সাথে বসে আড্ডা দিতেন। আমরা আমাদের সুখ-দুঃখ সবকিছু (বা প্রায় সবকিছু) তার সাথে শেয়ার করতাম।

পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমগুলো বিন লাদেনের স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে গুজবে ভর্তি। তার সাথে কাটানো তিন বছরে আমি তাকে কেবল একবার অসুস্থ হতে দেখেছি। সে বারও তার তেমন কোনো সমস্যা ছিল না, কিন্তু তিনি এতটাই ক্লান্ত অনুভব করতেন যে তিনি ডাক্তারের পরামর্শ নিতে চাইলেন। মুজাহিদদের মধ্যে একজন পাকিস্তানি ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু ঐদিন ডা. আল-আযিয কান্দাহারে ছিলেন না। আমরা তালেবানকে ফোন করলাম এবং তারা একজন ডাক্তার পাঠাল। বিন লাদেন ডাক্তার দেখিয়েছেন—এই বিষয়টি আমরা লুকাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শেষমেশ সকালে বিষয়টা জেনে যায়।

বিন লাদেন কিডনি সমস্যায় ভোগেননি, যেমনটা বলা হতো। যদিও তার শ্বাসনালীতে কিছুটা সমস্যা ছিল। যার কারণ ছিল সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে জিহাদের সময় প্রশ্বাসের সাথে নেপাম (Napalm) চলে যাওয়া। এজন্যই সাধারণত তিনি বেশি পানি পান করতেন, চা পান করতেন। তিনি সবচেয়ে বেশি যেটা পছন্দ করতেন তা হলো মেথির (Fenugreek) নির্যাস। মেথি হলো একপ্রকার ঔষধি গাছ যা মরুভূমিতে পাওয়া যায়। তিনি কখনোই পেপসি ও কোকাকোলা পান করতেন না। ইসলামের শত্রু বাদে সকলকে তিনি এগুলো পান করা থেকে বিরত থাকতে বলতেন।

বিন লাদেন বেশি একটা খেতেন না। প্রতি সোম ও শুক্রবার তিনি রোজা রাখতেন। এছাড়াও ঈদের আগের মাসে পরপর দশদিন এবং রামাদানের পরের মাসে পরপর ছয়দিন রোজা রাখতেন। এই সময়গুলোয় অতিথিরা এলে সমস্যা হতো। কারণ অতিথিদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করার জন্য তাকে রোজা ভাঙতে হতো। তিনি প্রায়শই আমাদের বলতেন রোজা রাখা স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকারী।

১৯৯৯ সালে একচল্লিশ বছর বয়সেও আমাদের অনেকের চেয়েও তার শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল যারা তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট।

তিনি ফজরের সালাতের পর পরই খেজুর খেতেন। সাধারণত অর্ধেক ডিমের অমলেট খেতেন। কোনো বিশেষ উপলক্ষে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হলে তিনি ছাগলের কাঁধের মাংস খেতেন—রাসূলের ﷺ মতো। তিনি প্রথমেই সেটিকে ছোট ছোট টুকরো করতেন এবং অতিথিদের সাথে ভাগ করে খেতেন। তার অত্যন্ত পছন্দের খাবারের মধ্যে অন্যতম হলো ছাগলের মাংস এবং চাল দিয়ে তৈরি জর্ডানিয়ান মানসাফ। বনু হাশিম গোত্রের জিহাদিরা এটি তার জন্য নিয়মিত রান্না করত। তিনি লাল আটার রুটি দিয়ে এটি খেতেন। কোনো যাত্রায় বের হলে তিনি সাথে করে মরুভূমির খুব তেঁতো এক উদ্ভিদ এবং মধু নিয়ে যেতেন। অন্য আরবের মতো বিন লাদেনও বিশ্বাস করতেন মধু শত রোগের ওষুধ।

তিনি সময় পেলে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে মরুভূমিতে পিকনিক করতে যেতেন। সেখানে তারা ভেড়া রোস্ট করতেন। আমরা দূর থেকে নজরদারি করতাম। তিনি মরুভূমিতে ঘুরতে পছন্দ করতেন। একবার তিনি আমাদের একটি রাতের প্রশিক্ষণ নেন। তিনি এর নাম দেন 'ডেজার্ট ফক্স'। নামটি তিনি নিয়েছেন ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে ইরাকের বিরুদ্ধে চালানো আমেরিকার মিলিটারি অপারেশন থেকে।

আরেকবার কাঠফাটা রোদের মধ্যে তিনি আমাদের মরুভূমির তপ্ত বালুতে খালি পায়ে তার সাথে হাঁটতে বললেন। এরপর একটি পাহাড়ে চড়তে বললেন। আমাদের মধ্য হতে কেবল পাঁচজন এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল। আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানে ফিরে আসার পর তিনি বললেন,

'তোমার পথটা এতটাই কঠিন ছিল যে তোমাকে দৌঁড়াতে হয়েছে, কিন্তু যখন তুমি শিখরে পৌঁছাবে, মনে হবে যেন জান্নাত অর্জন করে ফেলেছ'।

তিনি মিলিটারি পোশাক পরতেন না। কেবল মাঝেমাঝে একটা ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেট পরতেন। তিনি ঐতিহ্যবাহী আফগান সাওব পছন্দ করতেন। যখন তিনি মাথায় একটি লম্বা ইয়েমেনি পাগড়ি বাঁধতেন, তখনই আপনি বুঝে যাবেন যে সামনের যাত্রাটা কঠিন হতে যাচ্ছে। এটি মূলত তার একটি অভ্যাস। আমি কখনো তার উন্মুক্ত মাথা দেখিনি, এমনকি যখন তিনি স্ট্রাইকার হিসেবে ফুটবল খেলতেন ও ভলিবল খেলতেন, তখনও।

ঘোড়ার প্রতি তার উৎসাহ ছিল ব্যাপক। তিনি ঘোড়া নিয়ে এমনভাবে কথা বলতেন, যেন তিনি ইসলাম নিয়ে কথা বলছেন। তিনি ঘোড়া সম্পর্কে সব জানতেন,

প্রত্যেক জাতের একেবারে সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলোও তার নখদর্পণে ছিল। আরবের এক দূর্লভ জাতের ঘোড়ার তার বিশেষ শখ ছিল। সামান্য চকচকে কালো লোমে ঢাকা শরীর। এই জাতের ঘোড়া তার কাছে বারোটা ছিল। এগুলো তিনি বেদুইন গোত্রের লোকদের থেকে কিনেছিলেন। তার সবচেয়ে পছন্দের ছিল একটি মদ্দা ঘোড়া, নাম আদহাম। কেবল তিনি ও তার পুত্র আবদুর রহমান এই ঘোড়ায় চড়তেন, সাধারণত কোনো জিন ছাড়াই। মরুভূমিতে কোনো ঘোড়া যদি তার নজর কাড়তো, তিনি তৎক্ষণাৎ সেটি কেনার চেষ্টা করতেন। কখনো কখনো বেলুচিস্তান থেকে তার জন্য ঘোড়া নিয়ে আসা হতো। বেলুচিস্তান হলো পাকিস্তানের একটি অঞ্চল যেখানে ঘোড়া পালন করা হয়। তিনি যখন জানতে পারলেন যে আমি ঘোড়ায় চড়তে পারি না, তিনি আমাকে শেখানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমি শিখতে ব্যর্থ হই।

ইসলামি উৎসব বা বিয়ের অনুষ্ঠানে বিন লাদেন ঘোড়দৌড়ের আয়োজন করতেন।

১৯৯৯-এ একবার একটি ঘোড়া থামাতে গিয়ে বিন লাদেনের পাঁজরের দুটো হাড় ভেঙে যায়। আয়মান আল-জাওয়াহিরি কান্দাহারের এক সেইফ হাউজে তার সেবাশুশ্রূষা করেন।

যখন তিনি তার নিকটজনদের সাথে থাকতেন, তখন মাঝেমধ্যে তিনি এমন ব্যক্তিদের নিয়ে কথা বলতেন, তার নজরে যারা নিজেদের সময়ে অসামান্য ছিলেন। কাস্ত্রো ও চে গুয়েভারাকে তিনি এভাবে স্বরণ করতেন। তারা অন্যায়কে না বলতে পেরেছিল, কলোনিয়ালিজম ও দখলদারত্বের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। বিন লাদেন বর্তমান ও অতীত বৈশ্বিক নেতাদের অসংখ্য আত্মজীবনী পড়েছেন। এগুলোর মধ্যে ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের স্মৃতিচারণ ও রিচার্ড নিক্সনের Victory without War নিয়ে তিনি বেশি কথা বলতেন। তিনি ভিয়েতনাম-কংগ্রেস নেতা হো চি মিনের আমেরিকানদের বিরুদ্ধে দেওয়া ভাষণগুলো পড়েছেন। এছাড়াও তিনি ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসী গ্রুপ ইরগান (Irgun) গ্যাংয়ের গেরিলা কৌশল সম্পর্কে বেশ কিছু বই পড়েছেন।

তিনি ফিল্ড-মার্শাল বার্নার্ড ল মন্টগোমেরি (Bernard Law Montgomery) এবং জেনারেল চার্লস ডি গল (Charles de Gaulle)-এর মতো দুর্দান্ত ইউরোপীয় সামরিক ব্যক্তিত্বের আত্মজীবনীও পড়েছেন। তিনি ডি গলকে একজন সাহসী সেনা হিসেবে বিবেচনা করতেন, যে জার্মান আক্রমণকে প্রতিহত করার চেষ্টায় কোনো প্রয়াস বাকি রাখেনি। তবে বিন লাদেনের মতে, বিশ্ব সম্পর্কে ডি গলের ফ্রান্স-

কেন্দ্রিক এমন এক আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যা কখনোই অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। সে খ্রিস্টান মূল্যবোধগুলোর প্রতি খুব সহানুভূতিশীল ছিল, তবে দুঃখের বিষয়, সে এমন এক পৃথিবীতে বাস করছিল যা ইতোমধ্যে সে মূল্যবোধগুলোকে ভুলে গিয়েছে। শায়খের মতে, ফ্রান্স জার্মানদের হাতে পড়েছিল, কারণ, ফ্রান্স ছিল নৈতিকভাবে দেউলিয়া।

বিন লাদেন ফ্রান্সের ব্যাপারে কথা বলার সময় সর্বদা ফ্রান্সের উপনিবেশবাদী অতীতের দিকে ইঙ্গিত করতেন, বিশেষ করে আলজেরিয়ায় তাদের উপনিবেশ। একদিন এক অতিথি তাকে বলল,

'আলজেরিয়ায় ইসলামপন্থীরা ক্ষমতা গ্রহণ করলে ফ্রান্স সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ করবে।'

বিন লাদেন এর উত্তরে বললেন যে তা অসম্ভব, কারণ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট Groupe Islamique Armée (GIA)-কে ভয় পায়।

আফগানিস্তানে, আলজেরীয় জিহাদিরা ইয়েমেনি ও সৌদি বাদে মিশরীয় ও অন্যান্য সমস্ত জাতীয়তার জিহাদিদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি ছিল। তাদের মধ্যে পনেরোজনেরও বেশি ফরাসি নাগরিক ছিলেন এবং আশিজন জিহাদি ফরাসি পাসপোর্টধারী ছিলেন যদিও তারা মূলত ক্যামেরুন, মরোক্কো, তিউনিসিয়া এবং সেনেগালের বাসিন্দা ছিলেন। আমি তাদের সবাইকে ভালো করে চিনতাম, বিশেষত জাকারিয়াস মুসাউয়ীকে। তারা সাধারণত সাহসী ছিলেন। ফরাসি নাগরিকদের ভাষাগত সমস্যা হতো, তবে উত্তর আফ্রিকানরা দোভাষী হিসেবে কাজ করতেন। বিন লাদেন তাদের সাথে আরবিতে কথা বলতেন, যেহেতু তিনি বা তারা কেউই ইংরেজিতে তেমন একটা দক্ষ ছিলেন না।

মাঝেমধ্যে এই ফরাসিরা তাদের স্ত্রীদের সাথে করে নিয়ে আসতেন। এসে তারা তাদের আংটি ও ঘড়ি ডান হাতে পরত যেমনটা সব জিহাদি করতেন। তাদের বেশিরভাগই ৯/১১-র পরে আফগানিস্তান ছেড়ে নিজ দেশে ফিরে যান; অন্যরা পাকিস্তানে চলে যান।

নবম অধ্যায় : আল-কায়েদা হেডকোয়ার্টারে জীবন

বিন লাদেনের দৈনিক রুটিন

কান্দাহারে মোল্লা উমর, বিন লাদেনকে নিজের একটি হেডকোয়ার্টার ঠিক করতে দিলেন। দুটো সুযোগ ছিল, একটি ইলেক্ট্রনিক ফ্যাক্টরির পাশে ভালোমানের কতগুলো বিল্ডিং অথবা তারনাক ফার্ম। তারনাক ফার্ম হলো শহরের বাইরে, এয়ারপোর্টের কাছে ৩০ কিলোমিটারের একটি কৃষিজমি। এখানে সুযোগ-সুবিধা ছিল অনেক কম। মজার বিষয় হলো, বিন লাদেন তারনাক ফার্মই ঠিক করলেন। তিনি কঠিন জীবনে সুহৃদ (নির্জনবাস) খুঁজে পেতেন।

"আমাদের কঠিন জীবনে অভ্যস্ত হওয়া উচিত," তিনি প্রায়ই বলতেন।

তিনি রীতিমতো যুদ্ধ করতেন বিলাসিতার বিরুদ্ধে।

তারনাক ফার্ম ছিল রাশিয়ান আর্মির একটি ব্যারাক। রাশিয়ানরা চলে যাওয়ার সময় এ ব্যারাকটি ধ্বংস করে দেয়, তারপর আফগান মুজাহিদরা এ স্থান দখল করে নিজেদের ক্যাম্প স্থাপন করে। এটাই এখন আবার আবাদ হলো।

আমরা সেখানে যাওয়ার পর পানি বা খাবার বা জিনিসপত্র কিছুই ছিল না। এখানে শুধুমাত্র কার্পেট ছিল। বিন লাদেন আগের বিল্ডিংগুলো ঠিক করার ও নতুন বিল্ডিং তৈরির ব্যবস্থা নিলেন। বিন লাদেন এখানে কূপের ব্যবস্থা করলেন। নতুন করে সেখানে তিনি জেনারেটর নির্মাণ করলেন। সে জেনারেটর শুধু সকালে এবং দুপুর দুইটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত চলত। সে ক্যাম্পের চারপাশে নতুন করে দেওয়াল স্থাপন করা হয়। সোম ও বৃহস্পতিবার বাজার বসত। সেখানের পরিবারগুলোর সুবিধার জন্য বিন লাদেন এ ব্যবস্থা করেছিলেন।

তারনাক ফার্মে আশিটা বাসা ছিল, কমপ্লেক্সের মাঝখানে একটি মসজিদ ছিল, একটি অফিস ব্লক ও একটা গ্রেইন সিলো ছিল। সে ফার্মে ছিল পঞ্চাশ পরিবার এবং দুশ জন লোক। তারা সবাই ছিল আরব। এটা কেবলমাত্র আল-কায়েদার হেডকোয়ার্টারই ছিল।

সেখানে যারাই দেখা করতে যেত তাদের আগে ক্যাম্পের গেইটের কমান্ডারের কাছে অস্ত্র জমা দিয়ে ঢুকতে হতো, যদি না তাদের কাছে তালেবানের দেওয়া সুপারিশপত্র থাকত। ১৯৯৯ সালে বিন লাদেন তারানাক ফার্মের আমির হিসেবে আবু বাশিরকে (নাসের আল-ওয়াহাইশি) নিযুক্ত করেন।

আল-কায়েদা যখন নিজেকে আফগানিস্তান থেকে গুটিয়ে নেয় তখন সেখানে তাদের তিনটা ক্যাম্প ছিল। সবচেয়ে বড় ক্যাম্প ছিল খোস্তের পাশে আল ফারুক, এটা ছিল কান্দাহার থেকে গাড়িতে করে চার ঘণ্টার পথ। নতুন যারা যোগদান করত তাদের এখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো[12]। বাকিগুলোর নাম ছিল আস সিদ্দিক ও জিহাদ ওয়াল।

১৯৮৯-১৯৯৯ এর দিকে তালেবান আল-কায়েদার ক্যাম্প বাদে আর সব প্রধান ক্যাম্প বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আমাদের ক্যাম্প রাখার জন্য আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়, অনেক আলোচনা করতে হয়। আমি সেসব আলোচনায় অংশ নিই। সেই আলোচক দলের একজন হতে পেরে আমি গর্ববোধ করি।

মসজিদের পাশেই ছিল শায়খ ওসামার বাসা। গার্ডদের জন্য ছিল আলাদা রুম। ওসামা বিন লাদেনের সাথে সবসময় ষোলোজন দেহরক্ষী থাকত।

আমরা আসার আগে শায়খের দেহরক্ষীদের মধ্যে ছিল পাঁচজন মিশরীয়, একজন মৌরিতানিয়ান ও একজন তিউনিসিয়ান। এদের বেশিরভাগই ছিল বিবাহিত, তাই সারাদিন কাজ করা তাদের জন্য সম্ভব হতো না। তার নতুন দেহরক্ষীরা সবাই ছিল ইয়েমেনি। আমিই তাদের ঠিক করেছিলাম। এদের সবাইকে আমি জানতাম, চিনতাম, বিশ্বাস করতাম। তারা বেশিরভাগই গরিব, তাই তারা জানত কীভবে জীবনের সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। তারা ছিল যোদ্ধা, সাথে অস্ত্র নিয়ে চলত। তাদের মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা ছিল প্রবল।

তখন থেকেই আমার বেশিরভাগ সময় আমি শায়খের সাথেই কাটাই। খোস্ত থেকে কান্দাহারে দুইদিনব্যাপী যাত্রায় আমি অনেক অনেক ভেবেছি। জিহাদ পরিচালনার বিভিন্ন পন্থা নিয়ে আমি ও আবু আত্তা অনেক ভাবতাম, আলোচনা করতাম। এসব চিন্তা আমাকে অনেক ফায়দা দিয়েছে। আফগানিস্তানে তিনিই ছিলেন আমার আধ্যাত্মিক গাইড। কথাবার্তার পর আমি পরিষ্কারভাবে বুঝলাম, কেন ওসামা বিন লাদেনকে রক্ষা করা আমার ইবাদাতের অংশ। আমি অনেক খুশি ছিলাম। আমি নতুন নিযুক্তদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করি। ধীরে ধীরে আল-কায়েদার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পর্ষদের মানুষদের সাথে আমার সম্পর্ক বাড়তে থাকে।

ভোরে ফজরের সালাতের আগে শায়খ ওসামার এক ঘন্টা হাঁটার অভ্যাস ছিল। তার দরজার সামনে ছিল দুজন গার্ড, দুই ঘন্টা করে শিফট। তারা শায়খের সাথে

---

১২. ২০০১ সালে আল-ফারুক ক্যাম্প হেলমান্দ প্রদেশে স্থানান্তরিত করা হয়।

মসজিদে যেত। আমরা শায়খের সাথেই সালাত আদায় করে নিতাম। তিনি তার সাথে তার কালাশনিকভটা রাখতেন।

সালাত শেষে সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন, রাসুলুল্লাহর ﷺ হাদীস অধ্যয়ন করতেন, কিছু দোয়া-দরুদ পড়তেন। তারপর দুজন দেহরক্ষীসহ তিনি সকালের নাস্তা করতে যেতেন। তিনি সেখানে দুই ঘন্টা কথাবার্তা বলতেন, তারপর আটটায় অফিসে যেতেন। সেখানে দরজার বাইরে থাকত একজন গার্ড, নিচের তলায় দুজন, আর বাকিরা ঘোরাঘুরি করত আশেপাশে নজর রাখার জন্য। নাসের আল-ওয়াহাইশি প্রায়ই শায়খের সাথে থাকতেন। তিনি ধর্মতত্ত্ব নিয়ে লেখাপড়া করেছেন।

ওসামা জোহর পর্যন্ত কাজ করতেন। তিনি তার বাসায় গিয়ে পরিবারের লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলতেন, অজু করতেন তারপর রওনা দিতেন মসজিদের দিকে, জোহরের সালাতের জন্য।

কেউ দেখা করতে এলে তার সাথে তিনি যুহরের সালাতের পর কথা বলতেন, নাহয় সোজা বাসায় যেতেন। বিকেলে বাসা থেকে বের হয়ে তিনি ক্যাম্পের ব্যাচেলর ছেলেদের সাথে সালাত আদায় করতেন।

তারপর তিনি প্রায়ই ভলিবল খেলতেন। তিনি থাকতেন এক দলের অধিনায়ক, আবু হাফস আল-মাসরি থাকতেন আরেক দলের। তারা দুজনই অনেক লম্বা ছিলেন। বল ছুঁড়তে তাদের লাফানোরও দরকার হতো না!

মাগরিবের পর ম্যাচশেষে তিনি আবার অতিথিদের সময় দিতেন। তারপর রাতের খাবার খেতে তিনি বাসায় যেতেন। তারপর এশা পড়ে একটু হাঁটাহাঁটি করে সাড়ে ৮টার দিকে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন।

বিন লাদেনের নিরাপত্তা

২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আল-কায়েদার ডজন ডজন সদস্য বিন লাদেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর ছিল। বিন লাদেন যখন ক্যাম্প থেকে বের হতেন তখন তার সাথে থাকত অন্তত তিনটি গাড়ির একটি কনভয়, যার প্রতি গাড়িতে অন্তত চারজন গার্ড থাকত।

কান্দাহারে বিন লাদেনের গার্ডরা তার ছেলে সাদ ও আবদুর রহমানের সাথে ক্যাম্পের মসজিদে থাকত। এরা ছিল বড় বিন লাদেনের বড় ছেলে। সবচেয়ে বড় ছেলেটার বয়স ২৫ পেরোয়নি।

লিস্টটি হলো সে সময় বিন লাদেনের অন্যান্য গার্ডদের:

১. আবু মুসআব আল-তায়েজি
২. বারা আল-তায়েজি
৩. গারিব আল-তায়েজি
৪. আবু বাশির আল-ইয়েমেনি (নাসের আল-ওয়াহাইশি)
৫. আবু শুবাইব আল-তায়েজি
৬. আবু আল-শহিদ আল-সানানি
৭. সাদ আল-তায়েজি
৮. খাল্লাদ
৯. শাকের আল-মাদানি (সৌদি)
১০. উমর আসেম (আবু আসেম আল-মাগরিবি) (মরক্কান)

আমাদের প্রত্যেককে আল-কায়েদা প্রধান নিজে বাছাই করেছেন। আপনাকে এ কাজ নেওয়ার জন্য অনেক ব্যতিক্রমধর্মী কঠিন ট্রেনিং শেষ করতে হবে। একই সাথে তালেবানের ফ্রন্ট লাইনে যুদ্ধের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এমনকি তাদের ইমান, আনুগত্য এবং যুদ্ধ অভিজ্ঞতা বোঝার জন্য বিন লাদেন তাদের কিছুদিন নিজের সাথেও রাখতেন।

সাইফ আল-আদেল ও আবু হাফস আমাদের রিক্রুটমেন্টের আগে আমাদের ব্রিফ করেছিলেন। তারাই বিন লাদেনের নিরাপত্তাজনিত সব বিষয়াশয় নজরে রাখতেন। আমরা ৬ কিলোমিটার রেইঞ্জে স্যাম-৭ এবং গ্রাউন্ড-টু-এয়ার স্ট্রিংগার মিসাইল ব্যবহার করতাম। আমাদের ব্যাটারি প্রায়ই শেষ হয়ে যেত। তাই খুব দরকার না হলে আমরা এ মিসাইলগুলো ব্যবহার করতাম না। এসব মিসাইল কখন ব্যবহার করা হবে, তা ঠিক করতেন সাইফ আল-আদেল এবং আবু হাফস। আমাদের হাতে সবসময় এসল্ট রাইফেল, পিকে সাব-মেশিনগান ও আরপিজি এন্টি-ট্যাংক রকেট থাকত। তারনাক ফার্মসহ আফগানিস্তানে আল-কায়েদার অন্যান্য ক্যাম্পও এমন নানা ধরণের এন্টি-এয়ারক্রাফট অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সুরক্ষিত থাকত।

মরক্কোর আবু আসেম আল-মাগরিবি বিন লাদেনের প্রতিদিনকার নিরাপত্তার বিষয়টা দেখাশোনা করতেন। তার বয়স ছিল শায়খের কাছাকাছিই। কিন্তু তার মাথায় কোনো সাদা চুল ছিল না। তিনি জানতেন কীভাবে যৌবন ধরে রাখতে হয়।

ক্যাম্প ও বাসার বাইরে বিন লাদেনের সব ভ্রমণে আমরাই তাকে সঙ্গ দিতাম। তিনি ঘোরাঘুরি করতে পছন্দ করতেন। এক স্থানে থাকলে তার মনে হতো তিনি

যেন জেলে আছেন। এজন্য আমরা মাঝেমধ্যে ঝামেলায় পড়ে যেতাম, কখন তিনি কোনদিকে বের হয়ে যান সেদিকে নজর রাখতে গিয়ে।

ক্যাম্প ও আল-কায়েদার স্থাপনাগুলো ছাড়াও তিনি প্রায়ই তালেবানের নেতা ও প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করতে যেতেন। তিনি বিশেষ করে আলেমদের সাথে দেখা করতেন। তাদের মধ্যে তার বন্ধু জালালউদ্দিন হক্কানিও[১৩] ছিলেন।

আল-কায়েদার বেশিরভাগ গাড়িই ছিল ৪×৪ টয়োটা হিলাক্স পিক-আপ। এগুলো বিন লাদেন কিনেছেন সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে। যুদ্ধে এ পিক-আপের দক্ষতার জন্য এটিকে তিনি বেশি পছন্দ করতেন। এছাড়াও জিহাদি যোদ্ধাদেরকে বহনের জন্য আমাদের কাছে আরও ১৪টি কোচ ছিল। বিন লাদেন স্থান ছাড়ার আগে পাঁচজন সিকিউরিটি পার্সোনেল রেকি করতে যেত নিরাপত্তাজনিত কারণে। তাদের কাছে থাকত আমেরিকায় তৈরি মাইন ডিটেক্টর। বিন লাদেন হয় পাচারকারী কিংবা পাকিস্তানি আর্মির কাছ থেকে এগুলো সংগ্রহ করেছেন, ঠিক কার থেকে তা সঠিক মনে নেই আমার।

শায়খ যখন কাবুল বা অন্য কোথাও আল-কায়েদার কোনো গেস্ট হাউজ সফরে যেতেন, তখন তার নিরাপত্তার দায়িত্বে যিনি থাকতেন তিনি সকল সংকট বিবেচনায় নিয়ে একটি ব্যতিক্রম ও বিপরীত নিরাপত্তা স্ট্র্যাটেজি দিতেন। এগুলো বিন লাদেন দেখতেন এবং সন্তুষ্ট হতে পারলেই কেবল যেতেন। তিনি তার একজন গার্ডকে বলতেন বিষয়গুলো ভালো করে দেখে নিতে।

বিন লাদেনের উচ্চতা ছিল প্রায় ১.৯০ মিটার। তার এ উচ্চতা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যা তৈরি করত। এক পর্যায়ে আমরা শায়খের উচ্চতার এক ইয়েমেনিকে পেয়ে যাই। তারপর আমরা কনভয়ে সবসময় শায়খের সামনে তাকে বসাতাম যেন শত্রুরা সন্দিহান হয়ে যায়।

যেকোনো ইমার্জেন্সির জন্য তালেবান এক প্রকার ওয়ার্নিং অ্যালার্মের ব্যবস্থা করে। তিনটি ট্রেসার গুলি ও তারপর একটি মেশিনগানের গুলি ফায়ার করা হতো। দুটি দল সাথে সাথে শায়খের কাছে চলে যেত। একদল শায়খের পাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকত, আরেক দল কিছুটা দূরে থেকে সমস্যার মোকাবেলা করত। ক্যাম্পের বাইরে নিরাপত্তার পুরো দায়িত্বে থাকত তালেবান। নিরাপত্তার নিয়মাবলি মেনে দেহরক্ষীরা ওসামাকে যেকোনোভাবে একটি সেইফ হাউজে আশ্রয় দিতে নিয়ে যেত। অন্য

---

১৩. সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়কার একজন বীর মুজাহিদ এবং পরবর্তীকালে আল-কায়েদা সমর্থিত শক্তিশালী হক্কানি নেটওয়ার্কের নেতা।

পাঁচজন গার্ড আবু হাফস আল-মাসরির নিরাপত্তার দায়িত্ব নিত। তাকে নিয়ে যেত হারেক গেইস্ট হাউজে। আমাদের সিকিউরিটি গার্ডদের মধ্য হতে দুজন মিশরীয়কে নিয়োগ করা হয়েছিল আয়মান আল-জাওয়াহিরিকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য।

তারনাক ফার্মে আরও ছয়টি ইমার্জেন্সি টানেল ছিল। এগুলো ছিল বাইরের দিকের দেওয়ালের পাশে। আমরা এগুলো দিয়ে আল-কায়েদা যোদ্ধাদের পরিবারকে যেকোনো নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতাম—যখন দরকার, যেখানে দরকার। সেগুলো ছিল ১৫ মিটার লম্বা এবং একটা কৃত্রিম নদীতে গিয়ে তা শেষ হতো। নদীটার শুরু মাঝ থেকেই। পালাতে হলে আপনাকে সাঁতার জানতে হবে। আমরা কেবল একবারই টানেল ব্যবহার করেছিলাম—নাইরোবি ও দারুস সালামে আল-কায়েদার হামলার জবাবে আমেরিকা যখন এখানে বোমা হামলা করেছিল।

বাইরের দিকের দেওয়ালে আরও কিছু পালানোর রাস্তা ছিল। দেখে মনে হতো সেখানে কেবল একটাই গেইট ছিল, কিন্তু আসলে তা নয়। আমরা আরও বেশ কিছু ইমার্জেন্সি গেইট নির্মাণ করেছিলাম। সেগুলো কাদার স্তর দিয়ে দিয়ে ঢাকা ছিল, যেন সহজেই সেগুলো ভাঙা যায় দরকার হলে। আর সে দরজাগুলো দিয়ে সহজেই গাড়ি যেতে পারত।

আরও কিছু ব্যবস্থা ছিল। প্রতি ঘরেই একেকটা খুব সুরক্ষিত, বুলেটপ্রুফ চেম্বার থাকত। সব না হলেও, প্রায় সবগুলোতেই থাকত। সাইফ আল-আদেলের মতো মানুষরা এটা পছন্দ করতেন না। তার মতে, এগুলো বেশি ব্যয়বহুল। বিন লাদেনের ঘরের নিচের রুমটা বানাতে আমাদের তিন মাস লেগেছিল।

আল-কায়েদা যেভাবে কাজ করে (প্রশাসন)

আল-কায়েদা শুরাভিত্তিক (অর্থাৎ সকল মৌলিক আলোচনার কাউন্সিল) সংগঠন। আমি যখন আল-কায়েদায় ছিলাম তখন শুরা গঠিত ছিল বিন লাদেনের কাছের কিছু মানুষকে নিয়ে :

১. আবু হাফস আল-মাসরি (মিশরীয়)
২. আবু মুহাম্মদ আল-মাসরি (মিশরীয়)
৩. সাইফ আল-আদেল (মিশরীয়)
৪. আবু সাঈদ আল-মাসরি (মিশরীয়)
৫. আয়মান আল-জাওয়াহিরি (মিশরীয়)
৬. আবু হাফস আল-মৌরিতানি (মৌরিতানিয়ান)

৭. আবু আসেম আল-মাগরিবি (মরোক্কান)

আবু হাফস এবং শুরার অন্যান্য সদস্যদের সাথে প্রায়ই আলোচনা হতো শায়খ ওসামার। আমরা তখন বিষয়টি নিয়ে অনেক মজা করতাম, "বুড়োরা বসে আলোচনা করছে, আল্লাহ তাদের সাহায্য করুক।"

১৯৯০-এর শেষের দিকে, আফগানিস্তানের আল-কায়েদার অনেকগুলো সংগঠন ছিল, শাখা ছিল—

- সামরিক কমিটি। এর অফিসগুলো ছিল ক্যাম্পের বাইরে। কিন্তু তারনাক ফার্মের সাথে এর যোগাযোগ ছিল। এ কমিটি যারা চালাতেন তারা হলেন আবু হাফস আল-মাসরি, তার ডেপুটি ইয়াকুব আল-দুসারি। আবু জায়েদ আল-ইরাকি আইটি, টপোগ্রাফি ও নজরদারি শাখায় আবু হাফসকে সাহায্য করতেন। জর্ডানের আবদুল হাদী আল-অরদোনি ভালো ইংরেজি বলতে পারতেন। তিনি ছিলেন আল-ইরাকির সহকারী। উনার সাথে পরবর্তী সময়ে ডা. আল-জাওয়াহিরির এক মেয়ের বিয়ে হয়। আবদুর রাহিম আল-নাশিরি এবং আবু ফারায আল-লিবিও ছিলেন সামরিক কমিটির সদস্য।

- স্পেশাল অপারেশন কমিটি। সামরিক কমিটির সাথে একই ব্লকে এর অফিস ছিল। আমি আসলে নিশ্চিত না এরা সাংগঠনিকভাবে একে অপরের অংশ ছিল কি না। এ কমিটিতে সাইফ আল-আদেল এবং আবু হাফস আল-মাসরিও ছিলেন। এ কমিটি তাদের টার্গেট, আক্রমণের পন্থা ইত্যাদি নিয়ে কোনো অপারেশনের আগে শায়খ ওসামা বিন লাদেনের সাথে কথা বলত।

- পাবলিক রিলেশন ও মিডিয়া কমিটি। এটার মূল অফিসও ছিল ক্যাম্পের বাইরে। এ কমিটির মূল পরিচালক ছিলেন আবু হুসাইন আল-মাসরি এবং আবু আনাস আল-ইয়েমেনি।

- আর্থিক কমিটি। পরিচালক আবু সাঈদ আল-মাসরি ছিলেন ফান্ডের ডিরেক্টর। পে-রোলের দায়িত্বের ছিলেন ফাতিহ আল-মাসরি। আল-কায়েদার সব আর্থিক বিষয়াশয় এ কমিটিই দেখাশোনা করে। প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের বাজেট, আল-কায়েদা সদস্যদের বেতনসহ সবকিছু এই কমিটির মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

- কান্দাহারের গেস্ট হাউজ (শহরের কেন্দ্রে)। এর অনেকগুলো নেতা ছিল—আবু সুহাইব আল-তায়েজি (রিসিপশন), মুসআব আল-হাশিদি (রেকর্ড সংরক্ষণ), আবু খুলাইদ আল-ইয়েমেনি (পাবলিক রিলেশন) এবং মাইসারা আল-তায়েজি (আর্থিক বিষয়াশয়ের পরিচালক)। সব নতুন সদস্যদেরকে এখানে গ্রহণ করা হতো।

- যোগাযোগ কমিটি। পরিচালক ছিলেন সাঈদ আল-মাসরি। এর অফিসও ছিল সামরিক কমিটির বিল্ডিংয়ে। সব এনক্রিপ্টেড সামরিক চিঠিপত্র, যোগাযোগের বিষয়াশয় এখানেই গ্রহণ ও প্রেরণ করা হতো।

- ব্যাচেলর হাউজ। তারনাক ফার্মের ভেতর ছিল এদের মূল আবাস। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এখানে থাকত একদম অবিবাহিত মুজাহিদরা। ক্যাম্পের অন্যান্য আবাসনে যাদের সাথে পরিবার ছিল, তাদের বেশি প্রাধান্য দেওয়া হতো এ ব্যাচেলর হাউজের আমির ছিলেন আবু মাহজান আল-তায়েফি।

- ফার্ম কমিটি। আবু হাম্মাম আল-সাঈদি ছিলেন এ গ্রুপের নেতা। এ গ্রুপটি কান্দাহারে আল-কায়েদার সব জমিজমার দেখাশোনা করত। এর কাজ ছিল মূলত কৃষি ও উর্বর জমি নিয়ে। আল-সাঈদীর সহকারী ছিলেন আবু খলিল আল-মাদানি এবং খলিফা আল-মাসরি।

- ফ্রন্ট লাইন কমিটি। এ কমিটি ছিল সামরিক কমিটির শাখা। এর নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল হাদি আল-ইরাকি। এ গ্রুপের কাজ ছিল যুদ্ধের ময়দানে যোদ্ধাদের রসদ সরবরাহ করা।

- প্রশিক্ষণ ক্যাম্প কমিটি। এ কমিটির প্রধান ছিলেন আবু মুহাম্মদ আল-মাসরি। আর্টিলারি ট্রেনিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন আবু ইব্রাহিম আল-ইয়েমেনি। সামরিক ও মৌলিক প্রশিক্ষণের কাজগুলোর দায়িত্বে ছিলেন হামজা আল-দুসি, হুসাম আদ-দীন আল-হিময়ারি এবং তালহা আল-মাক্কি।

এই সবগুলো কমিটি আল-কায়েদা নেতাদের সাথে প্রতিনিয়ত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিত। তারা তাদের সিদ্ধান্তগুলো আল-কায়েদার কেন্দ্রেও জানাত।

আল-কায়েদার সব ছোটখাটো সিদ্ধান্ত এবং ঘটনা তারা কম্পিউটারে জমা করে রাখত। প্রতিটি কমিটির জন্য আলাদা কম্পিউটার ছিল, কিন্তু সেগুলো ইন্ট্রানেট বা ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত ছিল না। এগুলো সবগুলোই সামরিক কমিটির বিল্ডিংয়ে ছিল।

যোগাযোগের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিন লাদেন ও আল-কায়েদা খুবই সচেতন ছিল। তারা খুব ভালোভাবেই জানত যে, আমেরিকার স্যাটেলাইট ও নজরদারির যন্ত্রপাতি তাদের কথা, ম্যাসেজ ও চিঠি বের করে ফেলতে পারবে।

শায়খ ব্যবহার করতেন জাপানি কোম্পানি ইয়েসুর বানানো রেডিও ট্রান্সমিশন সিস্টেম। এটি মূলত সূর্যের আলোর শক্তিতে চলত। এটা দিয়েই তিনি গেস্ট হাউস, ক্যাম্প ও আফগানিস্তানে আল-কায়দার অন্যান্য সকল স্থাপনায় যোগাযোগ রাখতেন।

এই মেসেজগুলো থাকত এনক্রিপটেড। প্রথমে শব্দগুলোকে নম্বরে রূপান্তর করা হতো। কিবোর্ডে ইংরেজি অক্ষরগুলো আরবি অক্ষর দিয়ে ঢাকা থাকত। এ কাজে ব্যবহৃত হতো একপ্রকার পকেট কম্পিউটার (Casio FX-795P)। এ কম্পিউটারের পাল্টে দেওয়া কিবোর্ডে অপারেটর ম্যাসেজটি লিখতেন। তারপর Enter ক্লিক করলেই প্রোগ্রামের মাধ্যমে ম্যাসেজটি নম্বরে পরিবর্তিত হয়ে যেত। তারপর সিস্টেম জিজ্ঞেস করত যে ম্যাসেজটি কোন এলাকায় পাঠানো হবে। জায়গার নাম বলে দেওয়ার পরই নতুন এক ধরনের নম্বর সিরিজ স্ক্রিনে দেখা যেত। আর এটাই হলো সেই নাম্বার যেটা অপারেটর নেটওয়ার্কে প্রেরণ করত। তারপর এই ম্যাসেজটি যে গ্রহণ করত সে এই নম্বরগুলো নিজের ডিভাইসে লিখত। তারপর Enter ক্লিক করলেই ম্যাসেজ ডিক্রিপ্ট হয়ে যেত। তারপর ম্যাসেজটি সেই স্থানের আমির বা ওসামা বিন লাদেনের কাছে প্রেরণ করা হতো।

আবু তারিক আল-তুনিসি এ সকল সিস্টেম ও ম্যাসেজ ঠিক করে প্রতিনিয়ত কান্দাহারে প্রেরণ করতেন। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কান্দাহার ক্যাম্পের মূল যোগাযোগ পরিচালক ছিলেন আবু সাঈদ আল-মাসরি। নর্দান অ্যালায়েন্সের বিরুদ্ধে ফ্রন্টলাইনে তালেবানের সাথে যোগাযোগ, আল-কায়েদা গেস্ট হাউস, এবং বিন লাদেন ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল নেতাদের সাথে যোগাযোগ—এসকল বিষয় আরেকটি বহনযোগ্য ইয়েসু সিস্টেম বা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। কিন্তু সেটার কষ্ট কম ছিল। এটি মূলত আল-কায়েদার বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত রেডিও এন্টেনার মাধ্যমে তথ্য প্রেরণ করত।

ওসামা বিন লাদেন নিজে এসকল যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করতেন না। সকল ইলেকট্রনিক সিস্টেমের দায়িত্বে ছিলেন আবু সাঈদ আল-মাসরি। কাবুলের গেস্ট হাউজের দায়িত্বে ছিলেন আবু আম্মার আল-ধালী। সংগঠনের তিনটি মূল যোগাযোগ কেন্দ্র ছিল জালালাবাদ, কাবুল ও কান্দাহার।

সে অঞ্চলগুলোতে 7000 কিলোহার্টজের ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করা হতো। ব্যক্তিগত যোগাযোগের ক্ষেত্রে ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক করে দেওয়া হতো। সেই ফ্রিকোয়েন্সির আলাদা নাম দেওয়া হতো। এই সিস্টেমে কেউ যদি কারো সাথে যোগাযোগ করতে চাইত, তাহলে তাকে আগে শ্রোতার কাছে একটি ম্যাসেজ পাঠিয়ে ফ্রিকোয়েন্সির নাম বলে দিতে হতো। যেমন, "ব্যবহার করুন মোহাম্মদ"। এরপর শ্রোতা ঐ ফ্রিকোয়েন্সিতে টিউন করত এবং বক্তা সেই ফ্রিকোয়েন্সিতে ট্রান্সমিট করত। ফ্রিকোয়েন্সি ও সেগুলোর পাসওয়ার্ড তিন মাস অন্তর আল-কায়েদার সামরিক কমিটি

কর্তৃক পরিবর্তন করা হতো। আর এভাবেই উপরোক্ত তিনটি মূল কেন্দ্রের মধ্যে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করা হতো।

তালেবান ও আরবরা যখন পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করতে চাইত (উদাহরণস্বরূপ, যুদ্ধের ময়দানে) তখন একদিকে অনুবাদ করার জন্য থাকত আরবি বলতে জানা তালেবান অপরদিকে থাকত পশতু বলতে জানা আরব।

ঘটনাক্রমে আল-কায়েদার সামরিক কমিটি একসময় 'পাম পাইলট'-এর একটি বাণিজ্যিক সংস্করণ ব্যবহার করা শুরু করে।

বিন লাদেনের অফিস ও আল-কায়েদার গণমাধ্যম বিভাগ

ওসামা বিন লাদেনের কর্মক্ষেত্রে তিনটি রুম ছিল—তার আসল অফিস, একটি লাইব্রেরি এবং অপর রুমে শরিয়াহ কমিটির মৌরিতানিয়ান ছাত্ররা থাকত।

তার অফিসের দেওয়ালে কেবল একটি হাতে আঁকা মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র ঝুলত। তার অফিসটি একটি গালিচা এবং একটি ফোম ম্যাট্রেস দিয়ে সজ্জিত ছিল। অফিসের গৃহসজ্জা ছিল স্পার্টান। সেখানে একটি ছোট সিন্দুক ছিল যেটায় পরিকল্পনার কাগজপত্র রাখা হতো। পাশের লাইব্রেরিতে মেঝে থেকে ছাঁদ পর্যন্ত বই ছিল। ইতিহাসের বই, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের বই, সর্বোপরি ইসলামি রেফারেন্স বই যেগুলো থেকে বিন লাদেন পরামর্শ নিতেন, যেমন ধরুন কোনো প্রজ্ঞাপন লেখার সময়। তৃতীয় রুমটি ছিল একটি লিভিং রুম। সেখানে মৌরিতানিয়ানরা থাকত গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটারগুলোও ঐ রুমে রাখা ছিল। গবেষণার একটি উদাহরণ হতে পারে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে বিন লাদেনের জারি করা ফতোয়াগুলো।

ল্যাপটপ ছাড়াও শায়খের কাছে একটি সনি ট্রানজিস্টর রেডিও ছিল। এটি পাকিস্তান থেকে কেনা হয়েছিল। তিনি আমাকে এই আরবি ভাষার রেডিও স্টেশনগুলোয় টিউন ইন করতে বলতেন : Deutsche Welle, Radio Monte-Carlo, BBC, The Voice of America, The Voice of Mecca এবং Radio Kuwait.

শায়খ ওসামা বেশিরভাগ সময় সন্ধ্যায় রেডিও শুনতেন। কিন্তু আল-কায়েদার কান্দাহার মিডিয়া সেন্টারে যত প্রাসঙ্গিক তথ্য ছিল, সে সম্পর্কে তিনি আপ-টু-ডেট থাকতেন। আল-কায়েদার কান্দাহার মিডিয়া সেন্টারে ছিল টেলিভিশন ও লেটেস্ট অডিও-ভিজ্যুয়াল সরঞ্জামাদী।

প্রতি বৃহস্পতিবার আমরা পাকিস্তান থেকে ভিডিও ও সিডি পেতাম, যাতে থাকত আগের সপ্তাহের প্রধান প্রধান খবর। এই ভিডিওগুলো তৈরির দায়িত্বে ছিলেন হামজা আল-ঘামদি। আমি যে গ্রুপের সাথে তাজিকিস্তান গিয়েছিলাম, তিনি সেই গ্রুপের আমির ছিলেন। তিনিই আল-কায়েদার অনলাইন মিডিয়া প্রোডাকশন হাউজ আস-সাহাব (মেঘ) শুরু করেন, যা আজ পর্যন্ত চালু আছে।

পাকিস্তানে বসে আবু হাফস আল-সিন্দি সাপ্তাহিক প্রেস রিভিউর সম্পাদনা করতেন। তিনি সেখানে আমাদের প্রেস ও মিডিয়াবিষয়ক সমস্ত কাজ করতেন। তিনি কেত্তায় গিয়ে সেখানে সিডিটা নিয়ামাতুল্লাহর হাতে দিতেন, যিনি এটি আমার কাছে কান্দাহারে নিয়ে আসতেন। নিয়ামাতুল্লাহ ছিলেন একজন আফগান।

নিয়ামাতুল্লাহ বিভিন্ন কারণেই এমন যাত্রা করতেন—তহবিল বহন, আহত যোদ্ধাদের নিয়ে আসা, পরিবারগুলোর স্থানান্তরে সহায়তা করা বা নতুন আগতদের সাহায্য করা।

প্রেস রিভিউটি ছয়টি ভাষা থেকে অনুবাদ করা হতো—ফরাসি ভাষা থেকে অনুবাদ করতেন মরোক্কোর এক ভাই, জার্মান ভাষা থেকে অনুবাদ করতেন একজন ধর্মান্তরিত মুসলিম জার্মান, রাশিয়ান ভাষা থেকে অনুবাদ করত দক্ষিণ ইয়েমেনের এক যুবক, ইংরেজি থেকে অনুবাদ করতেন কয়েকজন মিশরীয়, স্প্যানিশ ভাষা থেকে অনুবাদ করতেন একজন সিরিয়ান, যিনি আগে স্পেনে থাকতেন এবং পশতু থেকে অনুবাদ করতেন একজন আফগান। এর প্রিন্ট-আউটগুলো প্রতি বৃহস্পতিবার প্রত্যেক আল-কায়েদা নেতার কাছে পৌঁছে দেওয়া হতো; ওসামা, আবু হাফস, ডা. আল-জাওয়াহিরি এবং আবু মুহাম্মদ আল-মাসরি। খোস্ত, কাবুল এবং জালালাবাদেও এর কপি পাঠানো হতো। এক কপি আমার কাছেও আসত, কারণ, তারা দেখত যে আমি সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে আগ্রহী। পরের দিন প্রেস রিভিউটির একটি সারাংশ সকলকে দেওয়া হতো।

এছাড়াও প্রত্যেক অনুবাদক যে ভাষায় পারদর্শী সেই ভাষায় সংবাদ শুনতেন এবং মূল টপিকগুলোর একটি সারাংশ লিখতেন।

১৯৯৯-এ বিন লাদেন আবু আনাস আল-মাক্কিকে আল-কায়েদার মিডিয়া প্রধান নিযুক্ত করেন। তার ছদ্মনাম ছিল হাসান আল-বাহলুল। তিনি বিন লাদেনের কিছু বক্তব্য রেকর্ড করতেন। এছাড়াও আয়মান আল-জাওয়াহিরির মতো আল-কায়েদার অন্যান্য নেতাদের বক্তব্যও রেকর্ড করতেন। তাকে টেলিভিশন দেখতে হতো এবং

তিনি যেসকল বিষয়কে প্রাসঙ্গিক মনে করতেন সেগুলো শাখাকে দেখানোর জন্য রেকর্ড করে রাখতেন।

বিন লাদেন বাহলুলকে ইউএসএস কোল আক্রমণের পরের ১০০ মিনিটের ভিডিও বার্তাটি রেকর্ড করতে বলেছিলেন। বিন লাদেন চেয়েছিলেন যে, এই ভিডিও বার্তা কুরআনের আয়াত দিয়ে শুরু করা হবে এবং শেষ করা হবে, যা তিলাওয়াত করেছিলেন আবু হাজর আল-ইরাকি। তিনি ছিলেন একজন কুর্দি বিশেষজ্ঞ। তিনি সুদানে আল-কায়েদার পক্ষে কাজ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি জার্মানিতে চলে যান যেখানে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং তারপরে তাকে আমেরিকার কাছে প্রত্যর্পণ করা হয়। তিনি এখনো আমেরিকায় কারাগারে আছেন। এই ভিডিওতে ইউএসএস কোল হামলার ওপর রচিত বিন লাদেনের একটি কবিতাও ছিল :

এক বিনাশিনী—সাহসীরাও তার ক্ষমতার ভয়ে ভীত
সে আতঙ্ক ছড়ায় ডাঙায় এবং উন্মুক্ত সমুদ্রে
সে ঢেউ কেটে চলছে
দম্ভ, ঘৃণা ও ক্ষমতার মোহে সজ্জিত হয়ে
ধীরে ধীরে নিজের ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলছে সে
ঢেউয়ের উপরে চড়ে এক ডিঙি তার অপেক্ষায়

বাহলুল তার ইমানের প্রতিটি মিলিগ্রাম জিহাদে এবং তার সমস্ত শক্তি এই ভিডিওতে ঢেলে দিয়েছেন। এটি আস-সাহাবের তৈরি সবচেয়ে সেরা রিক্রুটমেন্ট ফিল্ম ছিল। এর অন্তর্নিহিত ধারণাটি ছিল আমেরিকার বিরুদ্ধে পুরোপুরি বিপ্লবের জন্য উম্মাহকে জাগ্রত করা।

বাহলুল যে ভূমিকায় ছিলেন, সেখানে তাকে আল-কায়েদার অপারেশনগুলো সম্পর্কে কিছু জানার প্রয়োজন ছিল না। শহিদদের নির্মিত ভিডিওগুলো তাদের নিজস্ব সৃষ্টি নয় বরং তা সরাসরি আল-কায়েদার সামরিক কমিটি দ্বারা তদারকি করা হতো। বিন লাদেন নিজে এই ভিডিওগুলো বিতরণের বিষয়টি সামলাতেন। এমনকি ভিডিওগুলো যেন প্যান-আরব টেলিভিশন স্টেশন আল-জাজিরায় পৌঁছায় তা-ও তিনি নিশ্চিত করতেন।

বিন লাদেনই ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেছিলেন, যেন তালেবানরা তাদের কম্পিউটারে মাইক্রোসফট উইন্ডোজ 98 সফ্টওয়্যার ইনস্টল করে নেয়। তাদের প্রকাশনা 'The Islamic Emirate' প্রকাশ করতে তাদের উইন্ডোজের আরবি সংস্করণ প্রয়োজন ছিল।

মাঝেমধ্যে শায়খ তার ছেলে মুহাম্মদকে দিয়ে 'বিশেষ ভিডিও' আনাতেন। কিন্তু কেউ জানত না সেগুলো কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত ছিল।

আস-সাহাব; যে সংস্থাটি এখনও আল-কায়েদার বার্তা এবং প্রজ্ঞাপনগুলো প্রকাশ করে, তার নাম বিন লাদেনেই ঠিক করেছিলেন।

আল-কায়েদা ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ

আল-কায়েদায় নতুন অংশ নেওয়ার পর প্রত্যেককেই প্রথমে কিছু প্রাথমিক সেশন সম্পন্ন করতে হয়। কান্দাহারে আল-কায়েদার ঘাঁটির পাবলিক রিলেশনের প্রধান মূলত এগুলোর দয়িত্বে থাকেন। এসব সেশনে ধৈর্যের ওপর জোর দেওয়া হতো। আর যারা সর্বোচ্চ যোগ্যতা, শৃঙ্খলা ও ধৈর্য প্রদর্শন করতে পারত তাদের জন্য বিভিন্ন পুরস্কারের ব্যবস্থাও থাকত সেখানে।

তারপর জিহাদিদের ট্রেনিং ক্যাম্পে পাঠানো হতো। তিনি তাদের ছোটখাটো কিছু লেকচার দিতেন। সেখানে বাস্তব জ্ঞান, শৃঙ্খলা, প্রশাসনিক বিষয় ও সামরিক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জানানো হতো। প্রথমে তারা হালকা অস্ত্র, আর্টিলারি, বিমানবিধ্বংসী মিসাইল, টপোগ্রাফি, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ছোটখাটো বিস্ফোরক নিয়ে প্রশিক্ষণ নিত। তারপরে ছিল গেরিলা রণকৌশলের ওপর একটি এডভান্সড কোর্স। চূড়ান্তভাবে তারা বাস্তব প্রশিক্ষণে অংশ নিত। সেখানে কাল্পনিক টার্গেটের ওপর হামলা করতে হতো। এখানে মূলত ধৈর্য এবং শৃঙ্খলা দেখে রিক্রুটদের মধ্য হতে আল-কায়েদার নেতারা আরও বড় প্রশিক্ষণের জন্য বাছাই করতেন।

উদাহরণস্বরূপ, কাবুলে সাঈফ আল-আদেল একটি সেশন পরিচালনা করতেন। সেখানে তিনি শেখাতেন, যুদ্ধবন্দিদের সাথে কেমন আচরণ করতে হয়, কীভাবে ধরা পড়া টার্গেটকে নিয়ে কাজ করতে হয়। তিনি তার ছাত্রদেরকে নিজে বাছাই করতেন। ইয়াকুব হারুন আমাদের হাতে হাতে লড়াই, কালাশনিকভ ও মেশিনগান চালানো শেখাতেন। কিন্তু তার কোর্সগুলো ছিল খুব বেশি গোপনীয়। তার ছাত্ররা বাদে কেউ তার কোর্সগুলো সম্পর্কে জানত না। তার প্রতি সেশনে মাত্র ৩/৪ জনের গ্রুপ থাকত। আবু ইয়াহইয়া আল-কিনি এসব ট্রেনিং সেশনে উপস্থিত থাকতেন।

আল-ফারুক ক্যাম্পে আবিদ আল-ওয়াকিল আমাদের নাশকতা (sabotage) এবং শহরে গেরিলা যুদ্ধপদ্ধতির কোর্স নিতেন। স্পেশালিস্ট আর্টিলারি কোর্সও ছিল, যেটা করাতেন আবদুল্লাহ নামের এক আফগান।

তারনাক ফার্মে আল-কায়েদার তিনজন সদস্য নিজেদের বাসায় 'বিশেষ নির্দেশনা' দিতেন। আবু তারেক আত-তুনিসি ও আবু খালেদ আল-হাবিব রিক্রুটদের শেখাতেন কীভাবে ডেটোনেটর, গ্রাউন্ড-টু-এয়ার মিসাইল স্যাম ৭, স্টিঙ্গার, এন্টি ট্যাংক মিসাইলের জন্য ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট তৈরি করতে হয়। তবে বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরিতে আবদুর রহমান আল-মুহাজির ছিলেন আল-কায়েদার সেরা। এই তিনজন কর্তৃক পরিচালিত কোর্সগুলো যে করতে চাইত তাকে অবশ্যই আগে ওসামা বিন লাদেনের অনুমতি নিতে হতো।

প্রত্যেক নতুন সদস্যকে প্রধান রেফারেন্স বই হিসেবে "জালিমের বিরুদ্ধে জিহাদের একটি সামরিক পাঠ" (*A Military Study of Jihad against the Tyrants*) বইটি পড়তে হতো। আর্টিলারি, গেরিলা যুদ্ধপদ্ধতি, রাসায়নিক অস্ত্র সম্পর্কেও অসংখ্য বই পড়তে হতো। সোভিয়েতবিরোধী আফগান জিহাদের সময় সৌদি, সিরিয়ান ও মিশরীয় একদল সামরিক বিশেষজ্ঞ এই বইগুলো লিখেছিলেন। এই সাবেক-অফিসাররা আল-কায়েদায় যুক্ত হওয়ার জন্য নিজ নিজ সেনাবাহিনী ছেড়ে এসেছিলেন।

এই লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন আবু বুরান আল-সুরি। তিনি আফগান জিহাদের ওপর ১২ খণ্ডের একটি এনসাইক্লোপিডিয়া লিখেছেন। ১৯৮২ সালে হামায় হাজারো ইসলামপন্থী হত্যাকাণ্ডের সময় তিনি সিরিয়ান আর্মি থেকে ইস্তফা দেন।

কান্দাহারে আল-কায়েদার আরও কিছু ক্যাম্প ছিল। মুজামা ৬ ছিল পাহাড়ের দিকে, বাইত আল-রুমান স্কুলের কাছে। আমেরিকা যখন দারুস সালাম ও নাইরোবির দূতাবাসে হামলার প্রতিশোধ নেয়, সেই সময় বিন লাদেন ও তার নিকটজনরা এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পেট্রোল স্টেশনের পাশে বাইত আল-রুমান নামে একটি পুরোনো আফগান স্কুল ছিল। আল-কায়েদা একে মাদরাসায় রূপান্তরিত করে। মাঝেমধ্যে শায়খ ওসামা এখানে তার ছাত্রদের সাথে আলোচনায় বসতেন।

কাবুলের কার্ট ব্রাউন কোয়ার্টারে আল-কায়েদার একটি গেস্ট হাউজ ছিল। যার নাম খান ঘুলাম পাতশেহ। এটা ছিল আফগানিস্তানের সাবেক রাজার প্রাসাদের একাংশ। আমার জানামতে ২০০১ সালের বসন্তের আগপর্যন্ত বিন লাদেন শেষ কাবুলে যান ১৯৯৯ সালে। তালেবান তখন তাকে নিউ মার্কেটের (শাহের নৌ) পাশে একটি বাসা দেয়। এটি ছিল একটি পুরাতন দুই তলা হোটেল। এটি ছিল সুকের (বাজার) মাঝখানে। এটি চারপাশে দেওয়াল দ্বারা বেষ্টিত ছিল।

আল-কায়েদার চারটি সামরিক ঘাঁটি ছিল। সবগুলোই ছিল পাহাড়ে, যুদ্ধের ময়দানের কাছে। এগুলোর নাম রাখা হয়েছিল শহিদদের নামে—আবু আস্তা, আল-বারুন্দ, আবিদ আল-মালিক ও মোহানাদ।

আল-কায়েদার 'মূল হোতারা'

আমি আল-কায়েদা নেতাদের সম্পর্কে একটি ভালো চিত্র দিতে পারব আপনাদেরকে। তাদের সাথে কয়েকমাস ছিলাম কি না!

আবু হাফস আল-মাসরি (আসল নাম মুহাম্মদ আতিফ) ছিলেন শায়খ ওসামার সেসময়কার নায়েব তিনি ছিলেন আল-কায়েদার মিলিটারি ব্রাঞ্চের প্রধান। তিনি 'কমান্ডার' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনিই ছিলেন একমাত্র মিশরীয়, যার আদেশ আমি মানতাম। আবু হাফস ছিলেন একজন যোদ্ধা, এমনকি হতে পারে শায়খের চেয়েও বড় মাপের একজন যোদ্ধা। তিনি হাতে আঘাত পেয়েছিলেন। মিশরীয় পুলিশের এই প্রাক্তন অফিসারের নেতৃত্বের দক্ষতা ছিল দুর্দান্ত। তিনি আল-কায়েদার অন্যান্য নেতাদের মতো ছিলেন না, তিনি তার অধীনস্থদের সাথে ভালো আচরণ করতেন।

বিন লাদেনের সাথে আবু হাফসের পরিচয় অনেক আগ থেকে। তারা দুজন আশির দশকে আফগান জিহাদে পাশাপাশি লড়েছেন। জাজির যুদ্ধে আবু হাফস এক রুশ অফিসারকে হত্যা করেন। এরপর ওয়াকিটকির মাধ্যমে শায়খকে বলেন যে তার পায়ের নিচে এক কমিউনিস্ট আছে। পরবর্তী সময়ে তিনি সোমালিয়ায় লড়াই করেছিলেন। আবু হাফস আমাদের চেয়ে বয়সে কিছুটা বড় ছিলেন। অন্যান্য জিহাদিদের সাথে আচরণেই তার অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হতো। তার সামরিক দায়িত্বের দরুন তাকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন থাকতে হতো। কখনো কখনো আমরা পুরো সপ্তাহ তার দেখা পেতাম না। ২০০১-এর নভেম্বরে আমেরিকার এক বোমা হামলায় তিনি শহিদ হন।

সাইফ আল-আদেল ওসামা বিন লাদেনের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন এবং সবসময় তার সাথে থাকতেন। এছাড়াও তিনি আল-কায়েদার প্রধান নথি-সংরক্ষক ছিলেন। তিনি আমার তাৎক্ষণিক উর্ধ্বতন ছিলেন। তিনি একজন দক্ষ প্যারাশুটিস্ট ছিলেন। সাইফ আল-আদেল মিশরীয় সেনাবাহিনীর স্পেশালিস্ট ইউনিটে ছিলেন। আমরা একে অপরকে শ্রদ্ধা করতাম কিন্তু আমরা উভয়ই ছিলাম একগুঁয়ে স্বভাবের। আরব উপদ্বীপের জিহাদিরা তাকে বেশি একটা পছন্দ করত না এবং তাদের মধ্যকার

সম্পর্কে টানাপোড়েন লেগেই থাকত। আল-আদেল তাদের বিভিন্ন কারণে অনেকবারই হুমকি দিয়েছিলেন। পুরানো এক আঘাতের কারণে তার ডান চোখের নিচে দাগ পড়েছিল। তার ডান হাতও অন্য এক আঘাতের চিহ্ন বহন করছিল। তার পাঁচ সন্তান ছিল। ৯/১১-এর পর তিনি ইরানে পালিয়ে যান।

আয়মান আল-জাওয়াহিরি মিশরীয় ইসলামপন্থীদের আমির। এই বই লেখার সময় আল-কায়েদার দ্বিতীয় প্রধান নেতা[১৪]। বলা হয় যে তিনি আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যবর্তী উপজাতীয় অঞ্চলে আত্মগোপন করে আছেন।

আবু মুহাম্মদ আল-মাসরি আবু আত্তার মৃত্যুর পর ক্যাম্প ফারুকের দায়িত্ব নেন। তিনি খুবই ধার্মিক ছিলেন। তিনি ইসলামি ধর্মতত্ত্ব নিয়ে লেখাপড়া করেছেন। এছাড়াও তিনি কাবুলের আঞ্চলিক কমান্ডার ছিলেন। আমার মনে আছে, আমি তাকে কাবুল ও পরে আফগানিস্তান ছেড়ে কোনো এক অজানা গন্তব্য যেতে দেখেছিলাম। পরে দারুস সালাম ও নাইরোবিতে হামলা তিন সপ্তাহ পূর্বে তিনি ফিরে এলেন তিনিই ছিলেন আল-কায়েদা পরিচালিত প্রথম হামলার পেছনের মাথা।

হুয়াম আদ-দীন এক প্রচলিত আরবি বাচনভঙ্গিতে কথা বলতেন। মাসউদের বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি শহিদ হন।

খাল্লাদ (আসল নাম তাওফিক মুহাম্মদ বিন আত্তাশ)-এর জন্ম সৌদি আরবে কিন্তু তার পরিবার ইয়েমেনি বংশদ্ভূত। তিনি সবসময় বিন লাদেনের সাথে থাকতেন এবং আল-কায়েদা প্রধানের প্রতি তার পরম আনুগত্যের জন্য পরিচিত ছিলেন মাসউদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে খাল্লাদ এক পা হারান। আফগানিস্তানের এক এনজিও তার চিকিৎসা করান। কিন্তু তারা তাকে ধাতুর যে নকল পা দিয়েছিল, সেটা তার আরও সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নতুন আরেকটা নকল পা লাগিয়ে আনার জন্য তাকে মালয়েশিয়া পাঠানো হয়। শায়খ ওসামা তাকে আফগানিস্তানের বাইরে একটি মিশনে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আল-কায়েদার অন্তঃচক্রের সদস্য ছিলেন।

বিন লাদেনের সাথে খাল্লাদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। বিন লাদেনের সাথে তার মতো করে কেউ কথা বলত না। একদিন খাল্লাদ আমাকে গোপনে বললেন যে 'আবু আবদুল্লাহ' (বিন লাদেন) তার বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজে দেবেন, যা বিন লাদেনের দিক থেকে সম্মান প্রদর্শনের একটি চিহ্ন ছিল। জিহাদিদের মধ্যে খাল্লাদের বেশ ভালো প্রভাব ছিল। যদি কোনো মুজাহিদ বিন লাদেনের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত

১৪. ২রা মে, ২০১১ তারিখে বিন লাদেন হত্যাকাণ্ডের পর আল-জাওয়াহিরি আল-কায়েদার নতুন প্রধান হন।

করতে চাইত, তবে তাকে আগে খাল্লাদের কাছে যেতে হতো, যার সর্বদা শায়খের কাছে সরাসরি প্রবেশাধিকার ছিল। খাল্লাদ প্রায়শই এ ধরনের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতেন। উদাহরণস্বরূপ, খাল্লাদের কারণই ইব্রাহিম আস-সুরি গোপনে শায়খের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে পেরেছিলেন। আমি সেই সময় জানতাম না যে আস-সুরি খোস্তের ক্যাম্প ফারুকের আমির হাসান আল-ঘামেরীর সাথে মিলে ইউএসএস কোলে হামলা চালাবে।

খাল্লাদের চার ভাইকে বিন লাদেনের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন তাদের বাবা মুহাম্মদ সালেহ বিন আত্তাশ। তিনি এখন সানাআয় থাকেন। ছেলেদের করুণ পরিণতিতে তিনি শোকাহত।

ইউএসএস কোল হামলার সাথে জড়িত থাকার জন্য খল্লাদকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তাকে প্রথমে তথাকথিত 'অন্ধকার কারাগারে' বন্দি করা হয় এবং পরে গুয়ান্তানামোতে প্রেরণ করা হয়।

মোহানাদ আল-জাদাউয়ী খাল্লাদের ভাইদের একজন। ১৯৯৭-এ কাবুলে তালেবানের হয়ে মাসউদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি নিহত হন। এই লড়াইয়েই খাল্লাদ তার এক পা হারান। মোহানাদ ১৯৮৮-তে আফগানিস্তানে আসেন এবং খালদান ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নেন। ১৯৯৪-এ তিনি খাল্লাদকে ও ১৯৯৬-এ তার আরও দুই ভাই, উমায়ের এবং আবু আল-বারাকে নিয়ে আসেন। চতুর্থ ভাই মুয়াজ ১৯৯৯ সালে আসেন এবং লোঘার ক্যাম্পে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন।

আবু আল-বারা খাল্লাদের ভাইদের আরেকজন। তিনি বিন লাদেনের খুব কাছের ছিলেন। ১৯৯৯ সালে ইয়েমেনে তাকে আটক করা হয়। তার বাবা তাকে আফগানিস্তানে পাঠিয়েছিলেন কারণ, তিনি চিন্তিত ছিলেন তার ছেলে হয়তো মাদক গ্রহণ করছে। ১৯৯৭-এ তিনি তার ভাই উমায়েরের সাথে সৌদি আরবে চলে যান। কিন্তু পরের বছরই খালদান ও জিহাদ ওয়াল ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য ফিরে আসেন। ১৯৯৮-এ নাইরোবিতে হামলার পর তিনি শায়খের কাছে থেকে সৌদি আরবে ফিরে যাওয়ার অনুমতি পান। আফ্রিকান বোমার জন্য আমেরিকানদের প্রতিশোধ নেওয়ার সময় তিনি খোস্তে ছিলেন। তিনি ২০০৬ সালে সোমালিয়ার যুদ্ধে হন।

আবদুর রহমান আল-মুহাজির ছিলেন ক্যাম্প কান্দাহারের বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন ও ভূতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। তারনাক ফার্মে তার বাড়িতে তিনি ছাত্রদের আলাদা আলাদা পড়াতেন। দীর্ঘদিন যাবত প্রশ্বাসের সাথে

রাসায়নিক দ্রব্য যাওয়ার ফলে তার ফুসফুসের ক্ষতি হয়েছিল, যার দরুন তিনি বেশিদূর হাঁটতে পারতেন না। যখন তিনি বিদেশে যেতেন তখন বিন লাদেনের ইনার সার্কেলের সবাই জানত যে তিন কেবল কোনো অপারেশনের কাজে যাচ্ছেন এবং শায়খের দুআ নিয়েই যাচ্ছেন। আল-মুহাজিরের স্ত্রী ছিলেন মিশরীয়। তাদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে ছিল।

তিনি তার বাসায় একটি ল্যাবরেটরি সেটআপ করেছিলেন। মুজাহিদ ভাইদের অনেকেই তার বাড়িতে যেতেন না এই ভয়ে যে কোনো দুর্ঘটনাজনিত বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। ১৯৯৯-এ এমনই এক দুর্ঘটনা ঘটতে ঘটতে ঘটেনি। আল-মুহাজিরের স্ত্রী তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। চেকআপের জন্য তাকে নিয়ে আল-মুহাজির কাবুলের এক হাসপাতালে গিয়েছিলেন। এই সময় আল-কায়েদার আরেক নেতার দুই বাচ্চা একটি খোলা জানালা দিয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢুকে পড়ে। বিন লাদেনের খুব কাছের একজন উপদেষ্টা ল্যাবরেটরির পাশ দিয়েই যাচ্ছিলেন। তিনি ভেতর থেকে হাসির শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি ভেতরে গিয়ে দেখলেন বাচ্চা দুটো টেস্টটিউব নিয়ে খেলছে।

নাইরোবি ও দারুস সালামের হামলার এক মাস আগে আল-মুহাজির কান্দাহারে থেকে চলে যান এবং হামলার এক সপ্তাহ আগে ফিরে আসেন। তিনি আফগানিস্তানে শহিদ হন।

আবু উমর আল-মাসরি কাবুল গেস্ট হাউজের দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়াও তিনি যুদ্ধের সরঞ্জাম ক্রয়ের দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন কারণ, তার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল হিসাবরক্ষণ। ১৯৯৮ সালে আল-কায়েদায় যোগদানের আগে তিনি 'মিশরীয় ইসলামি জিহাদ'-এর সদস্য ছিলেন। তার বর্তমান অবস্থান অজ্ঞাত।

আবু খালিল আল-মাদানি ১৯৮০-র দশকের শেষদিকে জাজির যুদ্ধের একজন বিজ্ঞ মুজাহিদ। তিনি শায়খকে অনুসরণ করে প্রথমে সুদানে যান এবং পরে আফগানিস্তানে ফিরে আসেন। তিনি ছিলেন কৃষ্ণবর্ণের এবং বিন লাদেনের প্রায় সমবয়সী। তিনি বিন লাদেনের ফার্মে কাজ করতেন। শেষমেশ তার কী হয়েছিল তা আজ অবধি জানা যায়নি।

শাকের আল-মাসরি ক্যাম্পের মসজিদের মুয়াজ্জিন ছিলেন। তিনি সেখানে তার পরিবারের সাথে থাকতেন। কান্দাহারে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

আবু আসেম আল-মাঘরিবী বিন লাদেনের দ্বিতীয় স্তরের সুরক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সুদান থেকেই তিনি শায়খের সাথে ছিলেন। আবু

আসেম ক্যাম্পেই থাকতেন। বিন লাদেনের সুরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি বিন লাদেনের ফার্মগুলোর দায়িত্বে ছিলেন, বিশেষত কান্দাহার বিমানবন্দরের নিকটবর্তী জমিতে গম উৎপাদনের দায়িত্বে ছিলেন। ২০০১ সালের শেষে আফগানিস্তানে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি এখনো মরক্কোর কারাগারে আছেন।

আওস আল-মাদানি (ছদ্মনাম আল-হাসান) কৃষ্ণবর্ণের ত্বক, কোঁকড়ানো কালো চুল, মসৃণ চামড়াযুক্ত একটি আয়তাকার মুখের ব্যক্তি। সেসময় তার বয়স ছিল সাতাশ। তিনি ১৯৯৭ সালে কান্দাহারে আসেন এবং বিন লাদেনের চৌদ্দ বছর বয়সী এক মেয়ের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি কান্দাহারে শহিদ হন।

আবদুল্লাহ আল-হালাবী (ছদ্মনাম আবু হুসেইন) বিন লাদেনের এক কন্যার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, যে সেই সময় পনেরো বছর বয়সী ছিল। তার দীর্ঘ দাড়ি এবং সাদা ত্বক ছিল। তিনি শায়খের হয়ে অনেক জায়গায় ভ্রমণ করেছেন। আল-হাসান ও আবু হুসেইন ভালো বন্ধু ছিলেন এবং তারা একসাথেই আফগানিস্তানে এসেছিলেন। ওসামা বিন লাদেন তাদের খুব পছন্দ করতেন। তারা আজ কোথায় আছেন তা জানা যায়নি।

আবেদ আল-আযিয আল-মাক্কি আল-ফারুক প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের একজন প্রশিক্ষক ছিলেন। বিন লাদেন তার খুব প্রশংসা করতেন। তাকে গুয়ান্তানামোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আহমাদ আল-হাদা (ডাকনাম 'চাচা') বেশ বয়স্ক ছিলেন, তবে সবচেয়ে কম বয়সী রিক্রুটদের সাথেও পাল্লা দিতে পারতেন। তিনি আল-ফারুক ক্যাম্পের একজন প্রশিক্ষক ছিলেন। আমার সাথে দেখা করার সময় তিনি সর্বদা বিব্রতবোধ করতেন। কারণ, আমি তার এক মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম কিন্তু তিনি তাকে আমার সাথে বিয়ে দিতে রাজি হননি। তিনি পাঁচ মাস আফগানিস্তানে অবস্থান করেছিলেন এবং তার তিন ছেলেকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আজকাল সানাআয় থাকছেন।

ইয়াকুব আল-দুসারী আল-কায়েদার সামরিক কমিটিতে আবু হাফসের সহকারী ছিলেন। তিনি সংগঠনের নির্দিষ্ট কয়েকজন সদস্যকে বিশেষ, অতি গোপনীয় প্রশিক্ষণ দিতেন। তিনি আরবির পাশাপাশি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় কথা বলতে পারতেন। তিনি কোমোরোস দ্বীপপুঞ্জ থেকে এসেছিলেন। ২০০৮ সালে সোমালিয়ায় তিনি শহিদ হন।

সাঈদ আল-মাসরি কান্দাহারে বিন লাদেনের যোগাযোগ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। সামরিক কমিটি যে বিল্ডিংয়ে ছিল, তার অফিসও একই বিল্ডিংয়ে ছিল। তার বয়স ত্রিশের কোঠায় ছিল। তার কোঁকড়ানো দাঁড়ি ছিল এবং তিনি মোটা চশমা পরতেন। শেষবার শুনেছি তিনি ইরানে থাকেন।

শাকর আল-জাদাউয়ি (ছদ্মনাম সালিম খামদানি) দীর্ঘদিন যাবত বিন লাদেনের ড্রাইভার ছিলেন। বিন লাদেন চেয়েছিলেন আমরা দুজন ইয়েমেনে গিয়ে দুই বোনকে বিয়ে করি। গুয়ান্তানামোতে ছয় বছর কাটানোর পর, তিনি ২০০৯ সাল থেকে সানাআয় বসবাস করছেন।

আবদুল হাদি আল-ইরাকি[১৫] আফগানিস্তানে সম্মুখ সমরের দায়িত্বে ছিলেন। আমেরিকার-ইরাক আক্রমণ ও দখলের পরে বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার আগে তিনি সাদ্দাম হুসেনের রিপাবলিকান গার্ডে ছিলেন। ২০০৬ সালে যখন তিনি ইরাকে ফিরছিলেন তখন সিআইএ তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এই বই লেখার সময় তিনি গুয়ান্তানামোতে আছেন।

সুহাইব আল-আমরিকী ইসলামে ধর্মান্তরিত একজন আমেরিকান ছিলেন। আবু হাফস পরিচালিত কান্দাহারের মাদরাসায় তিনি পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি শান্তশিষ্ট একজন ব্যক্তি। তিনি খুব কম কথা বলতেন এবং সর্বদা উজবেক এবং তুর্কমেনিস্তান থেকে আগত লোকদের সাথে থাকতেন। তিনি খালদান ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি কাবুলের গেস্ট হাউজে থাকতেন। তিনি তালেবানদের সাথে সম্মুখসমরে মাসউদের সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। পেশোয়ারের আমেরিকান দূতাবাস তার পাসপোর্ট বাতিল করে দেয়। আমি যদি ভুল না করি, তার নাম ছিল ক্রিস। তিনি এখনও আফগানিস্তানে আছেন।

সালমান আল-মৌরিতানী সেই মাদরাসার একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি যখন শাহাদাতের কথা বলতেন তখন সকলে এতটাই প্রভাবিত হতো যে, রিক্রুটরা সকলে সুইসাইড-বোম্বার হতে চাইত। তিনি কান্দাহারে শহিদ হন।

---

১৫. তিনি ২০০৬ সালে ইরাক থেকে আফগানিস্তানে স্থানান্তরিত জিহাদিদের অংশ ছিলেন। আফগানিস্তানে উন্নতমানের IED (Improvised Explosive Device)-এর ব্যবহার বৃদ্ধিতে এই স্থানান্তরিত জিহাদিদের ভূমিকা ছিল ব্যাপক। রিপাবলিকান গার্ডের অফিসাররা মূলত আল-কায়েদা এবং আফগানিস্তানের তালেবানদের সাথে IED তৈরির জ্ঞান শেয়ার করার জন্য এসেছিলেন।

আবু খাবাব আল-মাসরি ডুরান্টায় একটি ক্যাম্প পরিচালনা করতেন, যেখানে তিনি বিষাক্ত গ্যাস ও রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির উপায় নিয়ে গবেষণা করতেন। বিন লাদেন তার এই উদ্যোগের পক্ষে ছিলেন না কারণ তিনি মনে করতেন যে, 'এখানে সম্ভাব্য সুবিধার চেয়ে ঝুঁকি বেশি ছিল'। আবু খাবাব টিএনটির মতো বিস্ফোরক তৈরির লক্ষ্যে রাসায়নিক ফর্মুলা বের করার চেষ্টা করেছিলেন, তবে বিন লাদেনের মতে, 'এক চা চামচ টিএনটি তৈরির উপাদান মিশ্রিত করতে তার যে সময় লাগবে, সেই সময়ে বাজারে গিয়ে পুরো লরি ভর্তি টিএনটি কিনে আনা যাবে।' ২০০০ সালের শুরুর দিকে তার ক্যাম্প বন্ধ করে দেওয়া হয়। তিনি ৯/১১-এর পর পাকিস্তানে শহিদ হন।

সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা

ইউএসএস কোল হামলা বা ৯/১১-এর মতো বিশালতার অপারেশন পরিকল্পনা করার জন্য অসংখ্য মিটিং এবং প্রস্তুতিমূলক সেশনের প্রয়োজন। আবু হাফস এই মিটিংগুলো পরিচালনা করতেন, যেহেতু তিনি সামরিক কমিটির প্রধান ছিলেন। শায়খ ওসামা ও আবু হাফস যখন নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, আল-কায়েদার অন্যান্য সামরিক কমান্ডার, বিশেষ করে সাইফ আল-আদেল ও আবু মুহাম্মদ আল-মাসরি আক্রমণগুলোর কৌশল প্রস্তুত করছিলেন। ইয়াকুব আল-দুসারি তাদের আক্রমণের বিশদ বিবরণ দিয়ে সহায়তা করেছিলেন।

বিন লাদেন পরিকল্পিত হামলার সমস্ত দিক এবং এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য পরামর্শক শুরার সাথেও বৈঠকে বসেন। শুরা সদস্যদের পাশাপাশি ডা. আয়মান আল-জাওয়াহিরি, শায়খ সাঈদ আল-মাসরি এবং আবু হাফস আল-মৌরিতানির সাথেও তিনি পরামর্শ করেছিলেন।

সেই সময় বিন লাদেন ও আবু হাফস ছিলেন সংগঠন পরিচালনার পেছনের মাথা। আর তাই তারা দুজনই আক্রমণের প্রকৃত পরিকল্পনাকারী। তবে আবু হাফস বিন লাদেনের কাছ থেকে অনুমোদন পাওয়ার পরেই কেবল কাজ শুরু করতে পারতেন। আবু হাফস বা খাল্লাদের পক্ষে 'আবু আবদুল্লাহ'-র অনুমোদন ব্যতীত কোনো মিশন পরিচালনা করা একেবারে অসম্ভব ছিল। আল-কায়েদার নামে পরিচালিত সমস্ত আক্রমণ বিন লাদেনের অনুমোদনেই হয়েছে।

যেকোনো বড় আকারের অপারেশনে খাল্লাদের মতো পরিচালকদের ভূমিকা ছিল মূলত যারা মিশনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে তাদের অনুপ্রেরণা দেওয়া। আল-

কায়েদার শীর্ষ নেতাদের মধ্যে কনিষ্ঠতম বলে খাল্লাদকে পরিকল্পনাকারীদের নির্বাচনী দলে নেওয়া হতো না। তবে তাকে হামলার আনুষাঙ্গিক প্রস্তুতি নিতে বিদেশে পাঠানো হতো। তাকে হামলাকারীদের পাসপোর্ট জোগাড় করা, অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিতরণ করা এবং আল-কায়েদা কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত নির্দেশাবলি পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি কাজ করতে হতো।

কোনো গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনের আগে বিন লাদেনের দ্বিতীয় স্তরের সহযোগীদের জানিয়ে দেওয়া হতো কেন ঐ নির্দিষ্ট টার্গেটটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। তাই নাইরোবি ও দারুস সালামে মার্কিন দূতাবাসে হামলার আগে শায়খ ওসামা তাদের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলো তুলে ধরেছিলেন—প্রথমত, সোমালিয়ায় 'Restore Hope' নামে এক আমেরিকান সামরিক অভিযান চালানো হয়েছিল, যাতে অনেক মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছিল, তারা এর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন; কেনিয়া দক্ষিণ সুদানের ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতা জন গ্যারাংকে সমর্থন করছিল; এবং পরিশেষে, নাইরোবি ছিল পূর্ব আফ্রিকায় মার্কিন গোয়েন্দাদের স্নায়ুকেন্দ্র।

মূলত আল-কায়েদা বা অন্য যেসকল গ্রুপকে বিন লাদেন অর্থায়ন করতেন সেগুলো কর্তৃক পরিচালিত যেকোনো বড় আকারের আক্রমণ সম্পর্কে আগেই তাকে পুরোপুরি অবহিত করা হতো।

আফগানিস্তানে গ্রুপটিতে এমন অসংখ্য যুবক ছিল, যারা বিন লাদেনের নামে আত্মঘাতী মিশন চালাতেও প্রস্তুত ছিল। আমি এ ব্যাপারে জানতাম। কিন্তু আমি নির্দিষ্ট করে বলতে পারছি না কোন মিশনের ক্যান্ডিডেট কে ছিল। কখনো কখনো বিন লাদেন বিভিন্ন আক্রমণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতেন। কারণ, যে দেশে এই আক্রমণগুলো চালানো হবে, সেখানকার জনগণের মতামতকে তিনি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে চাইতেন না। উদাহরণস্বরূপ, তিনি সানাআ, দুবাই টাওয়ার ও কায়রো মেট্রোর আক্রমণগুলোয় ভেটো দিয়েছিলেন। সানাআর একটি আবাসন কমপ্লেক্স তাদের টার্গেট হওয়ার কথা ছিল। সেখানে ব্রিটিশ প্রবাসীরা থাকত।

১৯৯৯ সালে নির্দিষ্ট কিছু অপারেটিভরা একযোগে ফ্রান্স, আমেরিকা, কিউবা, ইতালি ও ব্রিটেনের দূতাবাসগুলোতে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছিল। বিন লাদেন বললেন,

'আপনারা কিউবার দূতাবাসে কেন আক্রমণ করতে চান? কিউবার সাথে তো আমাদের বিরোধিতা নেই। এই আক্রমণ অর্থহীন। তাছাড়াও এই দূতাবাসগুলো সব

এমন অঞ্চলে অবস্থিত যেখানে সাধারণ মানুষ বসবাস করে এবং হামলায় ইয়েমেনিরাও মারা যেতে পারে।'

হান্দায় যে আবাসন কমপ্লেক্সটিতে ব্রিটিশরা থাকত সেটিও সাধারণ বাড়িঘর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। পুরো এলাকার ক্ষতি না করে এটিকে টার্গেট করা অসম্ভব।

একদিন আয়মান আল-জাওয়াহিরি আম্মানের প্রধান কারাগারটিকে টার্গেট করার সিদ্ধান্ত নিলেন, যেখানে জর্ডানের গোয়েন্দা সংস্থা অবস্থিত ছিল। কিন্তু বিন লাদেন আক্রমণটি আটকে দিলেন। তিনি আল-জাওয়াহিরিকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, 'ওই কারাগারে ইসলামপন্থী বন্দিরাও আছে'।

আরেকবার সৌদি আরবে একটি অপারেশন বানচাল হয়ে যাওয়ায় শায়খ ওসামা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছিলেন। আল-কায়েদার অংশ বলে দাবি করা একটি গ্রুপ কিছু স্যাম-৭ বিমানবিধ্বংসী মিসাইল লঞ্চার কিনে মক্কায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু সিভিল গার্ড হেলিকপ্টার ব্যতীত কোনো বিমান পবিত্র স্থানগুলোর ওপর দিয়ে যায় না।

সৌভাগ্যক্রমে মক্কায় যাওয়ার পথে চক্রান্তকারীদের সৌদি কর্তৃপক্ষ গ্রেফতার করে। বিন লাদেন এই পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু জানতেন না এবং জানলেও তিনি মক্কার অভ্যন্তরে পবিত্র ভূমিতে আক্রমণকে কখনোই অনুমোদন দিতেন না।

'এরা কি পাগল? আমাদের এই জিহাদ শুরু করার পেছনের পুরো কারণটাই ছিল মক্কার সুরক্ষা নিশ্চিত করা!'

বাস্তবে যে লোকেরা এই অপারেশনের পরিকল্পনা করেছিল, আল-কায়েদার সাথে তাদের কোনো সম্পর্কই ছিল না।

যাদের আক্রমণ করার পরিকল্পনা থাকে তাদের অনুমোদন নেওয়ার জন্য বিন লাদেনের কাছে আসতে হতো। সামরিক কমিটি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে জড়িত ছিল না। সামরিক কমিটির সদস্যরা কেবল তখনই বিন লাদেনের ভেটো দেওয়া হামলার পরিকল্পনাগুলো সম্পর্কে জানতে পারতেন যখন বিন লাদেন পরে এ সম্পর্কে তাদের জানাতেন।

ইয়েমেনের আক্রমণগুলো যখন আটকে দেওয়া হয় তখনও সেগুলোর পরিকল্পনা অতটা এগোয়নি। কিন্তু দুবাইয়ে কিছু যুবক টাওয়ারগুলো সম্পর্কে সমস্ত গবেষণা করে ফেলেছিল, লক্ষ্য চিহ্নিত করে ফেলেছিল এবং এমনকি সঠিক জায়গাটিও বেছে নিয়েছিল, যেখানে তাদের ফাঁদে আটকা পড়া গাড়িগুলো উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল তারা। খুব উৎসাহের সাথে তারা তাদের পরিকল্পনা

নিয়ে আফগানিস্তানে এসেছিল বিন লাদেনের অনুমোদনের জন্য। কিন্তু তিনি তা নাকচ করে দেন।

আল-কায়েদার যুদ্ধাস্ত্র

কাবুলের শার্সিয়াবে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের নিকটে এক পর্বতের পাশে আল-কায়েদা সাত কিলোমিটার দীর্ঘ এক সুড়ঙ্গ খুঁড়েছিল। সেখানে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা ছিল। নিয়মিত অস্ত্র সরবরাহ করতে সুড়ঙ্গে লরি প্রবেশ করত।

১৯৮০-র দশকের শেষদিকে সোভিয়েত সেনারা আফগানিস্তান ত্যাগ করার সময় আফগান সেনাদের জন্য প্রচুর অস্ত্র রেখে গিয়েছিল যা পরবর্তীকালে গৃহযুদ্ধের বিভিন্ন দল, তালেবান এবং আল-কায়েদা জব্দ করে। এ কারণেই আল-কায়েদার অস্ত্রাগারে এত বেশি সোভিয়েতের তৈরি অস্ত্র ছিল। তবে পশ্চিমের তৈরি কিছু অস্ত্রও ছিল যা কমান্ডার মাসউদ বা জেনারেল দোস্তমের মতো আমাদের শত্রুদের সরবরাহ করা হয়েছিল এবং আল-কায়েদা সেগুলো দখল করতে সক্ষম হয়েছিল।

আমি সেই সময় আল-কায়েদার অস্ত্রাগারে থাকা অস্ত্রগুলোর একটি তালিকা করব, যা সংস্থাটি কতবড় পদাতিক বাহিনীর অধিকারী ছিল সে সম্পর্কেও একটি ধারণা দেবে।

১) হাতে ধরে চালানোর বন্দুক :

- AKS 74U : কালাশনিকভ নামে পরিচিত অ্যাসল্ট রাইফেলের কমপ্যাক্ট সংস্করণ। এই মেশিনগান, ক্যালিবার 5.45 mm, ওসামা বিন লাদেনের পছন্দের অস্ত্র ছিল।

- HK MP5 : একটি 9 mm জার্মান-নির্মিত মেশিনগান মডেল 5, প্রথম ১৯৬০-এর দশকে বের করা হয়। কেবল আল-কায়েদার কাছে এই বন্দুক ছিল।

- UZI : ১৯৪৮ সাল থেকে ইসরায়েলিদের দ্বারা নির্মিত আরও একটি 9 mm মেশিনগান। যুদ্ধক্ষেত্রে এটি খুব প্রচলিত। আফগানিস্তানে কেবল আল-কায়েদা এগুলো ব্যবহার করত।

২) অ্যাসল্ট রাইফেল :

- Kalashnikov AK-74 : জিহাদিদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বন্দুক। আমরা একে আরবিতে এলি ('অটোমেটিক'-এর বদলে) বলি।

- Dragunov 7.62 : একটি শক্তিশালী রাইফেল, ১৯৬০-এর দশকে সোভিয়েত স্নাইপাররা এটি ব্যবহার করত। ফোল্ডিং স্টকযুক্ত এর একটি উন্নত সংস্করণ আফগানিস্তানে ব্যবহৃত হতো। এটি কালাশনিকভের মতো একই অ্যামিউনিশন ব্যবহার করে।

- HK G-3 : 'G-3' নামে পরিচিত এই জার্মান অস্ত্রটি পাকিস্তান ও ইরানে খুব প্রচলিত।

- M 16 : একটি আমেরিকান 5.56 mm মেশিন গান।

- The Barrett : এটি আমেরিকান স্নাইপার হিসাবে পরিচিত। আল-কায়েদার অস্ত্রাগারে এই বন্দুক বেশ কয়েকটি ছিল, যা তালেবানের ছিল না। The Barrett, Douchka-র মতো একই অ্যাওমিউনিশন ব্যবহার করে। Douchka হলো সোভিয়েত-নির্মিত একটি মেশিনগান যা বিশ্বজুড়ে গেরিলা সেনারা ব্যবহার করত। আমরা মাসউদ বাহিনীর সাথে লড়াইয়ের সময় এগুলো দুটি হারিয়েছি। আমরা এগুলোকে পছন্দ করতাম কারণ এগুলো আর্মোর-প্লেটিং (armour-plating) ভেদ করতে পারে এবং এগুলোর রেঞ্জ ১.৫ থেকে ২ কিলোমিটার।

- Tramblum (কাঁপানো) হ্যান্ড গ্রেনেড। আল-কায়েদা 'কাসাত আল-গানাবিল' (গ্রেনেড উৎসরণ) নামে একটি কৌশল আয়ত্ত করেছিল। এই কৌশলে একটি কালাশনিকভের শেষপ্রান্তে একটি প্রস্তুত করা হ্যান্ড গ্রেনেড রাখা হয়; যখন ফাঁকা গুলি ছোড়া হয় তখন গ্রেনেডটি বিস্ফোরণের আগে ৩০০ মিটার পর্যন্ত যেতে পারে।

- 30mm Narenjack গ্রেনেড লঞ্চার। আল-কায়েদার সদস্যরা এই অস্ত্রটিকে বিশেষভাবে কার্যকর বলে মনে করেন। এই অস্ত্রগুলো মূলত সোভিয়েত হেলিকপ্টারগুলোতে বসানো হতো। আমাদের সামরিক বিশেষজ্ঞরা সেগুলোকে এমনভাবে অভিযোজন করিয়েছিলেন যাতে এর ফিডটিতে মূল ত্রিশটির বদলে পঁচাত্তরটি গ্রেনেড থাকতে পারে।

- 40mm গ্রেনেড লঞ্চার, BG 15, সাধারণত কালাশনিকভের মতো হালকা অস্ত্রের উপরে বসানো হয়।

৩) হালকা সহযোগী অস্ত্র :

- Lacroix Serpent Projectile Launcher (আরবিতে সোআবান) : মাইনফিল্ডের মধ্যে দিয়ে রাস্তা তৈরি করতে এটি ব্যবহৃত হয়। আল-কায়েদা ও তালেবান উভয়ের কাছেই এই অস্ত্র আছে।

- Katioucha 120mm মাল্টিপল রকেট লঞ্চার। নমনীয়, এটিকে একটি পিক-আপের ওপর বসানো যেতে পারে। গেরিলা যুদ্ধের জন্য আদর্শ অস্ত্র।

- M2A1-7 বহনযোগ্য অগ্নি-নিক্ষেপক, 'ড্রাগন' (আরবিতে আল-সানিন) নামে পরিচিত। জ্বলন্ত তরল নিক্ষেপের জন্য তৈরি করা এই মার্কিন-নির্মিত যুদ্ধোপকরণ কেবল আল-কায়েদার কাছে আছে।

৪) ভারী যুদ্ধাস্ত্র :

- Type 80, 7.62 mm মেশিন গান। এই ধরনের কালাশনিকভ আল-কায়েদা ও তালেবান উভয়ের কাছেই আছে।

- 12.7 mm বিমানবিধ্বংসী মেশিন গান টাইপ 77। কেবল আল-কায়েদার কাছেই এগুলো ছিল।

- 14.5mm ক্যালিবার বিমানবিধ্বংসী মেশিন গান টাইপ 75-1, আরবিতে মিম-তা এবং যুকিক নামে পরিচিত। আল-কায়েদা ও তালেবান উভয়ের কাছেই এগুলো ছিল।

- SQM মিডিয়াম মেশিন গান, 7.62 mm ক্যালিবার, 'Douchka Maghawir' নামে পরিচিত। আল-কায়েদা ও তালেবান উভয়ের কাছেই এই সোভিয়েত-নির্মিত অস্ত্রের পুরাতন সংস্করণ ছিল।

- SQM লাইট, 7.62 ক্যালিবার মেশিন গান। আল-কায়েদা এই অস্ত্রের সাথে ৭৫ বুলেটের বেল্ট ব্যবহার করত।

- PKM এবং PKB লাইট মেশিন গান, 7.62 ক্যালিবার।

- KPV 12.5mm ক্যালিবার ভারী মেশিন গান।

৫) ট্যাঙ্কবিধ্বংসী অস্ত্র :

- RPG7 বহনযোগ্য রকেট লঞ্চার, আল-কায়েদা ও তালেবান উভয় কর্তৃক এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো।

- RPG 18, একটি হালকা অ্যান্টি-আর্মোর অস্ত্র। আল-কায়েদার কাছে এর একটি আমেরিকান সংস্করণ ছিল, Law M 72.

- Sagger ট্যাংকবিধ্বংসী গাইডেড মিসাইল (আরবিতে সাকর, যার মানে বাজপাখি)।

- শর্ট-রেঞ্জ ট্যাংকবিধ্বংসী মিসাইল Eryx, সাঁজোয়া যান ও দুর্গের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতো। ছোটখাটো হওয়া সত্ত্বেও আল-কায়েদার সেনারা বলত যে এটি অত্যন্ত কার্যকর।

- Milan বহনযোগ্য ট্যাংকবিধ্বংসী অস্ত্র : আল-কায়েদা এই অস্ত্র এবং একই ধরনের অন্যান্য অস্ত্র মাসউদের বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। ফ্রেঞ্চ-জার্মান ইউরোমিসাইল প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে তৈরি এই অস্ত্র ফ্রান্স গোপনে আফগানিস্তানে মাসউদের বাহিনীকে সরবরাহ করছিল।

- The RBS 56 'Bill' একটি সুইডিশ ট্যাংকবিধ্বংসী মিসাইল। আফগানিস্তানে কেবল আল-কায়েদার কাছে এগুলো ছিল।

- LAW 80, একটি 64mm ক্যালিবার হালকা ট্যাংকবিধ্বংসী অস্ত্র। আমরা এগুলো প্রধানত প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করতাম।

- The RBR M80 LAW, 64mm ক্যালিবার, যুগোশ্লাভিয়ায় নির্মিত।

- গাইডেড ট্যাংকবিধ্বংসী মিসাইল 9M14PI, Sagger এর সাথে এর মিল রয়েছে।

৬) মর্টার :

45 থেকে 240mm ক্যালিবার পর্যন্ত সব ধরনের মর্টার আল-কায়েদা এবং তালেবানের কাছে ছিল। এগুলোকে বিভিন্ন গাড়িতে বসানো যেতে পারে তবে এটি একটি নমনীয় অস্ত্র যা জিহাদিরা পায়ে হেঁটে বহন করতে পারে।

৭) হ্যান্ড গ্রেনেড :

আল-কায়েদা এবং তালেবানের কাছে অনেক ধরনের রাশিয়ান হ্যান্ড গ্রেনেড ছিল। এছাড়াও তাদের কাছে ছোট চাইনিজ গ্রেনেড (বা percussion grenades) ছিল যা স্পর্শে বিস্ফোরিত হতো। এক ধরনের ট্যাংকবিধ্বংসী গ্রেনেড ছিল, RKG 3, যেটি ছোট প্যারাসুটের সাথে ব্যবহার করা হতো যা এটিকে একটি ট্যাংকের ছাদে গিয়ে বসতে সক্ষম করে।

৮) ক্লাস্টার বোমা :

আল-কায়েদা এবং তালেবান উভয়ের কাছেই এই ডিভাইসগুলো ছিল। এগুলো ভূমিতে পড়ে কয়েক শতাধিক ছোট ছোট বোমা ছড়িয়ে দেয়। তালেবান কখনও কখনও বিমান থেকে নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের সেনাদের ওপর এই বোমা ফেলত।

এছাড়াও আল-কায়েদার বিভিন্ন বিমানবিধ্বংসী ব্যবস্থা ছিল :

১) বহনযোগ্য গ্রাউন্ড-টু-এয়ার অস্ত্র :

- AL-RBO ও AL-RBS : আফগানিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় আল-কায়েদা ও তালেবানরা একযোগে এই সুইডিশ নির্মিত নিম্ন উচ্চতার গ্রাউন্ড-এয়ার মিসাইলগুলো ব্যবহার করত।

- The British-made Shorts Blowpipe, একটি গ্রাউন্ড-এয়ার মিসাইল। একে আমরা 'ব্লপস' ডাকতাম। এটি একইসাথে একটি অ্যান্টি-পার্সোনেল ও অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্ট উভয় অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

- SA 7a এবং SA 7b মিসাইলগুলো আফগানিস্তানে আল-কায়েদা ও তালেবান কর্তৃক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। বিন লাদেনের সুরক্ষায় নিয়োজিতরা এই হালকা, বহনযোগ্য মিসাইল লঞ্চার ব্যবহার করত। একজন যোদ্ধা কাঁধে রেখে এটি ফায়ার করতে পারে।

- American Stinger মিসাইল জিহাদ ওয়াল ক্যাম্পে মজুদ করে রাখা ছিল। সমস্যা হলো এগুলোর জন্য কোনো অতিরিক্ত ব্যাটারি ছিল না। তাই আফগানিস্তানে শায়খের সাথে কাটানো তিন বছরে আমি এগুলো ব্যবহৃত হতে দেখিনি।

২) বিমানবিধ্বংসী সেল্ফ-গাইডেড মিসাইল :

- নিম্ন উচ্চতার Norinco P19 সিস্টেমের অনুরূপ একটি সিস্টেম যেটি কাবুল ও কান্দাহারে কেবল তালেবানের কাছে ছিল।

- SA6 সিস্টেম, যা ZIL 136 যানে বসানো হতো। এগুলো কমিউনিস্ট সরকারের মজুদে ছিল এবং এখন তালেবানের দখলে। আমি জানি না এগুলো কোথায় রাখা হতো বা তাদের কাছে কয়টি ছিল বা এগুলো কাজ করার মতো ভালো অবস্থায় ছিল কি না।

- বিমানবিধ্বংসী মিসাইল সিস্টেম SA 10, 11 এবং 12: মাজার-ই-শরিফ দখল করার পর তালেবান কাবুলে এই রাশিয়া থেকে সরবরাহকৃত মিসাইল সিস্টেমগুলো জব্দ করে।

৩) গাইডেড বিমানবিধ্বংসী মেশিন গান :

'Douchka Maghawir' নামক Chinese Norinco 12.7 mm ক্যালিবার বিমানবিধ্বংসী অস্ত্রসহ সমগ্র আফগানিস্তান জুড়ে বেশ কয়েকটি সিস্টেম ব্যবহৃত

হতো। নাইট-ভিশন ক্ষমতাসম্পন্ন এই অস্ত্রটি শত্রু বিমান ও সৈন্যদের বিরুদ্ধে তালেবান ও আল-কায়েদা উভয়ই ব্যবহার করত। কান্দাহারে বিন লাদেনের কাছেও হালকা Norinco 25 ছিল। কাবুল বিমানবন্দরের আশেপাশে তালেবানরা বেশ কয়েকটি 12.7mm প্রাক্তন সোভিয়েত বিমানবিধ্বংসী মেশিনগান স্থাপন করেছিল।

৪) স্ট্যাটিক বা গাইডেড গ্রাউন্ড-টু-এয়ার মিসাইল সিস্টেম :

- ZIL 131 লরিতে বসানো SA3। মাজার-ই-শরিফ থেকে জব্দ করার পর তালেবান এগুলোকে তাদের মিলিটারি প্যারেডে প্রদর্শন করত।

- কান্দাহারে আমি একটি সিস্টেম দেখেছিলাম যেটি দেখতে SA5 এর মতো ছিল। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না যে সেটা আসলেই একটি লং-রেঞ্জ সোভিয়েত-নির্মিত মিসাইল ছিল। আমি রাডার-গাইডেড SA2 সম্পর্কেও শুনেছিলাম কিন্তু নিজের চোখে এ ধরনের একটি সিস্টেমও দেখিনি।

৫) রাডার :

- রাডার সিস্টেমগুলো লোঘার, খোস্ত, কান্দাহার ও কাবুলে স্থাপন করা হয়েছিল। সেগুলোর জার্মান-নির্মিত ৩৪ মিটার মাস্টগুলো লরিতে বসানো টেলিস্কোপিক পোলের সাথে সংযুক্ত ছিল।

- রাডার (ঘোরানো যায় এমন অ্যান্টেনা সহ) সংযুক্ত মিসাইল সিস্টেমগুলো প্রায়শই কাবুল এবং কান্দাহার জুড়ে সক্রিয় অবস্থায় দেখা যেত। আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই যে আমি রাডার ইকুইপমেন্টের সাথে পরিচিত নই।

এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র আমাদের আফগান ও নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের শত্রুদের বিরুদ্ধে নিশ্চিত সুবিধা প্রদান করেছিল। তারা মাইন, হ্যান্ড-গ্রেনেড এবং বিশেষ করে অগ্নি-নিক্ষেপকের আগুনে পুড়ে মারা যাওয়ার ভয় পেত। আগুনে মৃত্যুর ভয় হলো একটি আফগান কুসংস্কার যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে। শত্রুবাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করার জন্য আল-কায়েদার সদস্যদের কেবল একটি অগ্নি-নিক্ষেপক চালু করতে হতো। অনেক তালেবানের মধ্যেও এই ভয়টি ছিল এবং এর জন্য আমরা মাঝেমাঝে তাদের উপহাস করতাম। আরব জিহাদিদের মধ্যে এ ধরনের কোনো ভয় ছিল না।

আমি কখনোই পারমাণবিক, জৈবিক বা রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহারের বিষয়ে কোনো আলাপচারিতা শুনিনি বা কোনো প্রমাণ দেখিনি। তবে বিন লাদেনের নিকটতম সহযোগীরা এবং অনেক মুজাহিদ আফগান সীমান্তের নিকটবর্তী

তুর্কমেনিস্তানের আশকাবাদ শহরে অবস্থিত এক পারমাণবিক কমপ্লেক্স সম্পর্কে জানতেন। আফগানিস্তানের সাথে উত্তর সীমান্তের নিকটবর্তী তুর্কমেনিস্তানেও একটি ঘাঁটি ছিল, যেখানে নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড পরিবহনে সক্ষম মিসাইল ছিল। ভাবুন, যদি তালেবানরা এই ঘাঁটিতে কখনো অভিযান চালায়, তবে তাদের এবং তাদের মিত্র আল-কায়েদার পক্ষে সবকিছু করা সম্ভব হয়ে উঠবে!

বেশি বয়স এবং ব্যাটারি বা যন্ত্রাংশের অভাবের কারণে সংগঠনের কিছু অস্ত্র এখন আর কাজ করার মতো অবস্থায় না থাকলেও হালকা ও ভারী উভয় পদাতিক অস্ত্রের দিক দিয়ে তাদের অস্ত্রাগারটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

দশম অধ্যায় : ১৯৯৮-এর গ্রীষ্ম, প্রথম হামলা

১৯৯৮ সালের ৭ অগাস্ট নাইরোবি ও দারুস সালামে মার্কিন দূতাবাসগুলোতে হামলার সময় বিন লাদেনের দেহরক্ষী হিসেবে আমার এক মাস পেরিয়েছে।

হামলার আগের রাতে আবু হাফস আল-মাসরি কান্দাহার ক্যাম্পের মসজিদে আরব ভাইদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। তিনি একটি নামের তালিকা পাঠ করলেন। তালিকার এই ব্যক্তিদেরকে তাদের পরিবারসহ তাৎক্ষণিকভাবে ক্যাম্প থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলো কান্দাহারে আল-কায়েদার সেইফ হাউজে আশ্রয় নেবে। সকাল সাতটার সময় সংগঠনের শীর্ষ নেতারা ক্যাম্প ছেড়ে অজানা এক গন্তব্যের দিকে পালিয়ে যান। তাদের মধ্যে ছিলেন শায়খ ওসামা, আবু হাফস আল-মাসরি, আয়মান আল-জাওয়াহিরি, সাইফ আল-আদেল ও শায়খ সাঈদ আল-মাসরি। এই নেতাদের নিজেদের পরিবারকে গাড়ির পেছনের সিটে বসিয়ে গাড়ি চালিয়ে ক্যাম্প থেকে বের হয়ে যেতে দেখে একটু অবাক লাগল। বিন লাদেন সাথে হাতেগোনা কয়েকজন রক্ষী নিয়েছিলেন, যাতে দৃষ্টি আকর্ষিত না হয়। এর তিন ঘন্টা পর, সকাল ১০:৩০ থেকে ১০:৩৯ এর মধ্যে হামলা ঘটে। দিনটি ছিল শুক্রবার।

সেদিন সকালে যখন সাইফ আল-আদেল আমাকে দেখতে এলেন তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে?'

তিনি জবাব দিলেন, 'প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা! তোমরা প্রথম পাল্টা হামলার সম্মুখীন হতে পারো।'

'ঠিক আছে, আমরা অপেক্ষা করব।'

বিন লাদেন কান্দাহারে মোল্লা উমরের বাড়ির পাশের একটি সেইফ হাউজে গিয়ে উঠলেন। তার সাথে তার কয়েকজন শীর্ষ নেতা ছিলেন। ক্যাম্পে কেবল চল্লিশ জনের মতো আরব ও আফগান জিহাদি রয়ে গেল। ক্যাম্পের সীমানার চারপাশে, বিশেষ করে সেন্ট্রি পোস্টগুলোর কাছে যেন পরিখা খনন করা হয় সাইফ আল-আদেল সে বিষয়টি আমাকে নিশ্চিত করতে বললেন।

তিনি আমাকে বললেন যে আমেরিকানরা আমাদের ওপর বোমা হামলা করবে।

'তুমি এখন এই পুরো জোনের আমির।'

'পুরো ক্যাম্পের?'

'হ্যাঁ।'

প্রায় ১৩ ঘন্টা পর রেডিও কুয়েতের একটি নিউজফ্ল্যাশে ঘোষণা হলো যে নাইরোবি ও দারুস সালামে হামলা হয়েছে। এর দু'ঘন্টা বাদে খলিফা আল-মাসরি নামে এক মিশরীয় এসে নিশ্চিত করলেন যে, ওসামা কেনিয়া এবং তানজানিয়ায় 'আঘাত' হানতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়ে মাটিতে চুমু খেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। এদিকে আন্তর্জাতিক রেডিও স্টেশনগুলো কী বলছে—আমি সেদিকে মনোযোগ দিলাম।

আমেরিকার আসন্ন প্রতিশোধগুলোর কথা চিন্তা করে আমি আমার অধীনস্থদের পিপাকৃতির পরিখা (barrel-trench) খনন করতে বললাম। এগুলো অনেকটা কূপের মতো করে সোজা নিচের দিকে খনন হয়। এগুলো প্রায় ১.৮ মিটার গভীর খনন করা হয় যাতে যেকেউ এগুলোর মধ্যে পিছলে ঢুকে যেতে পারে। সেদিন আমরা কয়েকজন খোলা আকাশের নীচেই রাত কাটালাম।

তিন দিন পর আমার কাছে কান্দাহার থেকে টেলিফোন কল এল—আমাকে বিন লাদেনের সাথে দেখা করতে যেতে হবে।

'আবু জান্দাল, তুমি প্রস্তুত তো?'

'জ্বী শায়খ, আমি একেবারে প্রস্তুত।'

'একটা অপারেশনের জন্য দুজন যুবককে বেছে নাও।'

আমি হামাম আল-সাঈদি নামে এক মিশরীয় ও মুআজ আল-সানানিকে বেছে নিলাম। বিন লাদেন আরও বললেন,

'তুমি এমন একটি আমেরিকান ক্যাম্পে অনুপ্রবেশ করতে যাচ্ছ যেখানে কয়েক ডজন সেনা রয়েছে এবং সেখান থেকে তুমি আর ফিরে আসতে পারবে না।'

'তবে কি... অবশেষে জান্নাতের দিকে আমার যাত্রা শুরু হলো, শায়খ!'

কিন্তু সন্ধ্যা নাগাদ বিন লাদেন তার সিদ্ধান্ত বদলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'তোমার স্যুটকেস কি এখনও প্যাক করা আছে?'

'জ্বী।'

'ঠিক আছে। আমার সাথে এসো তবে।'

আমি বুঝতে পারলাম যে অপারেশন বাতিল হয়ে গেছে, তবে হতাশ হওয়ার মতো সময় আমার হাতে ছিল না। আমি তার সাথে থাকতে যাচ্ছি, এটাই ছিল মূল বিষয়। বিন লাদেন জোর করলেন যেন তখন থেকে সালিম খামদানি, ফাইয়াদ আল-মাদানি, মুআবিয়া আল-মাদানি এবং আমি নিজেই তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসেবে দায়িত্ব পালন করি।

কিছু দিন বাদে আমি লন্ডনে প্রকাশিত একটি আরব পত্রিকা আল-শারক আল-আওসাতে দেখতে পেলাম যে একজন সৌদি জিহাদি আবদুল জব্বার আল-বালুশিকে নাইরোবি হামলায় জড়িত থাকার জন্য দায়ী করা হয়েছে এবং তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। আল-বালুশি বিন লাদেনকে খুব পছন্দ করতেন। আমার মতো বিন লাদেনও তাকে একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা হিসেবে বিবেচনা করতেন। তিনি মাসউদের সেনাদের বিরুদ্ধে তালেবানের সাথে সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছেন। আল-বালুশির আসল নাম মুহাম্মদ রাশিদ আল-আওয়াহলি। তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পুরো কুরআন হৃদয় দিয়ে তিলাওয়াত করতে পারতেন। আমি তার খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলাম। ২০০১ সালে তিনি আমেরিকায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

যারা নাইরোবিতে হামলা চালিয়েছিল তাদের মধ্যে দুজন সুইসাইড বোম্বারকে আমি চিনি। তাদের একজন হলেন আবু উবাইদাহ আল-মাক্কি। তার আসল নাম জিহাদ মুহাম্মদ আলি আল-হারাযি। ১৯৯৬ সালে আমি জিহাদিদের যে গ্রুপের সাথে তাজিকিস্তানে গিয়েছিলাম, তিনি সেই গ্রুপেরই একজন ছিলেন। আমি তাকে জাওয়া বলে ডাকতাম, কারণ তাকে দেখতে ইন্দোনেশীয়দের মতো লাগত। তিনি আবদুর রহিম আল-নাশিরির ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ১৯৯৭-এর শেষে আবু উবাইদা আল মাক্কি এক অনির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশ্যে আফগানিস্তান ত্যাগ করেন। অপর হামলাকারী ছিলেন আহমাদ আবদুল্লাহ। তিনি ছিলেন একজন মিশরীয় কিন্তু তাকে দেখতে জার্মানদের মতো লাগত। তিনি খোস্ত ক্যাম্পে থাকতেন। সেখানে তিনি রিক্রুটদের শেখাতেন বিস্ফোরক নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয়। দূতাবাসে হামলার এক মাস আগে ১৯৯৮ সালে আমেরিকান টেলিভিশন নেটওয়ার্ক ABC যখন বিন লাদেনের সাক্ষাৎকার নিতে এসেছিল তখন সেই সাক্ষাৎকারের কিছু ফুটেজে আহমদ ছিলেন। ১৯৯৭ সালে আমার প্রথম তার সাথে দেখা হয়, যখন তিনি খোস্তে উচ্চাকাঙ্ক্ষী জিহাদিদের পাঠদান করছিলেন।

কেউ যখন আহমাদের নৈতিকতা ও ছোট বাচ্চাদের প্রতি তার লালসার গুজব নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করত তখন তিনি রাগে ফেটে পড়তেন। সর্বশেষ আমি তাকে খোস্তে দেখেছিলাম। তিনি পূর্ব আফ্রিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় বিন লাদেন তাকে তার গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। কিন্তু তখনও আমি জানতাম না তিনি কোথায় যাচ্ছিলেন।

দূতাবাসের হামলার কয়েকদিন পর বিন লাদেন এবং আল-কায়েদার আরও কয়েকজন নেতার সাথে আমি খোস্তে গেলাম। আমাদের কাফেলাতে তিনটি হাইলাক্স ট্রাক ছিল। আমি ডা. আল-জাওয়াহিরির গাড়িতে ছিলাম, সাইফ আল-আদেল বিন লাদেনের সাথে ছিলেন এবং তৃতীয় গাড়িতে আবু হাফস ছিলেন। নিরাপত্তাজনিত কারণে প্রত্যেক নেতা পৃথক পৃথক গাড়িতে ভ্রমণ করছিলেন। হামজা আল-ঘামদি, আবদুর রহিম আল-নাশিরি, আবু তৌরাব (শায়খের অন্যতম দোভাষী), শায়খের পুত্র সাদ ও আবদুর রহমান এবং আরও কিছু জিহাদি আমাদের সাথে ভ্রমণ করছিলেন।

আমরা কিছু রাস্তার মোড়ে এসে পৌঁছলাম। ওয়াকিটকিতে শায়খের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—'বন্ধুরা, আপনারা কি ভাবছেন? আমাদের কি খোস্তে যাওয়া উচিত নাকি কাবুলে?'

আমরা আফগানিস্তানের রাজধানীকেই পছন্দ করলাম—'চলুন কাবুলে যাই। সেখানে যা লড়াই চলছে তাতে আমরা আল্লাহর আরও নিকটে থাকব।'

'ভালো বুদ্ধি,' বললেন বিন লাদেন।

কাবুলকে নির্বাচন করে না জেনেই আমরা এক বড় বিপর্যয় থেকে আল-কায়েদাকে রক্ষা করলাম। দেখা গেল চব্বিশ ঘন্টা পরে আমেরিকানরা নাইরোবি এবং দারুস সালামে দূতাবাসে হামলার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য খোস্তে বোমা হামলা করল। এক গুপ্তচর আমেরিকানদের জানিয়ে দিয়েছিল যে আমরা খোস্তে যাচ্ছিলাম। ফিরে এসে আমরা ঐ বিশ্বাসঘাতককে খুঁজে বের করলাম। সে ছিল লাদেনের দুজন আফগান রাঁধুনির একজন। অপর রাঁধুনি মুরাদকে আমরা আমাদের সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং সে স্বীকার করেছিল যে ভুলে তার মুখ থেকে বের হয়ে গিয়েছিল যে সে আল-কায়েদার নেতাদের সাথে খোস্তে যাচ্ছে। এ শুনে অন্য রাঁধুনি আমেরিকানদের সতর্ক করে দিয়েছিল যে আমরা খোস্তে যাচ্ছি। আমরা যদি পরিকল্পনা অনুসারে চলতাম, তবে সম্ভবত আমেরিকার বোমাবর্ষণে আল-কায়েদার নেতৃত্ব ধ্বংস হয়ে যেত।

কান্দাহার থেকে কাবুলের যাত্রাপথে আমরা দূতাবাসের হামলায় অসংখ্য বেসামরিক হতাহতের সংবাদ শুনেছিলাম। বুলেটিনের মধ্যকার বিরতিতে আমি শায়খকে ব্যাখ্যা করতে বলেছিলাম, 'আমাদের কি এত ভুক্তভোগীর দরকার ছিল?'

বিন লাদেন হেসে বললেন, 'আবু জান্দাল! আমরা তো একটি বার্তা পাঠিয়েছিলাম, তাই না? আমেরিকার বন্ধুদের কী পরিণতি হবে সে সম্পর্কে আমরা পুরো বিশ্বকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম।'

তিনি মূলত ১৯৯৬ ও ১৯৯৮ সালে আমেরিকা ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে আল-কায়েদার জারিকৃত ফতোয়ার কথা বলছিলেন। তিনি বলে চললেন, 'আমরা যে মুহূর্তে ঐ দেশগুলোকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম সেই মুহূর্ত থেকে আমরা কোনো ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়বদ্ধ নই।'

'মুসলিমদের বিষয়টা?'

'আমরা ভালো একটি সময় বেছে নিয়েছি। কারণ শুক্রবার সেই সময়ে সব মুসলিমরা মসজিদে সালাত আদায় করে।'

আমি দুবছর আগে সোমালিয়া যাওয়ার পথে নাইরোবিতে সময় কাটিয়েছিলাম। তাই নাইরোবি সম্পর্কে আমার ভালো ধারণা ছিল। আমি জানতাম যে যখন দূতাবাসগুলোয় হামলা হয়েছিল, তখন সেখানে প্রচুর পরিমাণ মুসলিম থাকার কথা। তবে ওসামা জোর দিয়ে বললেন যে এই ধরনের আক্রমণের সকল সম্ভাব্য অপ্রত্যাশিত পরিণতি নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। তিনি বললেন, 'তোমার কি মনে হয়, আমেরিকানরা যখন হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বোমা হামলা করেছিল তখন "কোল্যাটেরাল ড্যামেজ" তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল?'

'সেটা আমি মানছি...কিন্তু আমরা কি আর আমেরিকানদের মতো?'

'তুমি যা বলছ তা সত্য। আগামী দিনগুলোতে তুমি তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে।'

'না, আমি অপেক্ষা করব না। আমি চাই এখনই আপনি আমাকে বলুন! নাইরোবিতে বারোজন আমেরিকান এবং প্রায় দুই শতাধিক কেনিয়ান নিহত হয়েছে।'

'আর ইরাক ও ফিলিস্তিনে আমেরিকানরা কতজনকে হত্যা করেছে? সেই সংখ্যাটা আরও অনেক অনেক বড়!'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন। তবে অবশ্যই আমাদের যুদ্ধনীতি আমেরিকানদের চেয়ে আলাদা।'

'হ্যাঁ। তবে সময় তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবে, আবু জান্দাল।'

'যা ঘটে গেছে তা ইতোমধ্যে অতীত। পরকালে আপনি এর জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন এবং আমাকেও সেই দায়বদ্ধতা ভাগ করে নিতে হবে কারণ আমিও এতে আপনার সাথে জড়িত।'

শায়খ ওসামা ইটের বদলা পাটকেল দিয়ে দিলেন, 'তুমি কেবল তখনই জড়িত থাকতে পারতে যদি তুমি আল-কায়েদার যথাযথ সদস্য হতে!'

আমি মনে মনে নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওসামা বিন লাদেনের সাথে এভাবে কথা বলার কি অধিকার আছে তোমার?' আমি শায়খের হাতে তখনও বাইয়াত দিইনি। আর তাই আমি অফিশিয়ালি আল-কায়েদার অংশ ছিলাম না।

কিছু সময় বাদে সাইফ আল-আদেল আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তিনি যখন প্রথম আমার প্রশংসাপত্রে লিখেছিলেন, 'আবু জান্দাল, বিরক্তিকর', এটি কেবল ইউফেমিজম (শ্রুতিকটু পদের পরিবর্তে কোমলতর পদের প্রয়োগ) ছিল। একমাত্র আমিই অভিযোগ করতাম এবং অন্যরা আমাকে বলত, 'তোমার কি মাথা খারাপ! শায়খ ওসামার সমালোচনা করছ?! '

আমি জবাব দিতাম, 'সাবধান, তিনি তো কোনো নবি নন। তার ওপর তো ওয়াহী নাজিল হয়নি। একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো তার ভাইদের সাথে পরামর্শ করা; তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার মাধ্যমে আমি সেটাই করছি।'

কাবুল পৌঁছে আমরা জানতে পারলাম যে আমেরিকানরা খোস্তে আল-কায়েদার ব্যারাকে বোমা হামলা করেছে। শায়খ ওসামা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে আমি গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে দৌঁড়ে গেলাম তার কাছে। এরপর গাড়িতে করে আমরা তাকে অন্য একটি সেইফ হাউজে নিয়ে গেলাম।

শায়খ ওসামা নিশ্চিত ছিলেন যে, আমেরিকানরা তাকে খুঁজে বের করবে এবং তার বাড়িতেও বোমা হামলা করবে। তবে কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হলো, এই উত্তাল সময়কালে শায়খের সুরক্ষা বৃদ্ধি করা হলেও তা এতটা বিচক্ষণতার সাথে করা হয়েছিল যে আমাদের প্রতি কোনো দৃষ্টি আকর্ষিত হয়নি। আমরা আটজন তার সুরক্ষার দায়িত্বে ছিলাম এবং আমরা তাকে এক মুহূর্তের জন্যও একা ছাড়িনি। আমরা করিডোরে এবং দরজার বাইরে পাহারায় থাকাকালীন জাওয়াহিরী ও আবু হাফস আল-মাসরি ওসামার সাথে একই ঘরে অবস্থান করছিলেন। আমি আমার বন্দুকটি প্রস্তুত করা অবস্থায় ঘুমালাম। এটি হলো সেই রিভলবার, যা তিনি আমাকে আমানত হিসেবে দিয়েছিলেন, যদি কখনো তিনি আমেরিকানদের হাতে আটক হন তখন যেন আমি সেটি ব্যবহার করি।

আল-কায়েদার নেতৃত্ব তখনও বিশ্ব থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। আমাদের ওয়াকিটকিগুলোর সাহায্যে আমরা কাবুলের অন্যান্য সাইটগুলোতে কল করতে পারতাম। আমাদের পাকিস্তানের আল-আনসারের বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া আপ-টু-দ্যা-মিনিট ট্রান্সমিটার এবং টেলিযোগাযোগ ডিভাইসের মাধ্যমে আমরা কান্দাহার ও খোস্তের সাথেও যোগাযোগ করতে পারতাম। এই মেশিনটি একটি

যানবাহনে ইনস্টল করা ছিল। এটি একইসাথে টেলিফোন, ফ্যাক্স ও রেডিও হিসাবে কাজ করত। আমাদের কাবুলে লুকিয়ে কাটানো গুরুত্বপূর্ণ সেই দুসপ্তাহে তালেবান এবং আল-আনসার দ্রুত চলমান ঘটনাবলি সম্পর্কে আমাদের জানান দিত।

১৯৯৮-এর ২০শে অগাস্ট আমেরিকানরা খোস্তের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পঞ্চাশটি বা তারও বেশি মিসাইল নিক্ষেপ করে। বিন লাদেন আসলে কঠোর প্রতিশোধের প্রত্যাশাই করেছিলেন। হামলাকালে ক্যাম্পের আমির আবু আত্তা অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি এবং তার সহযোগী আবু আল-ফারাজ আল-লিবি কাবুলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনছিলেন। ফিরে এসে তারা প্রাথমিক গণনা সম্পন্ন করে শহিদদের দাফন করেন। তারপরে তারা তাদের প্রতিবেদন পৌঁছে দিতে কাবুলে আসেন, ছয়জন নিহত—একজন সৌদি, একজন মিশরীয়, একজন তুর্কমেন ও তিনজন ইয়েমেনি এবং ত্রিশ হাজার ডলারের ক্ষয়ক্ষতি।

জানমালের ক্ষয়ক্ষতি এত কম ছিল যে আল-কায়েদার নেতৃত্ব তাদের সন্তুষ্টি গোপন করতে পারেনি। এমনকি কিছু মিসাইল বিস্ফোরিতও হয়নি। তালেবান সেগুলো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে দিয়ে দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পত্রপত্রিকায় যা লেখা হয়েছিল মোটেও তা ঘটেনি। আমরা মিসাইলগুলো পাকিস্তানিদের কাছে বিক্রি করিনি। আমরা এই মিসাইলগুলো তালেবানকে সরবরাহ করেছিলাম এবং তারা সেগুলো পাকিস্তানিদের বিনামূল্যে দিয়ে দিয়েছিল।

হামলার দুসপ্তাহ পরে মোল্লা উমর বিন লাদেনকে ডেকে পাঠালেন। আমেরিকার প্রতিশোধের ফলাফল এবং হামলার ক্ষয়ক্ষতি নিজের চোখে দেখতে তিনি বিন লাদেনকে কান্দাহারে আসতে বললেন। তালেবানরা ওসামার ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। আমার সন্দেহ হয় যে আমেরিকানরা তাদের আমাদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়ার প্রয়াসে তাদের সাথে যোগাযোগ করেছিল। আল-কায়েদার নেতৃত্ব সাধারণত তালেবানের প্রতি প্রচুর আস্থা প্রদর্শন করে। কিন্তু হামলার পরে তাদের আরও উত্যক্ত না করার জন্য আল-কায়েদা এই হামলার দায়ভার এক রহস্যময় ইসলামপন্থী বাহিনীর ওপর চাপিয়ে দিল।

সে সময় তালেবানরা দুই অংশে বিভক্ত ছিল; একাংশ আরব জিহাদিদের বিরুদ্ধে ছিল এবং অপর অংশ আরব জিহাদিদের সমর্থনে ছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমেরিকানরা তালেবানের সাথে যোগাযোগের চ্যানেল না খুলে বরং আফগানিস্তানে বোমা ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এতে করে কিছু মডারেটের মৌলবাদী হয়ে ওঠার ওপর এর প্রভাব পড়েছিল।

শুরুতে তালেবানরা আমেরিকানদের সাথে কোনো দ্বন্দ্ব চায়নি। ওসামা এখন তাদের সামনে উপস্থাপন করলেন তার আশঙ্কার বাস্তবায়ন এবং তারা তাকে ত্যাগ করতে পারেনি।

কিছু তালেবান আমাদের বলেছিলেন, 'আপনারা যা করেছেন আমরা তার বিরোধী। তবে আমরা আপনাদের লড়াইয়ে একা ছেড়ে দিতে পারি না। আমরা শেষ পর্যন্ত আপনাদের পাশে থাকব।'

তালেবানরা বিন লাদেনকে প্রেসের সামনে ঘোষণা করা বন্ধ করতে চাপ প্রয়োগ করতে চেয়েছিল। মোল্লা উমর বিন লাদেনকে এ কথা জানাতে তিনজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন—মোল্লা জলিল, আহমাদ মুতাওয়াকিল ও কান্দাহারের গভর্নর মোল্লা মুহাম্মদ হাসান। বিন লাদেন তাদের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিলেন, তিনি দাবি করলেন যে, নিরাপত্তাজনিত কারণে তিনি সভায় উপস্থিত হতে পারবেন না। মূলত তিনি তালেবান প্রধানের দূতদের সাথে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করছিলেন।

মোল্লা জলিল ছিলেন মোল্লা উমরের রাজনৈতিক উপদেষ্টা। তিনি মনে করতেন যে লাদেনকে রক্ষা করা তালেবানদের একটি দীনি দায়িত্ব। অন্যদিকে, মুতাওয়াকিল আরবদের ঘৃণা করতেন এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তারা আফগানদের ওপর বিপর্যয় ডেকে আনবে। তালেবানদের মধ্যে এ নিয়ে তীব্র বাকবিতণ্ডা হতো। সাধারণভাবে তাদের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের সমর্থনে ছিল। তাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টারা অবশ্য এ ব্যাপারে বিভক্ত ছিলেন—মোল্লা উমর আমাদের সমর্থন করতেন তবে তালেবানের কিছু শীর্ষ নেতা আমাদের সমর্থন করতেন না, বিশেষ করে বেসামরিক নাগরিকরা যারা কখনও যুদ্ধ করেননি। তালেবানদের মধ্যে সাধারণ অনুভূতি ছিল যে বিন লাদেনকে গিয়ে বলা, 'যথেষ্ট হয়েছে। এবার শান্ত হোন নয়তো আমরা আপনাকে আমেরিকানদের হাতে তুলে দেব।' বিপদে পড়েছেন দেখে শায়খ ওসামা পাকিস্তানি উলামাদের সর্বোচ্চ গণ্যমান্য ব্যক্তি শায়খ শামস আল-দীন শামসির মাধ্যমে উলামাদের মধ্যে তার সমর্থন নেটওয়ার্ক চালু করে দিলেন। এই উলামারা এখন তাদের আফগান সহকর্মীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করলেন, যারা আবার তালেবানদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা শুরু করলেন। শেষমেশ একটি সমঝোতা হলো। তালেবান বিন লাদেনকে প্রতিশ্রুতি দিল যে তারা তাকে আমেরিকানদের হাতে সোপর্দ করবে না এবং এর বিনিময়ে আল-কায়েদা প্রধান চুপ থাকা এবং আর কোনো ঘোষণা জারি না করতে রাজি হন, যাতে করে এই নব্য প্রতিষ্ঠিত আফগান রাষ্ট্রের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ প্রশমিত করা যায়।

একাদশ অধ্যায় : গুপ্তচর শিকারের ভরা মৌসুম

সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো—দূতাবাসে হামলা, আমেরিকানদের প্রতিশোধ এবং আমাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকের উপস্থিতি—আমার চিন্তার খোরাক যুগিয়েছিল। বিন লাদেনের সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা বেশিরভাগ যুবকই তার হাতে বাইয়াত দিয়েছিল. আমি দিইনি।

১৯৯৮ সালের রামাদানের দুই সপ্তাহ আগে আবু ওসামা আল-ওয়াইলি নামে একজন ইয়েমেনি ভাই আমাদের সাথে কথা বলতে এলেন। মাগরিবের সালাতের পরে আমাদের মধ্যে এক দীর্ঘ কথোপকথন হলো, যাতে তিনি মিশরীয়দের কঠোর সমালোচনা করলেন। আমি উত্তর দিলাম,

'আপনি যাই বলুন না কেন, আমি আপনাকে বিশ্বাস করব না। মিশরীয়রা ইতোমধ্যে জিহাদের জন্য অনেক কাজ করেছে, আর আমরা কী করেছি? আপনি যে মিশরীয়দের কথা বলছেন, তারা আল-কায়েদার অন্তর্ভুক্ত, আর যেখানে আমরা এখনও আল-কায়েদার সদস্যই নই।'

'তাহলে এর সমাধান কী?' তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

'এর সমাধান হলো ওসামা বিন লাদেনের হাতে বাইয়াত দেওয়া। ইয়েমেনে আপনার পার্টিতে আপনার অনেক বন্ধুবান্ধব রয়েছে, আপনার সাথে যোগদানের জন্য তাদের প্রভাবিত করুন। তবে এই শর্তে যে আপনি মিশরীয়দের নিয়ে আর উস্কানীমূলক কথা বলবেন না!'

'যদি আজ রাতে সালাতে আল্লাহ আমাকে দিকনির্দেশনা দেন তবে আমি আগামীকাল বিকেলে বাইয়াত দিচ্ছি।'

পরের দিন বিকেলে তিনি আমার কাছে এসে বললেন যে তিনি প্রস্তুত। আমরা শায়খের সাথে দেখা করি, তার সাথে বেশ কয়েকজন যুবক ছিল। আমি বললাম, 'শায়খ, আমাদের আপনার সাথে একটু ব্যক্তিগতভাবে কথা বলা দরকার।'

একবার আমরা শায়খের সাথে একলা হওয়ার পর ওসামা (ইয়েমেনি) আমাদের বললেন, 'আমি আপনার প্রতি আনুগত্যের শপথ পাঠ করছি। তবে আবু জান্দাল, আপনার এটি করার দরকার নেই...'

'দরকার আছে। আনুষ্ঠানিকভাবে আপনার সাথে আবদ্ধ হওয়ার জন্য আমার বাইয়াত দেওয়া দরকার।' যদিও আমাকে ইতোমধ্যে আল-কায়েদার একজন পূর্ণ

সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হতো, তবুও আমি এই অনানুষ্ঠানিক আচার অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

বিন লাদেন আমার হাতে একটি লেখা দিলেন এবং আমি তার সামনে হাত উঁচিয়ে এই ঘোষণা দিলাম, 'আমি আল্লাহর সামনে শপথ করছি যে, আমার ব্যক্তিগত উদ্বেগ এবং ধারণাগুলো বাদ দিয়ে আপনাকে সাহায্য ও সহায়তা করব, অবস্থা খারাপ হোক বা ভালো; এবং আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমার নিজের মঙ্গলকে পেছনে ফেলে কোন প্রশ্ন না করেই আপনার আদেশ মেনে নেব।'

সাধারণত বাইয়াত ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ চলাকালীন দেওয়া হয়, যখন কোনো নতুন রিক্রুট বিন লাদেনের সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়।

আমার এক সপ্তাহ পরে আরবের চল্লিশজন যুবক সকলেই শায়খ ওসামার হাতে বাইয়াত দেয়।

এই পদক্ষেপটি যদি আমার দৈনন্দিন জীবনে কোনো পরিবর্তন না-ও এনে থাকে, তবুও আমার আত্মাকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছিল। এখন থেকে আমি আল-কায়েদার অংশ। এই খবর শুনে সাইফ আল-আদেল আমাকে দেখতে এলেন, 'গতকাল তুমি কী করেছ?'

'আমি আবার কি করলাম?'

'তুমি কিছু একটা করেছ...'

'আমি কিছু করিনি!'

'হ্যাঁ, তুমি করেছ, তুমি শায়খ ওসামার হাতে বাইয়াত দিয়েছ।' তিনি আমাকে একটি ফর্ম দিলেন, যা এখন আমাকে আল-কায়েদার একজন সদস্য হিসেবে পূরণ করতে হবে। ফর্মে আমার ব্যক্তিগত ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল এবং তখনই সাইফ আল-আদেল আমার আসল নাম জানতে পারেন। তিনি আল-কায়েদার যে বিশাল আর্কাইভের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, এই সমস্ত ফর্ম তিনি সেখানেই রাখতেন।

ফর্মটিতে সংগঠনের সাধারণ উদ্দেশ্যগুলোর একটি রূপরেখা দেওয়া ছিল—১) একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা; ২) পৃথিবীতে আল্লাহর পবিত্র শরিয়াহ আইন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা; ৩) মুসলিমদেরকে এবং তাদের ধারণাগুলোর একত্রিকরণে অংশ নেওয়া; ৪) ইসলামি খেলাফতের চেতনা পুনরুজ্জীবিত করা।

নাইরোবি ও দারুস সালামে হামলার পরে নিরাপত্তা বিস্তৃত করে শায়খ ওসামা চারজন ব্যক্তিগত দেহরক্ষী রাখেন এবং আমি তাদের একজন ছিলাম। এরপর

থেকে, যারা বাইয়াত দেয়নি এবং আল-কায়েদার পুরোপুরি বেতনভুক্ত সদস্য নয় তাদের দায়িত্বের পদ দেওয়া হবে না।

কয়েক মাস পর সাইফ আল-আদেল ওসামাকে পরামর্শ দিলেন যেন তিনি আমাকে সুরক্ষা বিভাগের তার এবং আবু হাফস আল-মাসরির সমপর্যায়ের নেতৃত্বের পদে পদোন্নতি দেন।

আল-আদেল সিকিউরিটি বুলেটিন ছাপিয়ে সেগুলোকে গেস্ট-হাউজ, কান্দাহারের মাদরাসাগুলো এবং আল-কায়েদার অন্যান্য সমস্ত জায়গায় লাগিয়ে দিতেন। বুলেটিনগুলোতে বলা ছিল যে কখনই আমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে কথা বলা যাবে না এবং সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। যারা ভ্রমণ করতে যাচ্ছিল তাদের জন্য সাইফ আল-আদেল আরও পরামর্শ দিয়েছিলেন—ডান হাতের কব্জিতে ঘড়ি না পরা, কারণ ডান হাতে ঘড়ি পড়া মুজাহিদদের ঐতিহ্য; স্ত্রীর সাথে ভ্রমণ করার সময় দাড়ি শেভ করে যাওয়া ইত্যাদি।

এছাড়াও এই সময়ে আল-কায়েদা একটি অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা গঠন করে। আমাদের অতীতের ঘটনাগুলো থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার এবং নিশ্চিত করা দরকার যে, কোনো বিশ্বাসঘাতক যেন আবার আমাদের মাঝে ঢুকতে না পারে। এখন থেকে আমাদের প্রতিটি ক্যাম্পের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে প্রতিদিনের প্রতিবেদন থাকবে। আমরা প্রত্যেক সদস্য সম্পর্কে যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করব। যদি আমরা কোনো অজানা নতুন আগত ব্যক্তিকে সন্দেহজনক আচরণ করতে দেখি, তবে আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। পঞ্চাশজন ভাইকে তাদের গোয়েন্দা কাজের দক্ষতার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল এবং সাইফ আল-আদেল তাদের জন্য একটি বিশেষ কোর্স তৈরি করেছিলেন। কোর্স সমাপ্তির পর তাদের আল-কায়েদার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে স্থাপন করা হয়েছিল এবং সেসব জায়গায় কী চলছে, সে সম্পর্কে তারা আমাদের অবহিত করত।

এই ক্ষুদ্র গোয়েন্দা সংস্থা শীঘ্রই ফলোৎপাদন করল। কয়েক মাস পরে আমরা আল-কায়েদার নেতৃত্বের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের জন্য জর্ডানীয় গোপন সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত এক গুপ্তচরের মুখোশ উন্মোচন করি। আবু মুতাসিম ছিল জর্ডানের একজন নাগরিক, যে মূলত ফিলিস্তিন থেকে এসেছিল। সে ১৯৮৬ সালে সতের বছর বয়সে প্রথম সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে জিহাদে লড়াইয়ের জন্য আফগানিস্তানে এসেছিল। সে আম্মানে ফিরে যায় যেখানে তার পরিবারের একটি ছোট কসাইয়ের দোকান ছিল। ১৯৯৮ সালের শরৎকালে আবু মুতাসিম জর্ডানে ফিরে যাওয়ার আগে দুসপ্তাহ

আমাদের সাথে কাটায়। চার মাস পর সে কাবুলে ফিরে আসে, তবে সে অদ্ভুত আচরণ করছিল। তার কাছে প্রচুর টাকা ছিল যা সে জর্ডানিয়ান জিহাদিদের দিচ্ছিল এবং ফলস্বরূপ এই ঘটনা অন্যান্য সহকর্মীদের সন্দেহজনক করে তুলেছিল। এছাড়াও তার পাসপোর্টের সাথে একটি আফগান ভিসা ছিল, যা কোনো মুজাহিদের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক। একদিন আবদুল হাদি আল-ইরাকি আমাকে জানায় যে আবু মুতাসিম একজন গুপ্তচর।

আবু মুতাসিম যখন কাবুলে ফিরে এসেছিল, তখন আমিও কাবুলেই ছিলাম। আমি তাকে বললাম, আমি যে গেস্ট হাউজের দায়িত্বে ছিলাম, সেটার শোবার ঘরগুলো পরিষ্কার করতে সে যেন আমাকে সহায়তা করে। এতে আমি তার সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। এরপরে আমি আবদুল হাদি আল-ইরাকিকে ডেকে বললাম, 'এই ছোকরা যদি জিহাদি হয় তবে আমার হাত কেটে দিতে পারেন!'

আমরা তাকে পরীক্ষা করার জন্য কাবুলের অদূরে মাসউদের সেনাদের বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে প্রেরণ করলাম। পরের দিন আমরা প্রতিবেদন পেলাম যে আবু মুতাসিমকে 'স্বাভাবিক' বলে মনে হচ্ছে না। সে একটু স্থূলদেহী দুর্দান্ত ছেলে ছিল, আর সে কিনা কোনো অস্ত্র কীভাবে পরিচালনা করতে হয় তাও জানে না। কাবুল ফিরে সে আরেকটি ভুল করল। সে একটি টেলিফোন বক্স থেকে তার জর্ডানিয়ান পরিচালককে ফোন করে। দুজন মিশরীয় জিহাদি তার কথোপকথন শুনে ফেলে। সে কোড ওয়ার্ডে কথা বলছে শুনে তারা সঙ্গে সঙ্গে আবু মুহাম্মদ আল-মাসরি এবং সাইফ আল-আদেলকে বিষয়টি জানায়। আল-মাসরি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং আবু মুতাসিম দ্রুতই স্বীকার করে নেয় যে সে জর্ডানের গোয়েন্দা সংস্থার সাথে কাজ করছে—'আপনি আমাকে সুবিচারের নিশ্চয়তা দিলে আমি আপনাকে সবকিছু বলার জন্য প্রস্তুত।'

ওসামা বিন লাদেনের সাথে দেখা করতে নিয়ে যাচ্ছেন বলে আল-মাসরি জর্ডানের গুপ্তচরকে কাবুলের দক্ষিণে লোঘার ক্যাম্পে নিয়ে যান। সাইফ আল-আদেল তাকে অনুসরণ করেন, তার সাথে ছিল মুজাহিদদের একটি দল, যারা প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছিল। কিন্তু মুহাম্মদ আল-মাসরি তাদের সেখানে পৌঁছতে দেখে আল-আদেলের ওপর রাগে ফেটে পড়লেন। 'আপনাকে এই সন্ত্রাসীদেরদের দলকে এখানে আনতে কে বলেছে?'

সাইফ আল-আদেলের সর্বশেষ বিধি লঙ্ঘন নিয়ে বোঝাপড়া করার আগে আল-মাসরি আবু মুতাসিমকে একটি ঘরে বন্দি করে রাখলেন। 'আপনি কি ভুলে গেছেন

যে পেশোয়ারে আমরা যে গুপ্তচরকে ধরেছিলাম, তাকে এই সন্ত্রাসীরাই মেরে ফেলেছিল? এই লোকেরা কীভাবে আবু আল-ফারাজ আল-শারির ছেলের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছিল, তা কি আপনার মনে নেই?'

বিন লাদেনের সাথে পরামর্শ করে মুহাম্মদ আল-মাসরি সাইফ আল-আদেলকে বললেন যে, জর্ডানের গুপ্তচরকে তালেবানের হাতে তুলে দেওয়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

'আল-কায়েদা তালেবানকে না জানিয়ে সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বা তাদের হত্যা করে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অভিযোগ নিজের ওপর আনতে চায় না।'

আল-আদেল রাজি হলেন এবং আবু মুতাসিমকে তালেবানের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো।

এক সপ্তাহ পর সাইফ আল-আদেল আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং আমরা একসাথে তালেবানের গোয়েন্দা সংস্থার ভবনে গেলাম। সেখানে প্রবেশের সাথে সাথেই আমি ১৯৮০-র দশকের সোভিয়েত-সমর্থিত আফগান কমিউনিস্ট শাসনের চিহ্নগুলো অনুভব করতে পারছিলাম—এক দীর্ঘ করিডোর, কারাগারের পুরু দরজা যেগুলো একটি অন্যটির মুখোমুখি স্থাপন করা হয়নি যাতে করে কারাবন্দিরা একে অপরকে ঢুকতে বা বের হতে দেখতে না পারে। কারাগারে একা একা আবু মুতাসিম খুব চাপের মধ্যে ছিল এবং সে কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করছিল। বাইরে থেকে সাইফ আল-আদেল তাকে বললেন: 'আবু মুতাসিম! আজ তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে।' সারপ্রাইজ বলতে তিনি আমাকে বোঝাচ্ছিলেন। আমরা গাট্টাগোট্টা এক আফগানের উপস্থিতিতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম কিন্তু আবু মুতাসিম কিছু সময়ের জন্য আমাদের সাথে ছলচাতুরী করছিল—'সাইফ আল-আদেল, আপনার আমাকে মনে নেই? ১৯৮৭-তে আমরা একসাথে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করেছিলাম।'

'না'

'আপনাকে আমার মনে আছে—খোস্তে আপনি হাতে আঘাত পেয়েছিলেন।'

আসলে সাইফ আল-আদেল ১৯৯০-এর দশকে সোমালিয়ায় আহত হয়েছিলেন। তার মিথ্যা আর সহ্য করতে না পেরে আমি উঠে তাকে দু'বার আঘাত করি। সে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করে—'জর্ডানিয়ান ও ইসরায়েলিরা আমাকে নিয়োগ দিয়েছে...'

তারপরে সত্য বেরিয়ে এল। আফগানিস্তানে প্রথম সফর শেষে ফিরে যাওয়ার সময় জর্ডানের গোয়েন্দা সংস্থা তার সাথে যোগাযোগ করে। অস্থিতিশীল ও অর্থ-প্রেমী আবু মুতাসিম বড়াই করে বলে বেড়াচ্ছিল যে সে একজন যোদ্ধা। মুখাবারাত (গোপন পুলিশ) তাকে ধোঁকা দেয়। তারা তার কাছে এক মেয়েকে পাঠায়, যার সাথে সে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়। সে ঘটনা জর্ডানের নিরাপত্তা বাহিনী ফিল্ম করে, মেয়েটি আসলে একজন পতিতা ছিল। আর এখন এজেন্সিগুলোর কাছে মুতাসিমকে ব্ল্যাকমেইল করার উপায় ছিল। যদি সে নিজের সুনাম ধুলোর লুটাতে না চায় তবে তার কাছে কেবলমাত্র একটি পথ খোলা ছিল—আফগানিস্তানে ফিরে আসা এবং আল-কায়েদার ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করা।

এমনকি জর্ডানিয়ানরা আফগানিস্তান থেকে ফিরে আসা প্রকৃত আরব জিহাদিদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষা করেছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন আবু মুসআব আল-যারকাবি, যার সাথে দেখা করার জন্য আবু মুতাসিমকে আম্মানের কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। তবে পৃথিবী মাঝেমধ্যে খুবই ছোট হয়। আল-যারকাবি এখন আফগানিস্তানে আমাদের সাথে ছিলেন এবং জর্ডানে তার জীবন সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে আবু মুতাসিমের মুখোশ উন্মোচন করতে আমাদের সহায়তা করেছিলেন।

তার মিশন ছিল খুবই সুনির্দিষ্ট ও বিশদ। জর্দানের গোয়েন্দা সংস্থা তাকে বিন লাদেন ও আবু হাফসের অবস্থান নির্দিষ্ট করতে, আল-কায়েদার রাসায়নিক অস্ত্র পরীক্ষাগার রয়েছে কি না তা জানতে, বিন লাদেন ও জর্ডানের জিহাদিদের মধ্যকার সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে এবং নতুন সহস্রাব্দ উপলক্ষ্যে শায়খের কোন জর্ডানিয়ান টার্গেট আছে কিনা তা আবিষ্কার করতে বলেছিল। এছাড়াও তারা 'ক্ষুদ্র বিদ্রোহী গ্রুপ' প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, যা আল-কায়েদার সদস্যদের হৃদয়ে বিভক্তির বীজ বপন করবে; তারা কিছু ব্যক্তি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য চেয়েছিল, বিশেষ করে হাতিব আল-লিবি, আবু আসেম আল-মাগরেবি, আবদুল মাজিদ আল-তাবুকি এবং আমি নিজে। সর্বশেষ তারা আফগানিস্তানে আল-কায়েদার গেস্ট হাউজগুলোর সুরক্ষা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল।

তালেবান তাকে কারাবাসের সাজা দিয়েছিল, কিন্তু কিছু সময় পরেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তার অত্যন্ত বৃদ্ধা মা এবং তার ভাই জর্ডান থেকে এসেছিল আমিরুল মুমিনীনের (মোল্লা উমর) কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে। তার স্বদেশী আবু

হারিসের সাথে জালালউদ্দিন হক্কানিও তার পক্ষে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, যা আমাকে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট করেছিল।

তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু জর্ডানে উপজাতীয় আনুগত্য রয়েছে এবং তার কারাবাস উপজাতিগুলোর মধ্যে ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারে।'

কয়েক মাস পর আম্মানে আল-শারক আল-আওসাত পত্রিকায় আবু মুতাসিমের দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আমার নাম দেখতে পাই। সাক্ষাৎকারে সে দাবি করে যে 'আবু জান্দাল নামক এক সৌদি তাকে তীব্র নির্যাতন করেছে'। সে যে ক্ষমা পেয়েছিল তাতে অনেক জিহাদিই ক্ষুব্ধ ছিল। কিন্তু শায়খ ওসামা এই রায়ের পেছনের শরিয়া আইনটি আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন। আবু মুতাসিমকে তালেবানের কাছে হস্তান্তর করে তিনি অবশ্যই তার এক বড়সড় উপকার করেছেন। সে যদি আমাদের হাতেই থাকত, তবে তাকে নিশ্চিত হত্যা করা হতো।

কেবল তারই মুখোশ উন্মোচন করা হয়নি; এরপর খুব শীঘ্রই আমরা আরও অর্ধ ডজন গুপ্তচরের সন্ধান পাই। আবু জিহাদ, সিরিয়ান; আবু ইসলাম ইরাকি; সৌদি আরবের তায়েফ থেকে মুয়াজ; এক ওমানি, যার নাম আমার মনে নেই। তাদের লক্ষ্য ছিল আমাদের কমপ্লেক্সের কোণায় তেজস্ক্রিয় উপাদানযুক্ত 'ডার্টি বোমা' স্থাপন করা যাতে বিন লাদেনসহ সমস্ত আরব প্রভাবিত হয়। তারা জাতিসংঘের মাধ্যমে আমেরিকানদের (আবু ইসলামও) সাথে কাবুলে অফিশিয়ালি নিবন্ধিত হয়েছিল এবং তারা (আবু ইসলামও) আমেরিকানদের হয়ে কাজ করছিল। তবে আল-কায়েদায় তাদের অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টা ছিল আনাড়ি এবং অপরিণত। তাৎক্ষণিকভাবেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে তারা জিহাদ সম্পর্কে কিছুই জানত না।

এই গুপ্তচরদের বেশিরভাগকেই তালেবানের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল এবং ২০০১-এর শেষদিকে পশ্চিমা সেনারা আফগানিস্তানে পৌঁছলে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। খাইসামা নামে এক ইয়েমেনি বাদে সকলকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। খাইসামা শায়খের কাছে গিয়ে স্বীকার করেছিলে যে, সে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার জন্য কাজ করছে।

শায়খ ওসামা তাকে চ্যালেঞ্জ জানালেন, 'ইয়ামেনে যাও এবং তোমার স্ত্রীকে নিয়ে আমাদের সাথে থাকার জন্য এখানে ফিরে আসো'। খাইসামা ইয়েমেনে ফিরে গেল, যেখানে সে পুনরায় বিবাহ করে। আমি সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম।

একবার খোস্তে আমাদের ভাইয়েরা সিদি আহমেদ নামে এক উজবেক যুবককে ধরে ফেলেন। বিন লাদেনকে হত্যা করার জন্য রিয়াদের আমির প্রিন্স সালমান

আবদুল আযিয তাকে প্রেরণ করেছিল। সে মিশনে সফল হলে প্রিন্স তাকে এক মিলিয়ন ডলার এবং সৌদির নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

'তুমি কি সত্যিই মনে করেছিলে যে তুমি যদি বিন লাদেনকে হত্যা করতে তবে আমরা তোমাকে ছেড়ে দিতাম এবং তোমার পুরস্কারের অর্থ সংগ্রহ করতে দিতাম?'

সেও খুব সাধাসিধে ছিল।

বিন লাদেনকে হত্যাচেষ্টা

আমি যখন আফগানিস্তানে আল-কায়েদার প্রধানের সাথে ছিলাম, সে সময় তিনি বেশ কয়েকটি হত্যাচেষ্টার টার্গেট হয়েছিলেন। ১৯৯৬ সালে তিনি জালালাবাদে আসার কিছু সময় বাদেই তার ওপর প্রথম হত্যাচেষ্টা চালানো হয়। তালেবানের গোয়েন্দা সংস্থা আক্রমণকারীদের ধরতে পেরেছিল। তালেবানের বিন লাদেনকে কান্দাহারে স্থানান্তর করতে চাওয়ার পেছনে এটি অন্যতম কারণ ছিল।

কিন্তু তার জীবনের ওপর সবচেয়ে মারাত্মক হামলা হয়েছিল ২০০০ সালের গ্রীষ্মে তার চতুর্থ স্ত্রীর সাথে তার বিবাহের পরের দিন। শায়খ কান্দাহার যাওয়ার উদ্দেশ্য (বিমানবন্দরের কাছের) ক্যাম্প ছেড়ে যাত্রা করলেন। তিনি নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন—যা ছিল তার জন্য অস্বাভাবিক। তার যুবতী স্ত্রী আরেক গাড়িতে ভ্রমণ করেছিলেন। আমি আগেই রুটটি পর্যবেক্ষণ করেছিলাম। বিন লাদেনের গাড়িকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য তার দুপাশে দুটো এবং সামনে একটা মোটরবাইক চলছিল। আমরা বালুকাময় এক রাস্তা বরাবর ভ্রমণ করছিলাম। হঠাৎ করেই কোত্থেকে যেন আরও চারটি মোটরবাইক বেরিয়ে এল! আমাদের কাফেলার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গাড়ির ভেতরে উঁকি দিয়ে বিন লাদেনকে খুঁজছিল। তাদের মধ্যে একজন তাকে চিনতে পেরে গাড়ির পেছনে ঝুলতে লাগল। আমি ছিলাম কাফেলার পেছনে একেবারে শেষ পিক-আপে। ওয়াকিটকিতে লাদেনের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। তিনি সাইফ আল-আদেলকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে তার গাড়ির কাছে আসতে বললেন। সাইফ কাফেলার দ্বিতীয় গাড়িতে ছিলেন, তার সাথে শায়খের স্ত্রী ছিলেন।

সাইফ বিন লাদেনের গাড়িকে ওভারটেক করলেন এবং শায়খ তাকে দ্রুত অগ্রসর হতে বললেন যাতে আমি আমার ট্রাক নিয়ে দুই গাড়ির মাঝে ঢুকে মোটরসাইক্লিস্টকে প্রতিরোধ করতে পারি। স্পষ্টতই তার পরিকল্পনা ছিল বিন লাদেনের গাড়িতে গিয়ে ধাক্কা দেওয়া এবং তার মোটরবাইক বিস্ফোরিত করা। আমি তাকে রাস্তা থেকে সরাতে সক্ষম হই। আমরা বাকিদেরও ধরতে পেরেছিলাম।

তারা ছিল আফগান শরণার্থী, পাকিস্তানে থাকত। আমেরিকান সেনাবাহিনী তাদের এ কাজে নিয়োগ দিয়েছিল। তাদের সাথে জাতিসংঘের কী যেন সম্পর্ক ছিল। তারা নিরস্ত্র ছিল এবং তাদের কাছে যে ক্ষুদ্র পরিমাণ বিস্ফোরক ছিল তা দিয়ে কেবল লাদেনের গাড়ির ক্ষতি করা যেত। আমরা তাদের তালেবানের কাছে হস্তান্তর করি।

দ্বাদশ অধ্যায় : কান্দাহারে কাঙ্গাল আল-কায়েদা

দূতাবাসে হামলার এক মাস পরে আমরা কান্দাহারে আল-কায়েদার ওপর চাপিয়ে দেওয়া চূড়ান্ত আর্থিক সংকটে ভুগতে শুরু করি। শায়খ ওসামা কেবল প্রশিক্ষণ ক্যাম্পগুলো চালানোর মতো অতি প্রয়োজনীয় ব্যয়গুলো বহন করছিলেন। যে পরিবারগুলোকে মাসে ২০০ ডলার দেওয়া করে দেওয়া হতো, তাদের মাত্র ৫০ ডলার করে দেওয়া হলো। শায়খের সাথে আমার কাটানো তিন বছরে এটাই সবচেয়ে কঠিন সময় ছিল।

আর্থিকভাবে আল-কায়েদা পাকিস্তানি সরকার কর্তৃক অবরোধের মুখোমুখি হয়েছিল। পাকিস্তানি সরকার নিজেরাই আবার আমেরিকার প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিল। তারা কান্দাহারে কিছু প্রবেশ করতে দিত না। পাকিস্তানে আমাদের প্রতিনিধি আবু হাফস আল-সিন্দি সিকিউরিটি সার্ভিসের নজরদারিতে ছিলেন। তার ওপর আবার নিয়মিত বোমা হামলার হুমকি, এসব মিলিয়ে তারনাক ফার্মে জীবন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

আমি দিনে একবারের বেশি খেতাম না। খেতাম কিছুটা গম, এই যা, তা-ও প্রায়শই খুব নিম্নমানের ছিল। আমাদের দই কিনে খাওয়ার মতো সামর্থ্যও ছিল না। তাই আমরা পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়ে গমের বিনিময়ে দই নিতাম। আমরা ব্যাচেলররা খরগোশ শিকার করে খেতাম। আল-কায়েদার কিছু সদস্য বিন লাদেনের কাছে অভিযোগ করতে শুরু করল। একদিন কয়েকজন মিশরীয় তার অফিসে গিয়ে তাকে বলল, তাদের কিছু খাবার দিতে।

'আমার নিজেরই খাওয়ার কিছু নেই,' তিনি বললেন। 'সুতরাং আমি তোমাদের কীভাবে খাবার দিব?'

শায়খ ওসামা তাদের হিজরতের সময় নবীজির নান্দনিক অস্তিত্বের উদাহরণ স্মরণ করিয়ে দিলেন। 'হ্যাঁ, আমরা কষ্ট পাচ্ছি। কিন্তু নবীজি আমাদের অনেক আগেই কষ্ট পেয়েছিলেন।'

শায়খ সকলকে এই উদাহরণ স্মরণ করিয়ে দিতেন। কিন্তু একদিন আমি গিয়ে শায়খকে বললাম যে লোকেদের এবং তাদের পরিবারকে খাওয়ানোর জন্য আসলেই কিছু নেই আমাদের কাছে।

'বৎস, রাসুলের ﷺ সাহাবিদের মতো খারাপ অবস্থা আমাদের এখনো হয়নি। তারা ক্ষুধার জ্বালা কমাতে পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন।'

'তা-তো অবশ্যই, কিন্তু তাদের তো ইমানের শক্তি ছিল এবং আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করছিলেন। আমরা তো কেবল পাপী আর আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন না।'

বিন লাদেন মুচকি হাঁসলেন। এরপর এক টুকরো রুটি পানিতে ভেজাতে ভেজাতে বললেন, 'এই পৃথিবীর লাখো মানুষ এমন একটু খাবার খাওয়ার স্বপ্ন দেখে!'

'আপনি আমাদের জন্য কিছু টাকাপয়সা জমিয়ে রাখছেন না কেন? যারা থাকছে তারা নিশ্চয়ই যারা চলে যাচ্ছে তাদের চেয়ে কিছু বেশি পাওয়ার যোগ্য?'

'চিন্তা কোরো না। শীগ্রই আমাদের হাতে কিছু টাকা আসবে।'

যাই হোক, আমাদের কাছে টাকা থাকলেও বা আমরা তা দিয়ে কী করতে পারতাম? এই অঞ্চলে কেনার মতো কিছুই ছিল না। সর্বোপরি, আমরা সর্বদা এই ভয়ে ছিলাম যে কখন না জানি বোমা হামলা হয়, কখন না জানি মারা যাই।

ক্যাম্পের পরিবেশটা আতঙ্কজনক হয়ে উঠল। আট মাস আগে যখন আমরা প্রথম এখানে আসি তখন যে আমাদের কাছে খুব বেশি কিছু ছিল তা-ও না, তবে সবার মনে আনন্দ ছিল। আমরা খুশি হয়েছিলাম কারণ আমরা একটি ঘাঁটি তৈরি করছিলাম এবং মনে হচ্ছিল সুন্দর ভবিষ্যত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

১৯৯৮-এর শরতে পনেরোজন জিহাদি ক্যাম্প ছেড়ে চলে যায়, তাদের বেশিরভাগই ছিল নতুন রিক্রুট। তাদের চেহারা দেখে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে কষ্টের জীবন পার করা তাদের দ্বারা সম্ভব না। শেষমেশ ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে আমাদের এই ধৈর্য্যের পরীক্ষা শেষ হলো। রামাদানের এক সপ্তাহ পূর্বে বিন লাদেন কিছু টাকা হাতে পেলেন।

শায়খের বাসা থেকে বের হয়ে আবু ফারাজ আল-লিবি আমাকে ডেকে বললেন, 'তোমার জন্য একটা উপহার আছে।'

'কি উপহার?'

তিনি আমাকে ৪০০ ডলার দিলেন। এই টাকা কোত্থেকে এল? এটা বিন লাদেনের নিজস্ব সম্পদ, যা সারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ করা ছিল এবং গোপনে চ্যানেল হয়ে আমাদের হাতে এসেছে। এছাড়াও আমাদের মুসলিম শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল, বিশেষ করে সৌদি ব্যবসায়ীরা। তারা আমাদের জিহাদকে সমর্থন করত এবং জিহাদিরা তাদের বলেছে, এই করুণ অবস্থায় আমাদের সাহায্য করতে। কয়েকজন তো তাদের কাছে অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণের সরঞ্জামের জন্য ২০,০০০ ডলার

চেয়েছে এবং সেই পরিমাণ টাকা নিয়েই ফিরেছে। তারপর নেয়ামাতুল্লাহ ছিলেন, পাকিস্তানে যে আমাদের ব্যয়বহনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

আরেক দফা অর্থ সহায়তা এসেছিল পরে ১৯৯৯-এ, যখন বিন লাদেনের এক পুত্র সাদ সুদানিজ এক মেয়েকে বিয়ে করতে খারতুমে গিয়েছিল। সেই মেয়ের পরিবারও বিন লাদেনের পরিবারের মতো ইয়েমেনের হাদরামাউতের বংশোদ্ভূত। সাদ ইয়েমেনের পাসপোর্টে ভ্রমণ করল এবং সেখানে থাকা তার পিতার শেষ ব্যবসায়িক স্বার্থটুকু বিক্রি করে দিল। গোপনে সাদ উপার্জিত টাকাগুলো কান্দাহারে ফিরিয়ে আনল এবং তা ওসামার হাতে সোপর্দ করল।

অর্থনৈতিক সংকট শেষে বিন লাদেন সিদ্ধান্ত নিলেন ১৯৯৮-এর রামাদানের তৃতীয় দিন আল-জাজিরায় একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকার দিবেন। সাক্ষৎকারটি হলো একটি তাঁবুর ভেতরে। সেখানে আল-কায়েদার বিশজন প্রবীণ সদস্য ও শায়খের দেহরক্ষীরা উপস্থিত ছিল।

এক সপ্তাহ বাদে আমি বিন লাদেনের কাছে ইয়েমেনে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। কারণ আমার পাসপোর্টের মেয়াদ শেষের দিকে, তাছাড়াও আমি আমার কাজিনকে বিয়ে করতে চাচ্ছিলাম, যার সাথে আমার বিয়ে অনেক আগে থেকেই ঠিক হয়ে ছিল। বিন লাদেন মনে করেছিলেন, আমি চেচনিয়ায় যেতে চাচ্ছি। আমি এই বিষয়ে মসজিদে সাইফ আল-আদেলের সাথে কথা বললাম। তিনি আমাকে ২,৫০০ ডলার দিয়ে বললেন, 'গিয়ে বিয়ে করে ফিরে এসো'।

'কিন্তু আমি তো কেবল বিয়ে করার জন্য যাচ্ছি না...'

সাইফ মসজিদের আরেক প্রান্তে থাকা ওসামাকে ডাকলেন।

'আবু জান্দাল কি বলল শুনেছেন?'

তিনি আমাকে আরও ২,৫০০ ডলার দিয়ে বললেন, 'এই টাকাটা নাও, আর গিয়ে বিয়ে করে ফেল'। 'কিন্তু যাওয়ার আগে তোমার বদলি একজনের নাম বলে যাও।'

আমি সুহাইব আল-দারিকে বেছে নিলাম। তিনি ছিলেন ইয়েমেনি। ওসামা তখন আমাকে তিন মাসের ছুটি দিলেন।

তিনি আমাকে কয়েকজন ইয়েমেনির নাম দিলেন এবং তাদের সাথে দেখা করতে বললেন। তাদের সাথে আমার কেন দেখা করা উচিত তার ব্যাখ্যায় তিনি বললেন, 'তারা আমার সাথে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তাদের প্রত্যেকের বিবাহের উপযোগী কন্যা আছে। প্রথমজন তোমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

করলে দ্বিতীয়জনের কাছে যাবে, এভাবে চলতে থাকবে। কিন্তু তাদের অবশ্যই বলবে যে তুমি আমার জিহাদী সহকর্মী এবং যদি তার মেয়েকে তোমার সাথে বিয়ে দেয়, তবে তুমি তার মেয়েকে নিয়ে আফগানিস্তানে চলে আসবে। এ ব্যাপারে মিথ্যা বলবে না।'

যাত্রা করার পূর্বে আমি আবার বিন লাদেনের সাথে দেখা করতে গেলাম।

'শায়খ, কয়েকমাস আগে আপনি আমার কাছে একটা জিনিস আমানত হিসেবে রাখতে দিয়েছিলেন সেটা কি ফেরত নেবেন না?'

তিনি হেসে দিলেন। বললেন, 'না, ওটা তুমি রেখে দাও'।

আমি তাকে জোর করলাম, 'আপনি রিভলবারটা নিয়ে অন্য কাউকে দিন'।

তিনি বললেন, 'ওটা তোমার'। 'গোলমাল কোরো না। এই শান্তির সময়েও একটু আধটু ঝুঁকি থাকবেই,' তিনি অনুমান করলেন।

বাস্তবে আমার আফগানিস্তান ছেড়ে যাওয়ার আরও একটি কারণ ছিল। ১৯৯৯-এর গ্রীষ্মে যখন শায়খ ওসামা তালেবান নেতা মোল্লা উমরের প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তখন আমি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল যে আল-কায়েদা তালেবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং আমেরিকানদের বিরুদ্ধে তার স্বাধীন জিহাদের এখানেই সমাপ্তি ঘটবে।

আমি একবার আমার সন্দেহগুলো নিয়ে সাইফ আল-আদেলের সাথে কথা বলেছিলাম। তিনি বিন লাদেনের সিদ্ধান্তকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করে বললেন যে, বিন লাদেন পরিস্থিতির চাপে ছিলেন। কিন্তু আমার কাছে বাইয়াত হলো একটি দীনি বিষয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায় : বিন লাদেন ও তালেবান

১৯৯৬ সালে বিন লাদেন প্রথম যখন আফগানিস্তানে আসেন তখন অনেক ধরনের সংশয় দানা বাঁধতে থাকে। শায়খ ও মোল্লা উমর একে অপরকে চিনতেন না। বিন লাদেন সুন্দর করে পশতু বলতে জানতেন না, আবার তালেবানের উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক নেতারা খুব কম আরবি জানতেন। কিন্তু এভাবে কোনো কথোপকথন এগোয় না। তাদের মধ্যে অবশ্যই একজন দোভাষী দরকার ছিল। সে দায়িত্ব নিয়ে নিলেন আবদুল মাজিদ আল-তাবুকি।

জিহাদি ও আল-কায়েদার নেতাদের মধ্যে একটি ধারণা অনেকাংশে প্রচলিত ছিল যে এ মাদরাসা ছাত্ররা (অর্থাৎ তালেবান। তালেবান শব্দের অর্থ ছাত্র) মার্ক্সিজম দ্বারা প্রভাবিত ছিল। অনেকে তাদের নব্য-কমিউনিস্ট মনে করত। তালেবান যখন জালালাবাদসহ অন্যান্য এলাকাও দখল করে ফেলল, আমরা ভয় পাচ্ছিলাম, "আবার কমিউনিস্টদের হাতে না তো!" সেসময় অনেকের চিন্তা ও মতের বিরুদ্ধে গিয়ে শায়খ ওসামা নর্দান অ্যালায়েন্স ও কমান্ডার আহমদ শাহ মাসউদের বিরুদ্ধে তালেবানদের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেন।

অবস্থা বোঝার জন্য আল-কায়েদা তালেবানের কাছে প্রতিনিধি পাঠায়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন শায়খ আবদুল রাসুল সাইয়াফ। এ আলোচকদের কাজ ছিল বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়ন। অনেক আলোচনার পরে দেখা যায় আসলে আল-কায়েদা নর্দান অ্যালায়েন্সের চালানো প্রোপাগান্ডা ও গুজবের ফলে তালেবানের ব্যাপারে ভুল ধারণা পোষণ করেছিল।

১৯৯৬ সালের বসন্তে জালালাবাদ দখলের পর তালেবান আমাদের ক্যাম্প ভ্রমণের আগ্রহ প্রকাশ করে। বিন লাদেন সাথে সাথেই তার সঙ্গীদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। কিন্তু তালেবান সাদা পতাকা নিয়ে আগমন করে ও আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা দেয়—"আমাদের আরব বন্ধুদের কী অবস্থা? আমরাতো ভাই, সবাই মুসলিম ও মুজাহিদ!"

এত বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মধ্যেও বিশ্বাসের সংকটটা ঠিকই ছিল। আমরা ভালোভাবেই লক্ষ্য করলাম, মোল্লা উমর বিন লাদেনকে কান্দাহারে তালেবানের মূল ঘাঁটি পরিদর্শন করতে বললেন। একেবারে প্রাথমিক দিকের বিষয় হিসেবে বিন লাদেন নিজে মোল্লা উমরের প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করতে চাইলেন না। তিনি তার প্রতিনিধি পাঠালেন।

১৯৯৮ সালের অগাস্টে দূতাবাসে হামলার পর থেকে আমাদের ও তালেবানের মধ্যকার সমস্যা শুরু হয়। আন্তর্জাতিক মিডিয়ার কাছে শায়খ ওসামা যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, তাতে অনেকেই ভীত হয়ে ওঠে। মোল্লা উমর বিন লাদেনকে নিয়ন্ত্রণ করতেন না। আবার বিন লাদেনও তালেবানকে নাইরোবি ও দারুস সালামে হামলার কথা জানতে দেননি।

পূর্ব আফ্রিকায় হামলার কয়েক সপ্তাহ পরে তালেবানদের একটা প্রতিনিধি দল সৌদি আরবে হজ্জে যায়। এর নেতৃত্বে ছিলেন মোল্লা হাসিন রাব্বানি। তারা ফিরে আসার আগে সৌদি সরকার তাদের কাছে একজন বার্তাবাহক পাঠিয়ে একটি বার্তা পৌঁছে দেয়,

"আপনারা যাকে আশ্রয় দিচ্ছেন, সে ওসামা বিন লাদেন ইসলামি আইন ও সৌদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা থেকে বের হয়ে গিয়েছে। মিশরীয়দের কারণেই আমরা এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছি। আপনারা তাকে যেতে দিন। তাকে নিরাপত্তা দেওয়া বন্ধ করুন।"

যেহেতু বিন লাদেনের আশেপাশের অধিকাংশ নেতাই ছিলেন মিশরীয়, তালেবান ভাবল সৌদি সরকার হয়তো সত্যই বলেছে।

আফগানিস্তানে আসার পরপরই মোল্লা রাব্বানির নেতৃত্বাধীন দলটি বিন লাদেনের সাথে দেখা করতে যান। এটাই ছিল শায়খের সাথে রাব্বানির প্রথম আলোচনা। তালেবানের পক্ষে আহমাদ ওয়াকিল মুতাওয়াকিল ও মোল্লা জলিলও উপস্থিত ছিলেন। বিন লাদেনের আশেপাশে ছিলেন আল-কায়েদার সব বড় বড় নেতৃবৃন্দ। বিন লাদেনের তার সহকারীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন—আবু হাফস, মিশরীয়; সাইফ আল-আদেল, মিশরীয়; আবু হাফস আল-মাসরি, আরেক মিশরীয়—তালেবানরা সাথে সাথে বলে উঠল, "সৌদিরা ঠিকই বলেছে!"

বিন লাদেন অনেক রেগে যান। তারপর তিনি আমাকে ডেকে বলেন আল-কায়েদার অন্যান্য নেতাদের নিয়ে আসতে। তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন:

'এ এসেছে রিয়াদ থেকে, সে এসেছে এডেন থেকে, সে এসেছে সানাআ থেকে...'

আমাদের সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বিন লাদেন তালেবানকে বলেন, "দেখেছেন? আমি একা না, আমার আশেপাশে কেবল মিশরীয়রাই থাকে না। বরং এর বিপরীতটা সত্য। আরব উপদ্বীপের প্রায় সব গোত্র থেকেই কেউ না কেউ আমাদের সংগঠনে কাজ করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।"

তালেবান অনেক বেশি অবাক হয়। বোঝাই যাচ্ছে, তারা এসব জানত না আগে। বিন লাদেন অনেক আবেগী হয়ে যান। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করতেই থাকেন,

'নাহ! আমি একা না। এই প্রত্যেকটা মানুষের পেছনে একেকটি গোত্র আছে। আমরা সবাই আরব উপদ্বীপ ও আমাদের পবিত্র স্থানগুলোতে জাতিসংঘ ও আমেরিকার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াইকারী।"

শায়খের এমন সোজাসাপ্টা আলোচনা আগের সব ভুল বোঝাবুঝি দূর করে দেয়। শেষের দিকে তালেবান ক্ষমা চাওয়া শুরু করে।

মোল্লা উমরের উপদেষ্টা মোল্লা জলিল বিন লাদেনকে কথা দেন, "নিশ্চিত থাকুন, আপনার শত্রুরা আপনাকে হত্যা করার আগে আমাদের খুন করতে হবে। আপনার সঙ্গীদের সাথে সাথে আমরাও আপনাকে সবসময় নিরাপত্তা দিতে থাকছি ইনশাআল্লাহ্।"

১৯৯৮ সালের শরতে ক্লিনটন প্রশাসন তাদের দূত হিসেবে এনার্জি সেক্রেটারি বিল রিচার্ডসনকে পাঠায় তালেবানের কাছে। ১৯৯৮-এর আক্রমণের আগ পর্যন্ত আমেরিকার তৈল কোম্পানি আফগানিস্তান দিয়ে একটি পাইপলাইন প্রেরণের ব্যাপারে তালেবানের সাথে আলোচনায় ছিল। কিন্তু এখন রিচার্ডসন এসে তাদের নতুন বার্তা দেন,

"বিন লাদেন আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। আপনারা ছোট দেশ, আপনাদের আধুনিক রাষ্ট্র হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে আমরা সাহায্য করতে চাই। বিন লাদেনকে তার মুখ বন্ধ রাখতে বলুন, নয়তো আমাদের শক্তি ব্যবহার করতে হবে!" কিন্তু তালেবানের এ ধরনের হুমকি পছন্দ হয়নি। কিছু সময় পরে মোল্লা উমর আবার মোল্লা জলিলকে বিন লাদেনের কাছে পাঠান বিন লাদেনকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার বিষয়টি ঘোষণা করে আসার জন্য।

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে ঘটনার এক নতুন পালাবদল হয়। সে সময় বিন লাদেন দুটো সাক্ষাৎকার প্রদান করেছিলেন। একটি দিয়েছিলেন আল-জাজিরার জামাল ইসমাঈলের কাছে, একটি মরুভূমিতে। পরেরটি দিয়েছিলেন বিবিসি অ্যারাবিকের ইউসুফ যাঈদের কাছে। দুটো সাক্ষাৎকারেই তিনি আমেরিকার প্রবল সমালোচনা করেন। তিনি সৌদির মাটিতে আমেরিকার দখলদারত্ব, তেল লুণ্ঠন ইত্যাদির কঠোর সমালোচনা করেন। এ বিষয়টি নিয়ে আল-কায়েদার অধিকাংশ সদস্য অনেক বেশি চিন্তিত ছিল। কেউই সৌদির মাটিতে আমেরিকাকে চাইত না।

তালেবান সাথে সাথেই প্রতিক্রিয়া জানায়। মোল্লা উমর, মোল্লা জলিল ও মুতাওয়াকিলসহ কান্দাহার এয়ারপোর্টের পাশে আল কায়েদার ক্যাম্পে যান ও সাবধান করে আসেন,

"আপনার এসব কঠোর কথাবার্তা আমেরিকা ও পুরো বিশ্বকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। আপনি এসব বলা বন্ধ করুন, প্লিজ!"

"এটাই কি আপনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত?" বিন লাদেন জানতে চাইলেন।

"হ্যাঁ," মোল্লা উমর বললেন।

"সেক্ষেত্রে...আপনি আমাকে যা নিরাপত্তা দিয়েছেন তার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আমি আজ সন্ধ্যায়ই আফগানিস্তান ছেড়ে যেতে চাই। কিন্তু আমার ও আমার ভাইদের স্ত্রী-সন্তানকে সাময়িকভাবে এখানে রাখতে চাই। কেননা এখনই তাদের নিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।"

আল-কায়েদা যদি আসলেই আফগানিস্তান ত্যাগ করে চলে যায় তাহলে তালেবান-আল-কায়েদা সম্পর্কে অবনতি আসবে। এটা আল-কায়েদা আগেই ভেবে রেখেছিল। সেক্ষেত্রে নতুন বেইজ হবে সোমালিয়ায়। যদিও কিছুই চূড়ান্ত ছিল না। আমাকে একমাস পর সবকিছু চূড়ান্ত করার জন্য পাঠানোর কথা ছিল।

বিন লাদেন ঘরে ফিরে যাওয়ার পরপরই মোল্লা উমর মোল্লা জলিলকে আবার বিন লাদেনের কাছে পাঠান এক নতুন বার্তা দিয়ে, "আপনার যা খুশী আপনি বলুন, আমরা সবাই আপনার সৈন্য। আমরা আপনাকে রক্ষার জন্য সবকিছু করব। এর জন্য আমরা আমাদের সন্তান, স্ত্রী ও সব তালেবানকে খুশি মনে উৎসর্গ করব।"

তালেবান প্রধানের সিদ্ধান্তে কীভাবে পরিবর্তন এল? মিটিং এর আগে মুতাওয়াকিল বিন লাদেনের কাজের বিরুদ্ধে মোল্লা উমরকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু ফেরার পথে তিনি ছিলেন মোল্লা জলিলের সাথে। মোল্লা জলিল আমাদের প্রতি অনেক বেশি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এ কারণেই মোল্লা উমর তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন।

বিন লাদেন মোল্লা উমরের সাবধানতার সাথে সাথে কিছু পদক্ষেপ নিলেন। তিনি মোল্লা নিজাম আদ-দীন শামজির তত্ত্বাবধায়নে ৪০ জন আফগান-পাকিস্তানি উলামাকে নিয়ে গঠিত শুরার মিটিংয়ে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করলেন,

'আমার লক্ষ্য আরব ও ইসলামের স্বার্থকে রক্ষা করা। আমি সৌদি আরবের মাটিতে আমেরিকার অবস্থানকে প্রত্যাখ্যান করি। মোল্লা উমর আমাকে বক্তৃতা দিতে ও পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে জনসম্মুখে এবং মিডিয়ায় কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

তারপর তিনি আবার মোল্লা জলিলকে পাঠিয়ে আমাকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দিয়েছেন। আমার মনে হয় মোল্লা উমরকে সহজে প্রভাবিত করা যায়। তাই আমি আপনাদের কাছ থেকে সিদ্ধান্ত চাই। আপনারা কি মোল্লা উমরের সাথে একমত? নাকি আমাকে আপনাদের অতিথি হিসেবে রাখতে চান?'

মুফতি ও উলামায়ে কেরাম বুঝলেন যে বিন লাদেনের কথাই ঠিক। তাই তারা তালেবান প্রধানের কাছে বার্তা পাঠালেন যে, "মোল্লা, আফগান ও পাকিস্তানিরা নিহত হলেও বিন লাদেনকে আপনার রক্ষা করতে হবে। তাকে কোনোভাবেই আমেরিকা বা সৌদিদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত তাকে নিরাপত্তা দিতে হবে, কেননা তিনি নিঃসন্দেহে ইসলামের পক্ষেই দাঁড়িয়েছেন।"

কিছুটা আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি হলেও বিন লাদেন খুবই প্রজ্ঞা ও দক্ষতার সাথে উলামাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে ফেললেন।

১৯৯৮ সালের গ্রীষ্ম পর্যন্ত বিন লাদেন আনুষ্ঠানিকভাবে মোল্লা উমরের হাতে বাইয়াত দেননি। তবে অনেক আল-কায়েদা নেতাই দিয়েছিলেন। এখন শায়খ মোল্লা উমরের হাতে বাইয়াত দেওয়ার চিন্তা করলেন। তাত্ত্বিকভাবে তখন থেকে বিন লাদেন আর স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম নন। তার এখন থেকে কৌশলগত বিষয়ে তালেবান নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করা উচিত। এ বাইয়াত একধরনের অধীনতা, শৃঙ্খলার মধ্যে চলে আসা।

১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে যখন আন্তর্জাতিক চাপ বাড়তে থাকে তখন তালেবান ঘোষণা করে যে, বিন লাদেনের যোগাযোগ তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে এবং তিনি নতুন কোনো ঘোষণা নিয়ে আসবেন না। যদিও বিষয়টি নিয়ে আল-কায়েদায় ব্যাপক প্রতিবাদ শুরু হয়, কিন্তু শায়খ তালেবানের ঘোষণার বিষয়টিকে ঠান্ডা মাথায় ভাবলেন। কেননা তিনি এখন বাইয়াতবদ্ধ।

একটি মর্মান্তিক দূর্ঘটনা আল-কায়েদা ও তালেবানের মধ্যকার সম্পর্কে আরও জোরদার করল।

১৯৯৯ সালে ২৫ অগাস্ট, কান্দাহারে মোল্লা উমরের বাসস্থানে আক্রমণ হয়। মেইন গেইটের সামনে একটি গাড়িতে বোমা বিস্ফোরিত হয়। এ হামলায় তার একজন স্ত্রী ও একজন ছেলে শহিদ হন। বিন লাদেন ঘটনার পরপরই মোল্লা উমরের সাথে দেখা করতে যান। মোল্লা উমরের বাসস্থানের পাশেই আল-কায়েদার একটি গেস্ট হাউজ ছিল। সেখানে অনেক উল্লেখযোগ্য যোদ্ধা ও নেতা থাকতেন। নেতাদের মধ্যে উল্লেখ্য আবু হাফস ও সাইফ আল-আদেল। তারাই এ হামলায় প্রথম

আহতদের সাহায্য করেন। সেসময়ই তৎক্ষণাৎ আল-কায়েদার আরেক গেস্ট হাউজের মুজাহিদরা কান্দাহারের আশেপাশে সব রাস্তা অবরুদ্ধ করে দেয়। সে সময় থেকেই তালেবান ও আমাদের মধ্যকার বিশ্বাস ও আস্থার সম্পর্ক তৈরি হয়।

আমরা নিরাপত্তাসহ অনেক ক্ষেত্রেই তালেবানের সাথে আরও ভালোভাবে কাজ করা শুরু করি। বিন লাদেন মোল্লা উমরকে প্রস্তাব দেন যে আল-কায়েদা তালেবান কর্মীদেরকে আরও ভালো করে প্রশিক্ষণ দেবে, যেন তারা তাদের নেতাদের আরও ভালোভাবে রক্ষা করতে পারে। মোল্লা উমর এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এদিকে তালেবানও জালালাবাদ ও কাবুলে আরব যোদ্ধাদের নিরাপত্তায় কাজ বাড়িয়ে দেয়।

এ সমন্বয় খুব দ্রুতই ভালো ফল নিয়ে আসে। মোল্লা উমরের ওপর আক্রমণ চালানো ইউনিটকে বের করা হয়। এ হত্যার মিশন পরিচালিত হয় ইরান সরকারের নির্দেশে। মাজার-ই-শরিফে তালেবানের আক্রমণে দুই বছর আগে ইরানের আটজন কূটনীতিবিদ নিহত হয়। তার প্রতিশোধ হিসেবেই তারা এ কাজ করে। যে গাড়ি দিয়ে হামলা চালানো হয়, তার অবশিষ্টাংশ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে এটি এসেছে হেরাত থেকে। হেরাত মূলত ইরান সীমান্তের কাছে একটি আফগান শহর। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান যে, গাড়িটি বিস্ফোরণের আগে তারা গাড়ি থেকে দুজনকে বের হতে দেখেছে। তালেবান তাদের তিন দিনের মধ্যেই খুঁজে বের করে এবং তারা স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি প্রদান করে। তারা ছিল আফগান শরণার্থী। তাদের তেহরান কর্তৃপক্ষ মোল্লা উমরকে হত্যার জন্য পাঠায়। তৎকালীন তালেবানের গোয়েন্দাসংস্থা দুর্বল হওয়ায় তারা সহজেই তাতে অনুপ্রবেশের সুযোগ পায়। সে সময় তারা সোভিয়েতদের থেকে পাওয়া নিরাপত্তা বিষয়ক যন্ত্রপাতি পালটায়নি। এ তদন্তে সাইফ আল-আদেল এবং আবু হাফস আল-মাসরি তালেবানের সাথে যোগ দেন।

এ হত্যাচেষ্টার পরে আমরা মোল্লা উমরকে পরামর্শ দিই, এখনকার মতো 4x4s ও টয়োটা নিয়ে বের না হতে। এতে তাকে বেশি দেখা যায় ও সহজেই আক্রমণ করা সম্ভব। আমরা তাকে বললাম যেন তিনি চলার সময় সাধারণ গাড়ি ব্যবহার করেন ও সাধারণ মানুষের সাথে মিশে যান। যেন তাকে আলাদা করে দেখা বা চেনা না যায়। আমরা এখন বিন লাদেনের জীবন নিয়ে আশঙ্কায় পড়ে গেলাম। এ দুজন নেতার জন্য আমরা নিরাপত্তা বাড়িয়ে দিলাম।

এসকল ঘটনা নিঃসন্দেহে আল-কায়েদা ও তালেবানের সম্পর্ককে অনেক গভীর করেছে। কিন্তু এখনও তাদের মধ্যে কিছুটা আস্থার অভাব ছিল। মোল্লা উমরের কাছের কয়েকজন উপদেষ্টা আল-কায়েদাকে পছন্দ করতেন না। তাদের

মধ্যে একজন ছিলেন মুতাওয়াকিল। তিনি কখনোই আরবদেরকে পছন্দ করতেন না। পরবর্তী সময়ে তিনি আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

সব সন্দেহ সংশয় দূর হয়ে যায় দুই বছর পরে। আল-কায়েদা তালেবানকে তাদের (তালেবানের) প্রধান শত্রুকে হত্যার করার প্রস্তাব দেয়—কমান্ডার আহমদ শাহ মাসউদ। ৯/১১-র মাত্র দুইদিন আগে আল-কায়েদা নর্দান অ্যালায়েন্সের কমান্ডারকে হত্যার জন্য দুইজন সুইসাইড বোম্বারকে পাঠায় (এ হামলা সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা আছে)। বিন লাদেনের অবস্থান আফগানিস্তানে পাকাপোক্ত হয়ে যায়।

আমি বিন লাদেন ও মোল্লা উমরের মধ্যকার অনেক মিটিং এ উপস্থিত ছিলাম। তালেবান নেতা এক চোখে দেখতেন না। লম্বায় তিনি বিন লাদেনের সমানই ছিলেন তিনি সাধারণত কালো বা নীল স্লিভলেস জ্যাকেট এবং হাঁটু পর্যন্ত লম্বা শার্ট পরতেন। মোজা ছাড়া সু পরতেন। তিনি কান্দাহারের আঞ্চলিক ঐতিহ্য অনুসরণ করে পাগড়ী পরতেন। তিনি খুব কম কথা বলতেন, এমনকি মিটিংয়েও। বিন লাদেনের মতো তিনিও ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করতেন, খুবই গুরুগম্ভীর আওয়াজে কথা বলতেন। আল-কায়েদা ক্যাম্পের কেন্দ্রে তাদের মিটিংগুলো আধঘন্টার বেশি হতো না বললেই চলে।

দুজন একে অপরের বিপরীতে বসতেন। আমি সবসময় বিন লাদেনের পেছনে দাঁড়াতাম। মাঝেমধ্যে তারা কেবল দুজন একা দেখা করতেন গ্লাসহাউজের মতো জায়গায়।

তালেবানরা প্রাক্তন-কমিউনিস্ট কিনা—আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দের এমন দুশ্চিন্তা এসব সভার মাধ্যমে দূর হলো। মুতাওয়াকিলকে নিয়েও আমাদের চিন্তা ও পরিকল্পনা ছিল। কেননা তিনি আল-কায়েদাবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি অবশ্য ভালো আরবি বলতে পারতেন। তিনি পুরোপুরি আমাদের বিরুদ্ধে ছিল। তিনি 'আরবদের সমস্যা' মোকাবেলার চেয়ে আফগানিস্তান রাষ্ট্রের উন্নয়নকে বেশি জরুরি মনে করতেন। তিনি বিন লাদেনকে পছন্দ করতেন না। কিন্তু বিন লাদেনের প্রতি মোল্লা উমরের সমর্থন তিনি কমাতে পারেননি। অন্যদিকে মোল্লা জলিল ছিলেন তালেবানের নেতাদের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে বড় সমর্থক।

চতুর্দশ অধ্যায় : ইয়েমেনে ফেরার যাত্রা

মোল্লা উমরের ওপর ব্যর্থ হত্যাচেষ্টার কয়েক মাস আগে আমি শায়খ ওসামার দুআ নিয়ে বিয়ে করতে ইয়েমেনে ফিরে গিয়েছিলাম। সানাআয় পৌঁছামাত্রই আমি এডেনে আমার এক বন্ধুকে ফোন করে তাকে আমার চাচা সালাম আল-বাহরির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেতে বলি যে তার মেয়েটি এখনও 'প্রাপ্তব্য' আছে কিনা। আমার প্রথম চাচাত বোন, যার সাথে চার বছর আগে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল, অন্য কারো সাথে তার বিয়ে হয়ে গেছে। এটা সত্য যে আমি অনুপস্থিত থাকাকালীন সময়ে কোনো সংবাদই পাঠাইনি। এখন আমি যদি কোনো স্ত্রী খুঁজে পেতে চাই, তবে আমাকে 'বিন লাদেনের পরিকল্পনা' অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে। আমি তেমন একটা হতাশ ছিলাম না।

বিন লাদেন তার যে বন্ধুদের ঠিকানা দিয়েছিলেন আমি ঘুরে ঘুরে তাদের বাড়িতে গেলাম। প্রথম তিনজন আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন; যদিও তারা নিজেরাই বিন লাদেনের সাথে জিহাদ করেছে, সেজন্য যে তাদের কন্যাকেও আফগানিস্তানে যেতে হবে—এমনটা তারা যুক্তিসঙ্গত মনে করেননি।

কিছু সময় বাদে আমি শুনতে পেলাম যে দুজন ইয়েমেনি আফগানিস্তান থেকে ফিরে এসেছে। আমি তাদের হোটেলে তাদের দেখতে গেলাম এবং তাদের দেখে আমি অবাক হলাম। তারা আবদুল মালিক আল-রাহাবি এবং সালিম খামদানি ছাড়া আর কেউ নন। সালিম খামদানি আমাকে বললেন,

'শায়খ আমাকে আপনার স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করতে বলেছেন। আমাদের বিয়ে করার জন্য দুই বোনকে খুঁজে বের করতে হবে!'

এই প্রস্তাবের কারণ ছিল আমাদের ভবিষ্যৎ স্ত্রীদের গোত্র ও আল-কায়েদার মধ্যে একটি মৈত্রী তৈরি হবে এবং যদি প্রয়োজন পড়ে তবে আমরা তাদের সুরক্ষা থেকে উপকৃত হতে পারব।

এই ধরনের কৌশলগত বিবাহ মধ্যপ্রাচ্যের গোত্রগুলোর মধ্যে খুব প্রচলিত। তবে এটা আমাদের মিশনকে অবশ্যই জটিল করে তুলেছিল। একজন পিতা হয়তো তার এক কন্যাকে আফগানিস্তানে যেতে দিতে রাজি হতে পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি তার দুজন কন্যাকে বিয়ে দিবেন। আমরা উপহারসামগ্রী ও বিবাহের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু কিনলাম; একই সন্ধ্যায় আমরা সালিমের চাচাতো বোনদের সাথে দেখা করি। দুই বোন আমাদের বিয়ে করতে রাজি হয়। তারা

চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং পঁচিশ দিন পরে ছিল বিয়ের রাত। আমার মা—যাকে আমি বছরের পর বছর ধরে দেখিনি—তার বড় ছেলের বিয়েতে অংশগ্রহণ করতে পেরে খুব আনন্দিত হয়েছিলেন।

আমাদের বিয়ের দুসপ্তাহ পর যখন আমার স্ত্রী তাইসির তার পরিবারের সাথে ছিল, আমি সানাআর হাবরা কোয়ার্টারের গেস্ট হাউজে কে ছিল তা দেখতে গেলাম। খাল্লাদের ভাই আবদুল আযিয বিন আত্তাশ ও বসনিয়ায় আমার অন্যতম সাথি সামির আল-মাকতারি সেখানে কয়েকজন বিদেশির সাথে ছিলেন—ইরাকি, মরোক্কান এবং সৌদি—যারা আত্মগোপনে ছিল। সেখানে কারাগারে থাকা যাইন আল-আবেদিন আল-মিজহারকে (এডেন-আবইয়ানের ইসলামিক সেনাবাহিনীর নেতা) মুক্ত করার লক্ষ্যে কিছু চোরাই ভাড়ার গাড়ি বিক্রি এবং সেই অর্থ দিয়ে অস্ত্র কেনার একটি পরিকল্পনা চলছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ইয়েমেনের কর্তৃপক্ষ এই পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পেরে যায় এবং আমি সহ এই নেটওয়ার্কে জড়িত সবাইকে গ্রেফতার করে।

দূতাবাসের হামলার পর থেকে পুলিশ আরও সজাগ হয়ে যায় এবং বিদেশি জিহাদিদের ওপর নজরদারি শুরু করে, এমনকি তাদের কয়েকজনকে গ্রেফতারও করে। এই সময়েই হদিদা শহরে এক মুজাহিদ তিনজন ভারতীয় মিশনারীকে হত্যা করে এবং এ ঘটনায় কিছু বিদেশি জিহাদি জড়িত ছিল। হাবরায় সকলেই ছিল গুপ্তচর, তাই আপনি সেখানে একজন সন্দেহভাজন ছাড়া কিছু নন।

থানায় আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথেই আমি হাবরার গেস্ট হাউজে যাই। সেখানে বিদেশিদের নতুন পরিচয় দেওয়ার জন্য যে অসংখ্য জাল পাসপোর্ট ছিল সেগুলো আনতে গিয়েছিলাম। আমাদের কাছে নকল ডকুমেন্টও ছিল; বিজনেস ক্যাটালগ, বিবাহের চুক্তি, সরকারী স্ট্যাম্প ইত্যাদি। আমি সবগুলো কয়েকটি ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলাম এবং একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি পৌঁছলাম। আমি ইব্রাহিম আল-সুরিকে ডেকে আনলাম। কিন্তু তিনি উদ্বিগ্ন, চিন্তিত ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, গুজব রটেছে যে, পুলিশ আমার পেছনে লেগেছে। আমি ব্যাগ দুটোর দায়িত্ব তার হাতে অর্পণ করলাম। এরপর আমি আমার স্ত্রীকে আনতে শ্বশুরবাড়ি গেলাম এবং তৎক্ষণাৎ আফগানিস্তানে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ, দিনশেষে কেবল শায়খই আমাকে রক্ষা করতে পারবেন। কিছু যুবক পালাতে সক্ষম হয়েছিল এবং এখন আমরা তাদের সালিম খামদানির বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছি। আমরা তাদের জাল পাসপোর্ট দিয়েছিলাম যাতে তারা ইয়েমেন ছেড়ে আফগানিস্তানে যেতে পারে।

আমি এগারো জন সহকর্মীর সাথে রওনা দিলাম। আমি আমার নাম পরিবর্তন করলাম এবং নিজেকে দেখতে কিছুটা বয়স্ক করে তুললাম। সানাআর দূতাবাস থেকে পাকিস্তানের জন্য আমাদের ভিসা সংগ্রহ করার কথা ছিল, কিন্তু একজন আমাদের পাকিস্তান থেকে কিছু জাল স্টিকার পাঠিয়েছিল তাই আমরা পাসপোর্ট নিজেরাই বানিয়ে নিলাম। সানাআ বিমানবন্দরে পাসপোর্ট কন্ট্রোলের লোকটি আমাকে চিনতে পেরেছিল, 'আপনি শাবওয়ার বাসিন্দা এবং আপনার স্ত্রী সানাআর বাসিন্দা। আপনারা একসাথে কীভাবে?'

'ভালোবাসা আমাদের দুজনকে একত্রিত করেছে!'

'ঠিক আছে...শায়খকে আমার তরফ থেকে সালাম দিবেন!'

প্রত্যেককে আমাদের প্রায় ১০০ ডলার করে ঘুষ দিতে হয়েছিল।

পাকিস্তানে ইতোমধ্যে অসংখ্য অফিসারকে আমরা আয়ত্ত করে ফেলেছিলাম। করাচি বিমানবন্দরে আমাদের কোড ওয়ার্ড ছিল কেবল এক উৎসুক সুরে দেওয়া সালাম, 'আসসালামু আলাইকুম'। এবার অবশ্য পুলিশ আমাদের সবার পাসপোর্ট নিল এবং আমি সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম যে, হয়তো কিছু ভুল হয়েছে আমাদের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সবগুলো পাসপোর্টেই স্ট্যাম্প করল।

ওসামা আমাকে তিন মাস সময় দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ইয়েমেনে পাঁচ মাস কাটিয়েছি। সত্যি বলতে আমি সময়গুলো কেবল স্ত্রীর সন্ধানে ব্যয় করিনি—শায়খ ওসামা আমাকে আল-কায়েদার পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটি মিশনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

এর মধ্যে অন্যতম মিশন ছিল ইয়েমেনি উপকূলে অবস্থিত সোকোত্রা দ্বীপের ব্যাপারে। সেখানে আমেরিকানদের উপস্থিতি আছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছিল। আমি কান্দাহারে ফিরে জানালাম যে, সোকোত্রা অপরিচিতদের জন্য বেশ অনিরাপদ জায়গা এবং সেখানে আমেরিকানরা এসে ঘাঁটি স্থাপনের সম্ভাবনা খুব কম।

অন্যান্য মিশনগুলো সোমালিয়া, সৌদি আরব ও বিশেষত ইয়েমেনের বিষয়ে ছিল, যেখানে আমি আল-কায়েদার পক্ষে উপজাতিগুলোকে একত্রিত করতে চেয়েছিলাম। আমি শাবওয়া অঞ্চলে উপজাতীয় প্রধানদের পাশাপাশি কিছু উলামাদের মধ্যে প্রচুর প্রচারণা চালাই, তাদের মধ্যে একজন হলেন আবদুল মাজিদ জিন্দানি, যিনি ১৯৮০-র দশকে আফগানিস্তান থেকে লাদেনের সহযাত্রী ছিলেন।

কেত্তায় শায়খ ওসামার আফগান দোভাষী আবদুল মাজিদ আল-তাবুকীর সাথে আমার যোগাযোগ করার কথা ছিল। আমার পাঁচ মাস আল-কায়েদা ঘাঁটি থেকে দূরে থাকাকালীন সময়ে আমি তার সাথে ছয়বার যোগাযোগ করি। তিনি গাড়ি চালিয়ে কান্দাহারে যেতেন—এতে কমপক্ষে তার পাঁচ ঘন্টা সময় লাগত, এবং পরের দিন শায়খের নির্দেশনা নিয়ে আমার কাছে কেত্তায় ফিরে আসতেন। ১৯৯৯ সালের জুলাইয়ে আমি আফগানিস্তানে ফিরে এলে আবু হাফস আল-মাসরি আমাকে কার্ড ব্রাউন এলাকায় কাবুল গেস্ট হাউজের দায়িত্বে দেন। আমি সে বছরের শেষ অবধি সেখানে ছিলাম। বিন লাদেন মাসে ৬৪ ডলার করে দিতেন। এই পুরো সময় জুড়ে আমি কাবুলের বাইরের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পগুলোয় ঘুরেছি, যেখানে আমি অনেক নতুন রিক্রুটের সাথে পরিচিত হয়েছি। আমি তাদের আমাদের সংগ্রামের মূল কারণটি বুঝালাম—আমেরিকানদের বিরুদ্ধে জিহাদ।

গেস্ট হাউজের পর আমি দুই মাসের জন্য ক্লোজ কমব্যাটের একটি প্রশিক্ষণ কোর্স করতে গিয়েছিলাম। কোর্সটি হচ্ছিল, লোঘার ক্যাম্পে এবং সেখানে শায়খের বেশ কয়েকজন দেহরক্ষী এবং ৯/১১ আক্রমণকারীদের একজন—খালিদ আল-মিজহার সহ আমরা কোর্সে মোট ত্রিশজন ছিলাম।

এই কোর্সের পরিচালক ছিলেন একজন পাকিস্তানি প্রশিক্ষক, যিনি ফারুক নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি হ্যান্ড-টু-হ্যান্ড কমব্যাট এবং তেকোনদোতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। ২০০০ সালের শুরুতে প্রশিক্ষণ শেষে আমি কান্দাহারে ফিরে আসি, যেখানে বিন লাদেন কোর্সের ত্রিশজন গ্র্যাজুয়েটকে একত্রে ডেকেছিলেন। এখন তিনি নাইরোবি এবং দারুস সালামের দূতাবাসে হামলার সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করলেন: কী গাড়ি ব্যবহৃত হয়েছিল, কী ধরনের বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয়েছিল, পরিকল্পনা এবং কারণগুলো, তার মতে কেন হামলাগুলো ন্যায়সঙ্গত ছিল।

আমার ফিরে আসার কয়েক দিন পরেই আমি ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হই। আমি আফগান হাসপাতালে ভর্তি হতে চাইনি। সেখানে তারা যুদ্ধাহত সমস্ত লোকের যত্ন নিত। আমি নিজেই নিজের যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। তবে দুসপ্তাহ পরে আমি রক্ত বমি করা শুরু করলাম। আমি ডা. জাওয়াহিরির কাছে পরামর্শ চাইলাম এবং তিনি আমাকে মোল্লা উমরের বাড়ির নিকটবর্তী গেস্ট হাউজের রান্নাঘরে নিয়ে যান। তিনি আমাকে পুরো এক গ্লাসভর্তি অত্যন্ত চর্বিযুক্ত মাংসের স্টক দিলেন এবং সেটা আমাকে পান করতে বললেন। আমি মিশ্রণটি গিলে ফেললাম তবে সেটা আমার মোটেও ভালো লাগেনি—মনে হচ্ছিল যেন আমি অসুস্থ হতে চাচ্ছিলাম। এখন

জাওয়াহিরি আমাকে কাঠ কাটা শুরু করতে বললেন যাতে আমার শরীর থেকে প্রচুর ঘাম বের হয়। আমি ক্লান্ত হয়ে আবার অসুস্থ বোধ করছিলাম। তিনি আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন,

'তোমাকে চেষ্টা করতে হবে। যাও, গিয়ে অসুস্থ হয়ে ফিরে এসো।'

তারপরে তিনি আমাকে কিছুটা দই খেতে দিলেন। এরপর গায়ে একটা মোটা কম্বল জড়িয়ে তিন ঘন্টা ঘুমালাম, যাতে আমি আরও ঘামতে পারি। এটি যেন একটি অলৌকিক ঘটনা ছিল, আমি ঘুম থেকে জেগে পুরোপুরি সুস্থ অনুভব করলাম। জাওয়াহিরি আমাকে ফল, শাকসবজি, দুধ ও মধু খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন তবে মাংস বা রান্না করা খাবার খেতে বারণ করলেন। আমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, তার চিকিৎসা কাজ করেছিল। আমি এখন পুনরায় বিন লাদেনের দেহরক্ষী হিসেবে আমার দায়িত্ব পালন শুরু করতে পারলাম, যার জন্য আমাকে প্রতি মাসে ৯৪ ডলার দেওয়া হতো।

শায়খ কাবুলে তালেবানের সাথে যুদ্ধ করতে যেতে চেয়েছিলেন। আমার এটাকে ভালো বুদ্ধি বলে মনে হয়নি,

'আপনি সেখানে গিয়ে কী করবেন? আপনার সেখানে যাওয়া উচিত না, এটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ এবং আমাদের এখানে আপনাকে দরকার'।

বিন লাদেন আমাকে বললেন, 'জিহাদের সাথে আমার হৃদয়ের বন্ধন পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যুদ্ধের ময়দানে আমার কিছু সময় ব্যয় করা দরকার'।

তিনি সেখানে তিন দিনের বেশি না থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু তিন দিন পর তিনি আমাকে আমার পরিবার নিয়ে এসে কাবুলে তার সাথে যোগ দেওয়ার জন্য বললেন। কাবুল গেস্ট হাউজে বিভিন্ন জাতীয়তার জিহাদিদের মধ্যে গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এই সমস্যা মূলত সিরিয়ান বুদ্ধিজীবী আবু মুসআব আল-সুরির কারণে হয়েছিল। তিনি সকলের ওপর নিজের ধারণা চাপিয়ে দিয়েছিলেন এবং কারো কথাই শুনছিলেন না। একটি গ্রুপের নেতা হওয়ার দরুন তাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়নি। এছাড়াও তিনি তালেবানদের সাথে এমন আচরণ করছিলেন যেন তারা কাফের, কারণ, তারা কবরের সামনে সিজদা করত এবং নামাজ পড়ত।

আবদুর রহিম আল-নাশিরির সাথে আমি গেস্ট হাউজে কিছু নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনার এবং সেখানকার আশি সদস্যকে পুনরায় একত্রিত করার একটি পরিকল্পনা পেশ করলাম। আশি সদস্যের মধ্যে চল্লিশ জন ছিলেন আল-কায়েদার জিহাদি, বাকিরা ছিলেন মিশরীয়, লিবিয়ান এবং আলজেরিয়ার, যারা আয়মান আল-

জাওয়াহিরির সংগঠন জামায়াত ইসলামিয়ায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। গেস্ট হাউজে শান্তি ফিরে না আসা পর্যন্ত বিন লাদেনকে আমি সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিদিন অবহিত করতাম।

পঞ্চদশ অধ্যায় : বিন লাদেনের স্ত্রী এবং সন্তানাদি

তার সন্তানাদি

সে সময় ওসামা বিন লাদেনের নয় জন ছেলে ছিল—আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, আবদুর রহমান, সাদ, উসমান, উমর, খালিদ, হামজা ও লাদেন। বড় ছেলে আবদুল্লাহ বাদে তারা সকলেই আমাদের সাথে কান্দাহারে থাকত। আবদুল্লাহ ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে তার পিতাকে ছেড়ে সুদানের খারতুমে বসবাস করতে চলে গিয়েছিল। ২০০০ সালে উমরও চলে যায়। বড় ছেলেরা ক্যাম্পের মসজিদে থাকত। তাদের কিছুটা জমি ছিল। কিছু অর্থ উপার্জনের জন্য তারা সেটা চাষ করত।

বিন লাদেনের সবচেয়ে আদরের ছেলেরা ছিল মুহাম্মদ এবং সাদ। তারাই তার সবচেয়ে কাছের ছিল। মুহাম্মদ শারীরিকভাবে আল-কায়েদা প্রধানের সাথে সবচেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল এবং সাদ আল কায়েদা প্রধানের মতো চরিত্রের অধিকারী ছিল। মুহাম্মদ এবং সাদ প্রতি মিনিটে তাদের পিতার নির্দেশের জন্য প্রস্তুত থাকত।

আমি তাদের ভালো করেই জানতাম। মুহাম্মদ আবু হাফস আল-মাসরির অন্যতম কন্যা খাদিজাকে বিয়ে করে, যেহেতু আবু হাফস বিন লাদেনের নিকটতম সহযোগীদের একজন ছিলেন। সাদ ১৯৯৯ সালে ২১ বছর বয়সে সুদানে বিয়ে করে; তার স্ত্রী ছিল সুদানী বংশোদ্ভূত ইয়েমেনি। আমি ইতোমধ্যে বর্ণনা করেছি যে সে কীভাবে তার পিতার বিনিয়োগ পুনরুদ্ধার করতে সুদানে ভ্রমণ করেছিল। এর ছ'মাস পর সে অনুরূপ আরেকটি যাত্রা করে এবং তার পিতার জন্য আরও অর্থ নিয়ে ফিরে আসে। প্রথম ভ্রমণ থেকে ফেরার পর ওসামা তাকে কান্দাহার ক্যাম্পে একটি বাড়ি দেন।

পরিবারে সাদ ও মুহাম্মাদের দায়িত্ব ছিল সুনির্দিষ্ট। সাদ পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্বে ছিল। সে তার ভাইয়েদের এবং শায়খের স্ত্রীদের কাছে খরচাপাতি দিত। ক্যাম্পের এক প্রান্তে সে নিজের ব্যবসা পরিচালনা করত এবং এক খণ্ড জমি চাষ করত। সে পরিবারের জন্য সমস্ত খাবারের জিনিসও কিনত।

মুহাম্মদ পরিবারের আনুষাঙ্গিক বিষয়ের দায়িত্বে ছিল। বিন লাদেনের কোনো স্ত্রী যদি পিকনিক করতে বা সুকে (বাজারে) যেতে চাইতেন, মুহাম্মদ তাকে গাড়িতে করে সেখানে নিয়ে যেত। তার ভাইদের মধ্যে যখন কারো বিয়ে ঠিক হতো, তখন মুহাম্মদ সেই বাগদত্তা দম্পতির সাক্ষাতের সমস্ত ব্যবস্থা করত। শায়খ যখন কোনো অতিথির সম্মানে রাঁধুনিকে ভেড়া জবেহ করার নির্দেশ দিতেন তখন মুহাম্মদ সকল

রসদের ব্যবস্থা করত। এই কাজ বেশ ক্লান্তিকর ছিল যেহেতু শায়খ প্রতি মাসে বেশ কয়েকটি লরি ভর্তি ভেড়া অর্ডার করতেন।

উসমান ছিল পরিবারের সৈনিক। সে কান্দাহার ও কাবুলে বিশেষজ্ঞ সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। সে যখন ছোট ছিল তখন আমি তাকে অস্ত্র পরিচালনা শিখিয়েছিলাম। সে ছিল একজন প্রকৃত সামরিক মানসিকতার ব্যক্তি এবং নিঃসন্দেহে বিন লাদেনের সব ছেলের মধ্যে সে ছিল জিহাদের প্রতি সবচেয়ে নিবেদিত। তবে এটা সত্য যে, সেই সময়ে লাদেনের অন্যান্য ছেলেদের বয়স কম ছিল।

বিন লাদেন তার সব ছেলেদের দায়িত্ব এবং কাজ দিতেন, বিশেষত সালাত এবং সামরিক প্রশিক্ষণের। তা ছাড়া তারা নিজেদের ইচ্ছেমতো যা খুশি করতে পারত। কিন্তু তারা গেমস খেলতে পারত না, কারণ তাতে বিদ্যুতের প্রয়োজন হতো। সাধারণত ফজরের সালাতের পর তারা মসজিদে কুরআন শিখত। এরপর তারা তাদের ব্যবসা বা পড়াশোনা করতে যেত।

তাদের পিতার মতো বিন লাদেনের ছেলেরাও সবাই দুর্দান্ত ঘোড়সওয়ার ছিল। তারা ফুটবল খেলত বা ক্যাম্পের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া সেচখালে সাঁতার কাটতো।

সাদের ঠোঁটে সর্বদা হাসি লেগে থাকত। সে-ই ছিল সবচেয়ে বেশি দুষ্টু। কখনো কখনো সে তার বন্ধুদের না জানিয়ে সজারু খেতে দিত।

ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে তার বাচ্চাদের প্রতি কঠোর হওয়ার অভিযোগ আনা যায় না। যদি তাদের মধ্যে কেউ খুব খারাপ কিছু করত তবে তিনি তাকে ডেকে পাঠাতেন,

'উম্মে হামজাকে (তার অন্যতম স্ত্রী) গিয়ে বলো শাস্তির আসর এবং চাবুক প্রস্তুত করতে।'

বাচ্চাটি ফিরে এসে বলত, 'আসর এবং চাবুক প্রস্তুত, বাবা।'

সালাত আদায় করে দুজনে উম্মে হামজার ঘরে যেতেন এবং বিন লাদেন তাকে চাবুক দেখিয়ে হুমকি দিতেন। তবে সাধারণত শাস্তি এতদূরই এগোত, তিনি নিজের হুমকি বাস্তবায়ন করতেন না বললেই চলে।

তার সন্তানরা অন্যান্য জিহাদিদের সন্তানদের সাথে মিলেমিশে থাকতে এবং তাদের মতোই তারাও বেশিরভাগ সময় কান্দাহারে কাটাত। কেবল আবদুর রহমান তিন বা চারবার পাকিস্তানে ভ্রমণ করেছিল—তার লিভারে সমস্যা ছিল এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে তার সেখানে যেতে হতো।

সে একবার বিন লাদেনের একজন স্ত্রীকে সাথে করে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল, যাতে তিনি তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। একবার উম্মে খালিদ তার সাথে পাকিস্তান ভ্রমণ করেছিলেন, যেখানে তিনি তার মা ও বোনদের সাথে দেখা করেছিলেন।

আবদুর রহমান তার পিতার মতো লম্বা ছিল (১.৯ মিটার)। একবার আমাদের প্রচুর নিরাপত্তাজনিত সমস্যা ছিল তাই আমরা তাকে বিন লাদেনের মতো পোশাক পরাই এবং একটি ডিকয় হিসেবে ব্যবহার করি। অন্যদিকে তার পিতা আরেক রাস্তা দিয়ে চলে যান।

শায়খের মেয়েদের সচরাচর দেখা যেত না। কোনো একজনের বিবাহের বয়স হওয়ার সাথে সাথে ছেলেরা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসত। বিন লাদেন দুজন জিহাদিকে (আওস আল-মাদানি ও আবদুল্লাহ আল-হালাবি) পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তারা যেন তার মেয়েদের বিবাহ করে। আমি বিয়েতে ছিলাম। শায়খের পূর্বপুরুষ ইয়েমেনের যেসব অঞ্চল থেকে এসেছিল, সেখানকার ধর্মীয় সংগীত এবং জনপ্রিয় নৃত্য দিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

৯/১১-এর পর বিন লাদেনের সন্তানদের কী হয়েছিল?

সাদ ইরানে চলে গিয়েছিল, তারপরে সে আবার আফগানিস্তানে ফিরে আসে।

ছোট বাচ্চা হামজা ও খালিদকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

অন্যরা, মুহাম্মদ ও উসমান তাদের পিতার সাথেই রইল।

তার স্ত্রীগণ

কান্দাহারে বিন লাদেনের সাথে তার তিন স্ত্রী ছিল। তার স্ত্রী উম্মে আবদুল্লাহ ছিলেন সিরিয়ান। তিনিই বিন লাদেনের বেশিরভাগ সন্তানের মা। আর ছিলেন উম্মে হামজা (তার আসল নাম নাজওয়া আল-ঘানেম) ও উম্মে খালিদ। তারা দুজন ছিলেন সৌদি। ২০০০ সালের বসন্তে আসেন চতুর্থ স্ত্রী—আমাল আল-সাদাহ, এক ইয়েমেনি। আমিই তার বাবা-মায়ের কাছে শায়খ ওসামার মোহরানা নিয়ে যাই। আমার চলে আসার পর বিন লাদেনের সাথে তার এক মেয়ে হয়।

বিন লাদেনের প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য আলাদা অ্যাপার্টমেন্ট ছিল। তাদের সম্পর্কে আমার জ্ঞান তাদের প্রত্যেকের ঘরের দরজা পর্যন্তই শেষ। কিন্তু আমার সাথে আফগানিস্তানে আমার স্ত্রী ছিল, সে তাদের খুব ভালোভাবেই চিনত।

উম্মে আবদুল্লাহ ছিলেন শায়খ ওসামার প্রথম স্ত্রী এবং তার মায়ের মতোই সিরিয়ান। বিন লাদেনের ছাত্রজীবনে তারা বিয়ে করেন। সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধে

তিনি শায়খের সাথে ছিলেন। তিনি খুবই সুন্দরী মহিলা ছিলেন। ওসামার সাথে তার ছিল সাত ছেলে ও আমার জানা মতে কমপক্ষে একটি মেয়ে—ফাতিমা। ফাতিমাকে আমি ভালো করেই চিনতাম। ফাতিমার বিয়েতে আমাকে ও আমার স্ত্রীকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। ফাতিমার বিয়ে হয় আওস আল-মাদানির সাথে। তিনি ছিলেন শায়খের একজন ব্যক্তিগত গার্ড। কান্দাহারের নিকটে এক যুদ্ধে তিনি শহিদ হন।

উম্মে আবদুল্লাহ প্রতিবছর সিরিয়ায় তার পরিবারকে দেখতে যেতেন তিনি সাথে করে অনেক উপহার সামগ্রী নিয়ে আসতেন। ২০০০ সালে তার মনে হতে লাগল যে, কান্দাহারে এ কঠিন জীবনযাপন তার পক্ষে আর সম্ভব না। তাই তিনি সিরিয়ায় চলে যান। তার ছেলে উমরও কিছুদিন পর সেখানে চলে যায়।

বিন লাদেন তার সব ছেলে ও স্ত্রীদেরকে একপ্রকার খরচ দিতেন। কিন্তু তার পক্ষে তা আর বাড়ানো সম্ভব ছিল না। আমি একদিন শুনলাম, তিনি তার ছেলেদেরকে বলছেন, 'বাবারা! যে মিলিয়ন ডলারের সম্পদ দেখছ, এগুলো তোমার বাবার সম্পদ না। এগুলো সকল মুসলমানের সম্পদ। আমি সব আল্লাহর পথে দিয়ে দিয়েছি। তোমাদের জন্য একটি রিয়ালও বরাদ্দ নেই।'

তারা অনেকসময় টাকা নিয়ে অভিযোগ করত। তারা নাকি যথেষ্ট খরচ পাচ্ছিল না। এজন্যই '৯০-এর দশকের মাঝামাঝি আবদুল্লাহ এবং ২০০০ সালে উমর তাকে ছেড়ে চলে যায়। তারা গাল্ফের বিলাসী জীবন উপভোগ করতে চাইত। শায়খ কখনোই তাদের কথা আমাদের সামনে বলতেন না। কিন্তু নিঃসন্দেহে বাবার কাছে সন্তানের বিরহ অনেক বেশি কষ্টদায়ক। বিশেষ করে তার বড় ছেলে আবদুল্লাহ চলে যাওয়ায় তিনি খুব কষ্ট পেয়েছিলেন।

একদিন সাদ এসে তার বাবাকে বলল যে সে বিয়ে করতে চায়। শায়খ জবাব দিলেন, 'আমি এ ব্যাপারে কী করতে পারি? তোমাকে যে জমি দিয়েছি তাতে কাজ করে বিয়ের জন্য সঞ্চয় করো।'

উম্মে আবদুল্লাহ খুব সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু তিনি শিক্ষিত ছিলেন না। তিনি উম্মে হামজাকে হিংসা করতেন। উম্মে হামজা ছিলেন ইসলামি বিভিন্ন শাস্ত্রের ওপর দক্ষ। শায়খ তাকে পছন্দও করতেন খুব।

শায়খ ওসামা প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ে উম্মে হামজার সাথে আলোচনা করতেন। উম্মে হামজা মক্কার অন্যতম ধনী পরিবার আল-হিন্দি থেকে এসেছেন। তিনি ছিলেন শায়খের চেয়ে আট বছরের বড়। তিনি শায়খের প্রথম স্ত্রীর মতো সুন্দরী না হলেও তাকে প্রত্যেকে সম্মান করত। তার একটাই সন্তান ছিল—হামজা। ফলে তিনি সবার

দেখাশোনা করতে পারতেন। তাকে বলা যায় জিহাদিদের মা। তিনি শায়খের সব ছেলেকে কুরআন শিখিয়েছিলেন। আমি আমার স্ত্রীকে তার কাছে পাঠাতাম ইমান ও তাওহীদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে। তিনি সবার বৈবাহিক সমস্যা সমাধান করতেন, ইসলামি আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। তিনি আমাদের সবার স্ত্রীদেরকে অন্তর থেকে স্নেহ করতেন।

বিন লাদেনের তৃতীয় স্ত্রী উম্মে খালিদও এসেছেন মক্কা থেকে। তিনি আরবি শেখাতেন, সবসময় ব্যস্ত থাকতেন। তিনি শায়খ ওসামার এক আত্মার ভাইয়ের আপন বোন।

বিন লাদেনের সব স্ত্রীই অস্ত্র চালাতে জানতেন। সুদানে তারা প্রত্যেকেই সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন। কান্দাহারে আসার এক মাস পর আমার স্ত্রীও কালাশনিকভ চালানো শিখে যায়!

আমার স্ত্রী যখন আমাদের প্রথম ছেলে হাবিবের জন্ম দেয়, বিন লাদেনের তিন স্ত্রীই তখন সারাটা সময় আমার স্ত্রীর পাশে ছিলেন। তারা তাইসিরকে মাতৃত্বের শিল্প ও সংজ্ঞা শিখিয়ে দেন। তার সাথে উম্মে হামজার সম্পর্ক ভীষণ ভালো হয়ে ওঠে। আমার স্ত্রী এখনও তাকে দয়াশীল ও আপন একজন মহিলা হিসেবে স্মরণ করে।

বিন লাদেন মনে করতেন যে, তিনি তার সব স্ত্রীকে সমান অধিকার দেন। তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর প্রতি সমানভাবে ইসলামের দায়িত্বগুলো পালন করেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি কোনো পিকনিকে গেলে তার তিন স্ত্রী ও সব সন্তানকে নিয়ে যেতেন।

উম্মে আবদুল্লাহর আচরণ বাদে শায়খ ওসামার বাকি স্ত্রীদের আচরণ ও তাদের মধ্যকার পরিবেশ ভালোই ছিল বলা যায়। তার আচরণ মাঝেমধ্যে অসন্তোষের জন্ম দিত। কিন্তু যখনই বিন লাদেনের ১৭ বছর বয়স্কা তরুণী স্ত্রী এল, তার কোনো স্ত্রীই এটাকে ভালোভাবে গ্রহণ করলেন না। উম্মে আবদুল্লাহ তো হিংস্র হয়ে গেলেন।

যেহেতু আমিই কনের পরিবারের কাছে মোহরানা নিয়ে গিয়েছিলাম তাই আমিই হয়ে পড়লাম বাকি স্ত্রীদের রাগের মূল লক্ষ্যবস্তু। আমার সহকর্মীরা ভাবল এ বিয়ের মূল হোতা আমি। আমার স্ত্রীর প্রতি উম্মে আবদুল্লাহর আচরণ অনেকটা অপমানের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল—

'আমরা তোমাদেরকে টাকা দিই, আমাদের জন্যই তোমরা সুন্দর জীবন কাটাও। আর তোমার স্বামীই কি না গিয়ে আমার স্বামীর জন্য নতুন স্ত্রী নিয়ে আসে! এভাবে কীভাবে চলতে পারে?'

আমি তাদের থেকে যে বৈরী-আচরণ লাভ করেছি সেটা আমার পরবর্তীকালে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে আসার অন্যতম কারণ হিসেবে দাঁড়ায়।

বিন লাদেনের বড় সন্তানেরা—সাদ, মুহাম্মদ এবং উসমানও এ বিয়েতে একেবারেই খুশী ছিল না। সাদ আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম, 'আমি কিছু জানি না। আমি শুধু তার পরিবারের কাছে মোহরানা নিয়ে গিয়েছিলাম।'

বিয়ে হওয়ার আগ পর্যন্ত বিন লাদেনের ছেলেরা এ বিয়ে সম্পর্কে কিছুই জানত না। আমি বুঝতে পারছিলাম কেন তারা এত রেগে গিয়েছিল। তাদের সৎ মা বয়সে তাদের চেয়ে ছোট। আরও সমস্যা হলো, বিন লাদেন তার স্ত্রী-সন্তানদেরকে বলেছিলেন যে কনে ৩০ বছর বয়স্কা একজন 'পরিণত' নারী, সে কুরআন খুব ভালোভাবে জানে ইত্যাদি। এক কথায় প্রাপ্তবয়স্কা। যে ইয়েমেনি ইমাম এ বিয়ের ব্যবস্থা করেন সে শায়খ ওসামাকে সত্য কথা জানাননি। তিনি শায়খ ওসামাকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিন লাদেনের চতুর্থ বিয়ে তার জন্য একটি বোঝা হয়ে দাঁড়ায়[১৬]।

তার সন্তানদের শিক্ষা

বিন লাদেন ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ওপর ডিগ্রিধারী। তিনি তার কিছু বাস্তবিক পড়ালেখা তার ছেলেমেয়েদের সাথে শেয়ার করতেন। মৌরিতানিয়ান কুরআন শিক্ষক শায়খ আবদুল লতিফই তাদের বেশিরভাগ শিক্ষা দিতেন। তিনি তাদের শেখাতেন কীভাবে কুরআন পড়তে ও শিখতে হয়। অন্যরা তাদের জিওগ্রাফি ও ব্যবসার মৌলিক বিষয়াবলি শিক্ষা দিতেন।

ক্যাম্পে দুটো ছেলেদের স্কুল ছিল। একটা চালাত ইয়েমেনিরা। সেখানে ইসলামি বিষয়াশয় সেখানো হতো। আরেকটা চালাত সৌদিরা। সেটাতে অন্য সবকিছু শেখানো হতো।

আমরা আমাদের তৃতীয় স্কুলে ভর্তি হই। এটা ছিল সামরিক স্কুল। এখানে আমাদের অস্ত্রচালনা শেখানো হতো। তাদের শিক্ষা শেষ হওয়ার পরে বিন লাদেন তাদের পাকিস্তানি আর্মির কাছে পাঠাতেন প্রশিক্ষণের জন্য। খুব কম লোকই জানে যে ইসলামাবাদ আর্মির সাথে আল-কায়েদার একটি চুক্তি ছিল—আল-কায়েদার

---

১৬. আমাল পরবর্তী সময়ে বিন লাদেনের প্রিয় স্ত্রী হয়ে ওঠেন এবং ২০১১ সালের ২রা মে অ্যাবোটাবাদে আমেরিকান SEAL-এর সৈন্যরা যখন বিন লাদেনকে গুলি করে হত্যা করে তখন তিনি বিন লাদেনকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিলেন।

সদস্যরা ছয় মাস থেকে এক বছর তাদের সাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। প্রায় চল্লিশজন গেরিলা প্রশিক্ষণ নেয় আর বাকি পাঁচজন নেয় কমান্ডো। তারা ফিরে আসার পর তাদের শেখা বিষয়গুলো আল-কায়েদার বিভিন্ন ক্যাম্পে শেখাতে শুরু করে।

পশ্চিমাদের কাছে আল-কায়েদা ও পাক আর্মির মধ্যকার সম্পর্ক অনেক বেশি ঘোলাটে একটি বিষয়। প্রশাসনিকভাবে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা Inter-Services Intelligence (ISI)-এর সাথে আল-কায়েদার সরাসরি কোনো সম্পর্ক ছিল না। তালেবানের গোয়েন্দা সংস্থার ক্ষেত্রে বিষয়টি ছিল ভিন্ন। কাশ্মীর নিয়ে পাক-ভারত সংঘাতের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের কাছে আফগানিস্তান ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর।

যদিও আমাদের ও আইএসআই-এর কোনো প্রশাসনিক সম্পর্ক ছিল না, তাও আমাদের কাছে তাদের পরামর্শ, নির্দেশনা আসত। কাশ্মীর বা পাকিস্তানে ভারতীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের প্রশিক্ষিত মুজাহিদদেরকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা ছিল পাকিস্তানের।

ইসলামাবাদ থেকে অনেক সময় আল-কায়েদার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ও তথ্য সরবরাহ করা হতো।

একবার আমেরিকা আফগানিস্তানের মাটিতে বিন লাদেনকে আক্রমণ করার চিন্তা করে। পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থা আক্রমণের তিন ঘন্টা আগে আমাদের আক্রমণ সম্পর্কে জানায়।

আল-কায়েদার যে সদস্যরা আফগানিস্তানে প্রবেশ করতে বা বের হতে চায় তাদের জন্যও ট্রানজিট অ্যারেঞ্জমেন্টে সাহায্য করত পাকিস্তান। আমি আগেই বলেছি, আমরা কীভাবে বিমানবন্দর এবং অন্যান্য স্থানে পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের একটি নেটওয়ার্ককে 'কিনে নিয়েছিলাম'। তাদের জন্যই পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে কোনোদিন কোনো লেনদেন বা আসা-যাওয়া নিয়ে আল-কায়েদার নেতাদের চিন্তিত হতে হয়নি।

আমার জানামতে আইএসআইয়ের প্রধানের সাথে আল-কায়েদার প্রধান ওসামা বিন লাদেন কখনো সাক্ষাৎ করেননি। তবে নিম্নতর পর্যায়ে আল-কায়েদা প্রতিনিধির মাধ্যমে আইএসআইকে বিভিন্ন বার্তা পাঠাতে পারত। এসব প্রতিনিধি অনেকসময়ই হতো তালেবান বা পাকিস্তানি ইসলামি আন্দোলন আল-আনসারের কোনো সদস্য।

১৯৯৯ সালে আইএসআই তালেবানকে রাজি করায় যে আল-কায়েদার ট্রেনিং ক্যাম্পগুলো যেন আইএসআইকে চালাতে দেওয়া হয়। এভাবে তালেবানের মাধ্যমে তারা জিহাদি আন্দোলনগুলোর ওপর আরও বেশি প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিল।

পাকিস্তানের কাছে ছিল নিউক্লিয়ার অস্ত্র। এতে অনেকেই সন্তুষ্ট ছিল না। বিষয়টা স্বাভাবিক। পাকিস্তানের অনেক শত্রু ছিল। তাই তাদের সমর্থকও দরকার। সেজন্যই তারা তালেবান ও আল-কায়েদাকে সাহায্য করত। তারা তাদের জনসাধারণের কথা ভালোভাবেই জানত। পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ১৭০ মিলিয়ন। এরা সবাই ছিল আল-কায়েদার আদর্শে বিশ্বাসী।

আমার মনে পড়ে, ১৯৯৮ সালে যখন পাকিস্তান প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষা চালায়, আল-কায়েদা পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট ও আইএসআই-এর প্রধানকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিল।

আল-কায়েদা ক্যাম্পের সব যুবকই ছিল শিক্ষিত। মেয়েদেরকে নিয়ে আমাদের একটু সমস্যা হতো। তালেবান মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার বিরুদ্ধে ছিল। আমাদের স্ত্রীরা তালেবানের নেতাদের কাছে গিয়ে বলে যে মেয়েদেরও বয়স হওয়ার সাথে সাথে শিক্ষা অর্জন করা জরুরি। তারপর মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ও উম্মে হামজাকে স্কুল চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ স্কুলেই আমার স্ত্রী প্রথম আরবি শেখানো শুরু করে।

অনেক মুজাহিদের স্ত্রীই ক্যাম্পে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। তারা অনুপ্রাণিত হন আয়মান আল-জাওয়াহিরির স্ত্রী থেকে, যিনি ছিলেন একজন উচ্চশিক্ষিতা নারী।[১৭]

বিন লাদেনের পরিবার যে তাকে ত্যাজ্য করেছে, এ কথা তিনি কখনো বলতেন না। তিনি মাঝেমধ্যে তার বাবার কথা বলতেন। তার বাবা মক্কার তিন বিখ্যাত মসজিদের স্থাপনার কাজ করেছেন। ষাটের দশকে জেরুজালেমেও একটা করেছেন। তিনি তার মাকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন, কিন্তু তার ব্যাপারে খুব কমই কথা বলতেন। ১৯৯৮ সালে সৌদি সরকার বিন লাদেনের মা ও তার সৎ ভাইকে কান্দাহারে পাঠায় যেন তারা বিন লাদেনকে জিহাদ ছেড়ে দিতে ও সৌদিতে ফেরত আসতে উৎসাহ দেয়।

বিন লাদেন জবাব দিলেন, 'অসম্ভব! আমি আপনাকে মা হিসেবে অনেক ভালোবাসি এবং সম্মান করি। কিন্তু আপনাকে আমি অনুসরণ করতে পারব না। আমি আল্লাহর কাছে ওয়াদা করেছি, আমি কখনো আল্লাহর পথ ছেড়ে দেব না। আমি

১৭. আল-জাওয়াহিরির প্রথম স্ত্রী আযযা আহমেদ নওয়ারি। তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। ৯/১১-এর প্রতিশোধে ২০০১ সালের ডিসেম্বরে আমেরিকার চালানো বোমা হামলায় তিনি শহিদ হন।

রাসূলুল্লাহর ﷺ সাহাবাদের অনুসরণ করি এবং তাদের মতোই বলছি, "আমার বেছে নেওয়া পথ থেকে আমি কখনোই সরে যাচ্ছি না।"

সৌদি সরকার আরেকবার গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান প্রিন্স তুর্কি আল-ফয়সালকেও পাঠায় বিন লাদেনের সাথে দেখা করতে। কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হন।

ষোড়শ অধ্যায় : এক মিশনে আমার সোমালিয়া গমন

২০০০ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিন লাদেন আমাকে তার অফিসে ডেকে বললেন যে আমার জন্য তার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ মিশন আছে। আমি বেশ উৎসুক ছিলাম। আমি ভাবলাম, তিনি হয়তো আমাকে পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে আমেরিকার বিরুদ্ধে সুইসাইড মিশনে পাঠাবেন। বরং তিনি আমাকে ৫,০০০ ডলার দিলেন এবং সানাআয় আবু আল-বাত্তার (আসল নাম আবু আল-ফিদা রাশাদ মুহাম্মদ সাঈদ) নামের একজনের কাছে তা পৌঁছে দিতে বললেন। এই টাকা ছিল শায়খের বিয়ের মোহরানা। এটি তিনি তার চতুর্থ স্ত্রীর পরিবারকে দিতে চেয়েছিলেন। এবং আমার মাধ্যমে তার চতুর্থ স্ত্রীকে ইয়েমেন থেকে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। বিন লাদেনের ইচ্ছে ছিল সৌদি আরব ও ইয়েমেনের মুজাহিদদের সমর্থন করা, সে ইচ্ছে অনুসারে আমি আল-কায়দার অভ্যন্তরে আরও বেশি দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিচ্ছিলাম।

তিনি প্রায়শই আমাকে বলতেন, 'আফগানিস্তানে আল-কায়েদা যদি খুব বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়, তবে ইয়েমেনে যাওয়ার পথ সবসময় খোলা।'

তিনি মনে করতেন, কখনো প্রয়োজন হলে তায়েজের নিকটে তার যুবতী স্ত্রীর গোত্র তাকে এক নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবে। ইয়েমেনে ইতোমধ্যে তার মিত্রতার যে নেটওয়ার্ক ছিল, এই বিবাহ তাকে আরও প্রসারিত করবে।

মিশনটি বেশ প্রস্তুত ছিল। ইয়েমেনে আবু আল-বাত্তার কনের পরিবারের সম্মতি নিয়েছিলেন। তিনি নববধূ ও তার বোন ও ভগ্নিপতির জন্য বিমানের টিকিট কিনেছিলেন, যারা কান্দাহারে বিন লাদেন পর্যন্ত যেতে কনের সঙ্গ দেবে।

আবু আল-বাত্তার ইব্বের মসজিদের একজন দাঈ (Preacher) ছিলেন। বিবাহের কয়েক মাস আগে তিনি আফগানিস্তানে আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি একজন সুপরিচিত আলেম ছিলেন। সানাআয় কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেফতার করে এবং ২০০২ সালে তাকে মুক্তি দেয়। তিনি এখন লাদেনের চতুর্থ স্ত্রী আমাল আল-সাদাহের সাথে কান্দাহারে ফিরে এসেছিলেন, যার বয়স তখন মাত্র ষোলো বছর। আমি শায়খকে বললাম যে কনে বয়সে তার চেয়ে অনেক ছোট। তিনি স্বীকার করলেন যে তিনিও কনের বয়স দেখে অবাক,

'যে ব্যক্তি আমাকে তার সম্পর্কে বলেছিল সে বলেছিল যে কনে প্রায় আটাশ বছর বয়সী। সুতরাং এটি আমার দোষ না। তবে এখন যেহেতু সে আমাদের সাথে

আছে, তাই আমি তাকে বিয়ে করতে বাধ্য। আমি তাকে ফেলে দিতে পারি না এবং তাকে ঘরে ফেরত পাঠাতে পারি না!'

অন্যান্য ইয়েমেনি মুজাহিদদের স্ত্রীদের কল্যাণে আমাল শীঘ্রই ক্যাম্পের কঠোর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এই বই লেখার সময় গুজব রটেছে যে সে ইয়েমেনে আছে। তবে আমি মনে করি সে এখনো লাদেনের সাথে আছে।[১৮]

বাস্তবে মোহরানা পৌঁছে দেওয়া আমার ইয়েমেনে যাওয়ার একটি অজুহাত ছিল মাত্র। আমার আসল মিশন ছিল সোমালিয়ায়। সেখানে একটি বন্দর এবং একটি বিমানবন্দর নির্মাণের সম্ভাবনা আমি খতিয়ে দেখছিলাম, যেখানে আল-কায়েদা এবং এর মুজাহিদরা প্রয়োজনে স্থানান্তরিত হতে পারবে। ১৯৯৮ সালে দূতাবাসে হামলার পর থেকে আল-কায়েদার নেতৃত্ব স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিল।

১৯৯৭ সাল থেকেই সোমালিয়া আমাদের জরুরী পরিকল্পনাগুলোর কেন্দ্রবিন্দু ছিল সোমালিয়ার দুই গোত্রনেতা (হাসিন হারসী এবং হাসিন তাহির ওয়াইস) তাদের ভূখণ্ডে আল-কায়েদার নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দিতে সম্মত হয়েছিল। হাসিন হারসী আমাদের সাথে দেখা করার জন্য কান্দাহার এসেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছেন, 'আপনারা সোমালিয়াকে দ্বিতীয় আফগানিস্তান হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন'।

এই পরিকল্পনায় দুয়েকটি বড় রাশিয়ান ট্রান্সপোর্টার বিমানে করে চারশো আল-কায়েদার যোদ্ধাকে স্থানান্তর করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমরা আফগানিস্তান ছাড়তে রাজি হলে তালেবানরা আমাদের তাদের বিমানগুলো ব্যবহার করতে দেবে। কিন্তু ১৯৯৮-এ দূতাবাসে হামলার পর যখন তালেবানের সাথে আমাদের সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয় তখন বিন লাদেন এই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছিলেন,

'কেবল চার শতাধিক সেনা নয়, আমাদের সমস্ত অস্ত্রসস্ত্র এবং অনুমোদিত মুজাহিদদেরকে সাথে নিয়ে আমাদের পুরো আল-কায়দাকে সোমালিয়ার স্থানান্তরিত করতে হবে। মহিলা ও শিশুরা আফগানিস্তানেই থাকবে।'

এই ধরনের অভিযানে প্রায় ১,২০০ লোক জড়িত থাকবে—আল-কায়েদার ২৫০ জন সদস্য এবং প্রায় এক হাজার আরব সমর্থক। এটা কোনো ছোটখাটো ব্যাপার ছিল না! তালেবানরা তাদের বেশ কয়েকটি রাশিয়ান বিমান আমাদের ব্যবহার করতে দিতে সম্মত হয়েছিল। বিন লাদেনের উদ্দেশ্য ছিল সোমালিয়ার দক্ষিণে কিসমায়োর

---

১৮. আমাল ৯/১১-এর পর কিছু সময়ের জন্য ইয়েমেনে ফিরে আসেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানে পুনরায় বিন লাদেনের সাথে একত্রিত হন।

নিকটবর্তী কাম্বৌনিতে আল-কায়েদার একটি সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করা। নতুন ইনস্টলেশনটির জন্য একটি ল্যান্ডিং স্ট্রিপ এবং একটি সংলগ্ন বন্দর প্রয়োজন ছিল। শায়খ আফগানিস্তান থেকে পশ্চিমের মনোযোগ বিভ্রান্ত করতে এবং তার পরিবর্তে সোমালিয়ায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমরা সেখানে যে যুদ্ধ পরিচালনা করব সেদিকে ফেরাতে চেয়েছিলেন।

আমি সানাআয় পৌঁছে চারজন ইয়েমেনিকে নিয়োগ দিলাম যারা মূলত সোমালিয়া থেকে এসেছিল এবং সেখানকার স্থানীয় ভাষায় কথা বলতে পারত। এরা আল-কায়েদার সদস্য ছিল না; আমি নিজে এই সেলটি তৈরি করেছিলাম। সেলটি তৈরি করতে আমি আল কায়েদার অন্যতম মূলনীতি প্রয়োগ করেছিলাম--সিদ্ধান্তকে কেন্দ্রীভূত করা এবং ক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ করা। যেহেতু আমি ইতোমধ্যে সোমালিয়ায় পরিচিত ছিলাম, তাই আমি নিরাপত্তাজনিত কারণে সেখানে যেতে চাইনি। চারজন ইয়েমেনির একজন আমার সাথে ছিল, বাকি তিনজন একমাস সোমালিয়ায় মাটিতে অবস্থান করেছিল। ফিরে এসে তারা তাদের মিশন সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেছিল।

কাম্বৌনির আশেপাশের সামুদ্রিক অঞ্চলের গোত্রপ্রধান হাসিন হারসীর সাথে আমি তাদের যোগাযোগ করিয়ে দিই। কাম্বৌনির অব্যবহৃত সামরিক বিমানবন্দর মেরামত ও সংস্কারের কাজে তার আমাদের সহায়তা করার কথা ছিল, যাতে করে তালেবানরা বিমানের মাধ্যমে আমাদের সেখানে পৌঁছে দিতে পারে। আমরা শীঘ্রই বুঝতে পারি যে, আমাদের এই পরিকল্পনাটি বাদ দিতে হবে; বিমানবন্দরের কাছাকাছি একটি গোপন সমুদ্রবন্দর গড়ার অতিরিক্ত ব্যয় বাদেই এর আনুমানিক ব্যয় ছিল ২.৫ মিলিয়ন ডলার।

হাসিন হারসীকেও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছিল না। আমার লোকেরা দেখেছে যে ১৯৯৩-১৯৯৪ সালে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরে আল-কায়েদা তার কাছে যেই অস্ত্রগুলো রেখে গিয়েছিল সেগুলো তিনি পুনরায় বিক্রি করেছিলেন--তিনি ভবিষ্যতের লড়াইয়ের জন্য অস্ত্রাগারে অস্ত্রগুলো সংরক্ষণ করার চেয়ে বরং সেই অস্ত্র বিক্রি করা টাকা দিয়ে নিজের পকেট ভর্তি করা পছন্দ করেছিলেন। আমি আল-কায়েদার ভবিষ্যতের ব্যাপারে তাকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

এছাড়াও, সোমালিয়ায় আমেরিকান গোয়েন্দা গিজগিজ করছিল এবং উপকূলে জলদস্যুরা বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছিল। আল-কায়েদা তার সমস্ত সদস্যকে

সেখানে স্থানান্তর করতে পারেনি। আমার লোকেরা সোমালিয়া থেকে ফিরে আসলে আমি বিন লাদেনের কাছে আমাদের মিশনের হতে প্রাপ্ত উপসংহার পৌঁছে দিই।

আমি মিশনে যাওয়ার আগে শায়খ আমাকে আল-কায়েদার সম্ভাব্য বিকল্প আশ্রয় হিসাবে ইয়েমেনকে তদন্ত করতে বলেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, আমি যতগুলো সম্ভব গোত্রের বিশ্বাস ও সমর্থন অর্জন করি।

এটি ছিল আমার পূর্ববর্তী সোকোত্রা সফরের এক বছর পর। এবার আমি সেখানে আমেরিকার একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের পরিকল্পনার কথা শুনলাম। এডেনের উপসাগর জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমেরিকার বিভিন্ন বাহিনীকে সেখানে একত্রিত করার কথা। আমি সোকোত্রা দ্বীপে গিয়ে সেখানে এক সপ্তাহ কাটালাম। ইয়েমেনি সরকার যে বেসামরিক বিমানবন্দরটি তৈরি করেছিল, আমি তা দেখতে গেলাম। সেটা আমেরিকান বিমান ধারণ করতে সক্ষম হবে। আমি ল্যান্ডিং স্ট্রিপটি মেপে বুঝতে পারলাম যে এটি সানাআরটির চেয়ে অনেক বড়। একটি সমুদ্রবন্দরও নির্মিত হচ্ছিল। এটাকে এডেনেরটার চেয়েও অনেক বড় বলে মনে হচ্ছিল। আমি এই উপসংহারে পৌঁছলাম যে, সোকোত্রায় আসলেই একটি প্রকল্প চলছে। আমি এই তথ্যটি আফগানিস্তানে আল-কায়েদার নেতৃত্বের কাছে প্রেরণ করি। তারপর এমন কয়েকটি গোত্রের নেতাদের সাথে দেখা করতে যাই, যেখানে আমাদের প্রভাব আমরা যতটা প্রত্যাশা করেছিলাম, তার চেয়ে কম ছিল, বিশেষত শাবওয়া।

আমি এমন আটজন নেতার কাছে যাই এবং আমরা তাদের আমাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প সম্পর্কে ডক্যুমেন্টারি ফিল্ম এবং আমেরিকানদের বিরুদ্ধে ওসামা বিন লাদেনের দেওয়া ভাষণের ভিডিওগুলো দেখাই। ইয়েমেনকে অস্থিতিশীল করার বা ইয়েমেনকে বিভক্ত করার আমেরিকান পরিকল্পনা এবং আরব উপদ্বীপে বিদেশি সেনাদের উপস্থিতি সম্পর্কে আমরা তাদের বললাম। তাদের আল-কায়েদার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য আমরা এই বিষয়টির ওপর জোর দিয়েছিলাম যে, তারা যদি আল-কায়েদায় যোগ না দেয়, তবে তারা গোত্রপ্রধান হিসাবে তাদের মর্যাদা এবং সুবিধা হারাবে। তাদের সহায়তার বিনিময়ে তাদের অর্থের প্রতিশ্রুতি না দিয়ে আমরা এক দশকেরও বেশি সময় আগে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে জিহাদের সময় তাদের মতো কিছু গোত্রের লোকেরা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমরা তাদের প্রশংসা করলাম।

এডেনে আমরা শায়খদের ও ইমামদেরকে বললাম মসজিদে বক্তৃতা দেওয়ার সময় তারা যেন আমাদের সমর্থন করে। স্থানীয় আল-কায়েদার সেলগুলোতে যেসব

উপকরণের অভাব রয়েছে—যেমন ভিডিও—সেগুলো যেন তারা পায় বা সেগুলো কেনার জন্য যেন অর্থ পায় সে বিষয়টি আমরা নিশ্চিত করলাম।

বিন লাদেনের সাথে বিচ্ছেদ

আমার লোকেরা সোমালিয়া থেকে ফিরে আসার পর আমি আল-কায়েদার নেতৃত্বকে অসংখ্য বার্তা পাঠাই, কিন্তু কোনো উত্তর পাই না। এই এনকোডেড চিঠিগুলো আমার ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচিত বাহকের দ্বারা করাচিতে আমাদের আমির আবু হাফস আল-সিন্দির কাছে পৌঁছে দেওয়া হতো। আমি তাকে বেশ কয়েকটি ফ্যাক্স পাঠাই যাতে আমি সোমালিয় প্রকল্প সম্পর্কে আমার উপসংহার সংক্ষেপ ব্যক্ত করি। এরপরও কোনো উত্তর নেই। শেষমেশ আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায় এবং আমার শেষ বার্তায় আমি স্পষ্ট করে বলি—'আপনি যদি পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে আমাকে কোনো উত্তর না দেন, তবে আমি ৩১তম দিনে আফগানিস্তানে ফিরে আসছি'।

কান্দাহারে বিন লাদেনকে ঘিরে কী চলছিল? কোনোরকম যোগাযোগ না থাকায় আমি আমার এক ইয়েমেনি বন্ধু এবং তার স্ত্রীর সাথে ফিরে যাই।

আমরা যখন করাচি পৌঁছলাম, আল-কায়েদার দুই সদস্য আমাদের স্বাগত জানালেন; ওয়ালিদ বিন আত্তাশ ও আবদুল্লাহ আল হালাবি, যিনি বিন লাদেনের এক কন্যার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

'আপনি কেন ফিরে এসেছেন?'

'কারণ আমি আমার চিঠির কোনো জবাব পাইনি!'

'আমরা কেবলই এটি পাঠাতে যাচ্ছিলাম!'

'আপনারা একত্রিশ দিন পরে আমার চিঠির জবাব দিতে যাচ্ছেন? একটু দেরি হয়ে গেল না?'

বিন আত্তাশ ও আল-হালাবীর কাছে আমার চিঠির জবাব ছিল, তবে সেটি বিন লাদেনের পক্ষ থেকে আসেনি, বরং সাইফ আল-আদেলের কাছ থেকে এসেছিল। আমি খুব রেগে গেলাম যে, আল-কায়েদার প্রধান আমাকে উত্তর দেয়নি। সর্বোপরি তিনিই আমাকে সোমালিয়ায় পাঠিয়েছিলেন, তাই অবশ্যই তারই উচিত ছিল আমার উত্তর দেওয়া। আর যখন আমি আমাকে উদ্দেশ্য করে পাঠানো সংক্ষিপ্ত বার্তাটি পড়লাম তখন আমার ক্রোধ আরও বেড়ে গেল; সেটায় লেখা ছিল, 'নিজেই সমস্যার সমাধান করে নিন, আপনার কার্যক্রম সন্তোষজনক ছিল না।'

আমি তৎক্ষণাৎ কান্দাহারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ক্যাম্পে আমি বিন লাদেনকে দেখতে গেলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম যে ক্যাম্পের পরিবেশ আগের মতো নেই। তিনি আমার দিকে তাকালেন, আমি তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। আমি পরের তিন সপ্তাহ কাটালাম বিন লাদেনের সাথে কোনোরকম কথা বলতে অক্ষম হয়ে। তবু আমালের সাথে তার বিয়েতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তবে আমি তাতে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাই। অবশেষে আমি বিন লাদেনের বিয়ের দিন শেষে তার সাথে পাঁচ মিনিটের জন্য কথা বলার সুযোগ পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

'বিয়েতে কেন আসোনি? আমাদের মধ্যকার কোনো সমস্যা বাবা এবং ছেলের মধ্যকার সমস্যার মতো।'

নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করার মতো সময় ছিল না আমাদের। পরের দিন বিকেলে শায়খ আমার কাছে আসলেন,

'তোমাকে ইয়েমেনে একটি গোপন মিশনে প্রেরণ করা হয়েছিল তবে তুমি তাতে সফল হওনি। তুমি অপারেশনটি প্রকাশ করে ফেলেছ, তুমি তোমার কাজে ব্যর্থ হয়েছ।'

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না আপনি এভাবে আমার সমালোচনা করছেন,' আমি অশ্রুসিক্ত হয়ে বললাম।

আমি নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু শায়খ ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। তিন বছরে এই প্রথমবার তিনি আমার যুক্তি শুনতে চাননি। গভীরভাবে হতাশ হয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আগামী আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে আমি আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

পরের দিন আমি ইউসুফ আল-দোসারিকে আমার ছেলে হাবিবের জন্য পাকিস্তানের ইয়েমেনি দূতাবাস থেকে জন্মসনদের ব্যবস্থা করতে বললাম। ইউসুফ আল-দোসারি আল-কায়েদার সদস্যদের জন্য ডকুমেন্টেশন গঠনের দায়িত্বে ছিলেন। হাবিব কয়েক মাস আগে কান্দাহারে জন্মগ্রহণ করে, তখন আমি সানাআয় ছিলাম। আমি তার জন্ম পাকিস্তানে নিবন্ধিত করতে চেয়েছিলাম। কারণ, পাকিস্তান আমার কার্যক্রমের ক্ষেত্রে একটি নিরপেক্ষ দেশ ছিল।

আমি হাসান আল-বাহলুল ও আবু খোলুদের সাথেও দেখা করি এবং ক্ষিপ্ত হয়ে ঘোষণা দিই যে যথেষ্ট হয়েছে, এবং আমি ইয়েমেনে ফিরে যাচ্ছি। এই দুজন তৎক্ষণাৎ ওসামাকে গিয়ে জানায় যে, 'একজন উল্লেখযোগ্য মুজাহিদ' আফগানিস্তান

ছেড়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। বিন লাদেনও সাথে সাথেই অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, সেই মুজাহিদ আমিই ছিলাম এবং আমাকে থাকার জন্য রাজি করাতে আবু হাফসকে প্রেরণ করেন।

'ওসামাকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন এবং তাকে বলবেন যে আমি তার বিশ্বস্ত অনুসারী হয়ে আছি। আমি ইয়েমেনে থাকছি এবং যদি আমাকে তার কখনও প্রয়োজন হয়, তবে আমাকে কেবল জানালেই হবে।'

'আমরা আগামীকাল বিকেলে এর মীমাংসা করব!'

'তা আপনাদের যেমন ইচ্ছা, তবে আমি ভোরেই কান্দাহার ছেড়ে যাচ্ছি।'

আমি আমার কথা রেখেছি—পরের দিন আমি সেখান থেকে চলে গেলাম এবং সবাই অবাক হলো। পাকিস্তান ছাড়ার আগে ওসামা আমাকে বাধা দেওয়ার জন্য দুজন লোক পাঠিয়েছিলেন।

করাচী পৌঁছে আমি উসমান আল-পাকিস্তানিকে ইয়েমেনের তিনটি টিকিট সরবরাহ করতে বললাম আমি, আমার স্ত্রী (ও হাবিব) এবং একজন ইয়েমেনি ভাইয়ের জন্য। আল-কায়েদায় উসমান আল-পাকিস্তানির ভূমিকা ছিল এর সদস্যদের ভ্রমণের ব্যবস্থা করা। তিনি আমার অধীনস্থ ছিলেন। আমি যখন তার সাথে দেখা করতে গেলাম, তিনি চাচ্ছিলেন না যে আমি চলে যাই, তবে আমি তাকে বললাম,

'ভুলে যাবেন না যে আপনি আমার অধীনস্থ; আমি যা বলছি তাই করুন।'

তিনি আমার অনুরোধ মেনে চললেন এবং আমাকে ফ্লাইটের একটি তালিকা দিলেন; আমি পরের দিনই চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। করাচী থেকে বিমানটি সকাল ছয়টায় ছেড়েছিল, মানামায় একটি যাত্রাবিরতি দিয়েছিল। আমরা শেষ রাতটা করাচীর অ্যাম্বাসেডর হোটেলে কাটালাম। কথায় কথায় আমার স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞেস করল,

'তোমাকে এত দুঃখী দেখাচ্ছে কেন?'

'তোমার সে সম্পর্কে জানার দরকার নেই!'

আমি তাকে কিছু বলতে চাইনি। তবে আমি কাঁদতে শুরু করায় আমার স্ত্রী জানার জন্য জোরাজুরি শুরু করল।

'আমি দুঃখী কারণ আমি বিন লাদেনকে ও জিহাদ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

আমার জীবনের একটি নতুন অধ্যায় শুরু হতে যাচ্ছিল। কিন্তু তা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আমি সত্যিই হতাশ হয়ে পড়লাম এবং নিজেকে প্রশ্ন করলাম, আমি কি কোনো ভুল করছি, আমি কি পাপ করতে চলেছি? যা ঘটেছে তা শুরু থেকে

আমি বারবার ভেবেছি এবং প্রতিবার একই উপসংহারে পৌঁছেছি—না, ইয়েমেনে আমার মিশনে আমি কোনো ভুল করিনি। আমার বার্তাগুলো এনকোড করা ছিল। আমার বার্তাবাহকদের সতর্কতার সাথে নির্বাচন করা হয়েছিল। সর্বোপরি, আমি এই বার্তাগুলোতে বিন লাদেনকে সম্বোধনও করিনি। তাহলে তিনি কীভাবে আমাকে অভিযুক্ত করতে পারেন? আর কেনই বা তিনি আমাকে তার অভিযোগের জবাব দেওয়ার অনুমতি দিলেন না? আমাকে যে বিষয়টি আরও ক্ষুব্ধ করেছিল তা হলো, তিনি আমার বার্তাগুলো পড়েও দেখেননি। আমি যা করেছি, তা সম্পর্কে অন্যান্য লোকেরা কী বলেছিল, তিনি কেবল তা শুনেছেন এবং আমার হয়ে তাদের কথা বলতে দিয়েছেন। এটা একেবারেই মনে নেওয়া যায় না। তার কাছ থেকে আমি এর কোনো সঠিক ব্যাখ্যা পাইনি।

যাই হোক, আমি আমার সাধ্যমতো কাজ করেছি। যাওয়ার আগে আমি কান্দাহারে কিছু বিল্ডিং সাইটে রাজমিস্ত্রি হিসাবে কাজ করে বেশ কয়েক দিন কাটিয়েছি। আল-কায়েদাকে সোমালিয়ায় প্রতিস্থাপনের সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করে আমি অবশ্য তাদের বিশাল সমস্যা থেকে বাঁচিয়েছি।

যা ঘটেছে তা নিয়ে আমি আমি আবু হাফসের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি যখন তার সাথে দেখা করতে গেলাম, তখন তিনি একটি বই পড়ছিলেন এবং আমি কী বলছিলাম সেদিকে কোনো মনোযোগই দেননি।

শেষ চেষ্টা হিসেবে আমি সাইফ আল-আদেলের সাথে দেখা করতে যাই। খোলামেলা আলোচনা হলেও তিনি একজন বিচারকের মতো আচরণ করেছিলেন। তিনি আক্রমণাত্মকভাবে কথা বলেছিলেন,

'আপনি এই মিশনে তেমন কিছু করেননি।'

'মিশনটা তো আপনি আমাকে দেননি, শায়খ ওসামা দিয়েছিলেন!'

আমাদের আলোচনা প্রায় এক ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল। তবে তার সমস্ত প্রশ্নই ছিল মূলত তিরস্কার।

দেখা গেল যে, বিন লাদেনকে আমি যে সমস্ত বার্তা পাঠিয়েছিলাম তা সাইফ আল-আদেল রেখে দিয়েছিলেন। তারপর মিশরীয়রা কটাক্ষ করে মন্তব্য করা শুরু করল যে, তার (ওসামার) ইয়েমেনি বন্ধুরা যা ইচ্ছে তা করছে এবং তারা বিশ্বাসযোগ্য না।

আল-কায়েদা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, বরং সাইফ আল-আদেল ও ওসামার আশপাশের মিশরীয়রা ছিল বিশ্বাসঘাতক। অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করে

আমি আর অবাক হই না। আমার মনে আছে একবার আমরা আরব উপদ্বীপ থেকে আসা জিহাদিদের ব্যাপারে কথা বলছিলাম তখন তাদের একজন আমাকে বলেছিল,

'আমরা পনেরো বছর ধরে লাদেনের সাথে আছি আর তোমরা কি মনে করো তোমরা সহজেই তাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেবে?'

তারপরে আমার ভায়রা ভাই সালিম খামদানির দিকে ফিরে সে আরও বলেছিল, 'তোমরা ইয়েমেনিদের কোনো সত্যিকারের সংহতি নেই!'

বিন লাদেনের সাথে আমার বিচ্ছেদ আল-কায়েদার মধ্যকার এক ধ্রুবক সমস্যার লক্ষণ ছিল—মিশরীয়রা কখনোই মেনে নেয়নি যে অন্যরা শায়খের নিকটবর্তী হবে

তবুও একদিন যখন কান্দাহারে গুলি চালানো হয়েছিল, তখন বিন লাদেনকে বাঁচাতে ইয়েমেনিরা ছাড়া আর কেউ আসেনি। মিশরীয় জিহাদিদের মধ্যে কেবল সাইফ আল-আদেল এবং আবু হাফস আল-মাসরি হস্তক্ষেপ করতে ভয় পাননি। বিন লাদেন মিশরীয়দের কাছে এই ঘটনার ব্যাখ্যা স্পষ্ট করে তুলেছিলেন,

'দেখো! আমাকে বাঁচাতে যারা এসেছিল তারা হলো আবু জান্দাল, সালিম খামদানি, আল-তায়েজি...সকলে ইয়েমেনি! আর তোমরা—তোমরা তো কেবল বাড়িতে বসে ছিলে!'

তবুও আমার ক্ষেত্রে বিন লাদেন তার নিকটতম সহযোগী সাইফ আল-আদেল ও আবু হাফস আল-মাসরির পক্ষ নিলেন।

আমার চলে যাওয়ার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন এবং আমাকে আফগানিস্তানে ফিরে যেতে অনুরোধ করার জন্য সালিম খামাদানিকে ইয়েমেনে পাঠালেন। আমার ভায়রা ভাই আমাকে জোর করলেন, 'ওসামা আপনাকে ফিরে যেতে বলেছেন। ফিরে আসুন আফগানিস্তানে, আপনি এখানে কেন রয়েছেন?'

কিন্তু আমার সাথে যেভাবে আচরণ করা হয়েছিল তাতে তখনও আমি ক্ষুব্ধ ছিলাম, 'ওসামা কেন আমার সাথে এমন করলেন? কোনো চোরও তো তার কাছ থেকে এ জাতীয় প্রতিক্রিয়া পেত না!'

আমি বিন লাদেনের ব্যাখ্যার সন্ধানে আরও একবার আফগানিস্তানে ফিরে গিয়েছিলাম। তবে কিছুই আর আগের মতো ছিল না। আমি সেখানে কেবল একমাস থেকে একেবারের জন্য ছেড়ে চলে আসি। সবকিছু এত দ্রুত ঘটেছিল যে, বেশিরভাগ আল-কায়েদা সদস্যদের ধারণাই ছিল না আমি কেন কান্দাহার এবং

সংগঠন ছেড়ে চলে এসেছি। অতীতের কথা ভেবে, আমি মনে করি আমি বেশ ভাগ্যবান। আমি যদি বিন লাদেনের সাথে থাকতাম তবে আমাকে হয়তো মেরে ফেলা হতো বা সালিম খামদানির মতো বছরের পর বছর গুয়ান্তানামোতে আটকে রাখা হতো।[১৯]

---

১৯. ২০০১-এর শেষের দিকে পাকিস্তানে সালিম খামদানি গ্রেফতার হন। তাকে গুয়ান্তানামোতে বন্দি করা হয়েছিল। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে মুক্তিপণের দরুন তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি এখন সানাআয় থাকেন।

সপ্তদশ অধ্যায় : কারাগার এবং অপরাধবোধ

বাহরাইনের মানামায় যাত্রাবিরতির সময় আমি আমার স্ত্রীর পরিবারকে ফোন করে বলি যে আমরা তাদের দেখতে আসছি। কিন্তু এরচেয়ে বেশি আর কিছুই বলিনি। স্পষ্টতই তারা আবার আমাদের দেখে খুশি হয়েছিল। এর পরপরই আমি কিছু জিহাদি বন্ধুদের সাথে দেখা করতে গেলাম। তাদের একজন আবদুল রহমান আল-শামি সবেমাত্র এক আত্মীয়ের বিবাহে অংশগ্রহণ করার জন্য আফগানিস্তান থেকে এসেছিল।

'আমি তোমাকে কয়েকদিন আগেও কান্দাহারে দেখলাম! তুমি এখানে কি করছ?'

'আমি আর আফগানিস্তানে ফিরে যাচ্ছি না। আমি এখানে থেকে চাকরী খোঁজার চেষ্টা করব। আমাকে আমার পরিবারের ভরণপোষণ করতে হবে। আমি জিহাদ ছেড়ে দিচ্ছি।'

আমি ইয়েমেনে আছি শুনে অন্যান্য যোদ্ধারা আমাকে দেখতে এল এবং কেন হঠাৎ ইয়েমেনে ফিরে এসেছি তা জানার চেষ্টা করেছিল। শায়খের সাথে আমার বিবাদ সম্পর্কে তাদের বলার পর কিছুসংখ্যক যোদ্ধা বলল যে, তারাও আর আল-কায়েদার কাছে ফিরে যেতে চায় না।

আমি জানতাম না যে একটি আমেরিকান যুদ্ধজাহাজের ওপর নতুন এক আক্রমণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

আমি ফিরে আসার দুসপ্তাহ পরে সালিম খামদানি আবার আমাকে দেখতে এলেন। আমাকে ফিরে যেতে প্ররোচিত করার জন্য বিন লাদেন তাকে পাঠিয়েছিলেন। তবে আমি আমার সিদ্ধান্তে অটুট ছিলাম। আর আমার প্রতি বিন লাদেনের আচরণের বিবরণ শোনার পর তিনিই থেকে যেতে চাইলেন।

বেশ কয়েক মাস পর এক বন্ধু আমাকে জানাল বিন লাদেন পুরো বিষয়টি সম্পর্কে কী বলেছিলেন, 'আল্লাহ আবু জান্দালকে ক্ষমা করে দিবেন।'

এই বন্ধু—আবদুর রহমান আল-শামি—এ কথা শুনে নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে বলল, 'কিন্তু তার সাথে যা ঘটেছে তা তো আপনার দোষ!'

বিন লাদেনের আশপাশের মিশরীয়রা আল-শামিকে শান্ত করার চেষ্টা করল কিন্তু সে বলে চলল, 'আপনি ভাল করেই জানেন যে আবু জন্দাল একজন সৎ মানুষ। সে জানে সে কী করছে। আপনার তাকে বিশ্বাস করা উচিত ছিল।'

কী উত্তর দিবেন ভেবে না পেয়ে বিন লাদেন চুপ করে রইলেন।

সুতরাং...আমি সানাআয় বাড়ি স্থাপনের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। আমি আমার শ্বশুরবাড়ির পাশেই একটা ছোট অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে পেলাম এবং এক বন্ধুর সাথে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমার কাছে সবকিছুই একেবারে পরিষ্কার ছিল—আমি জিহাদ ছেড়ে দিয়েছি। এখন থেকে আমি যুবকদেরকে জিহাদের সাথে জড়িত হতে নিরুৎসাহিত করছি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, জিহাদ কেবল ইসলামের পক্ষে লড়াই করা বা মুসলিমদেরকে রক্ষার বিষয় না। এটি আমাদের ধর্মের প্রথম স্তম্ভও না। আরও অন্যান্য অগ্রাধিকার আছে।

আমি আল-কায়েদার সাথে আমার সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করলাম। কিন্তু কিছুদিন পর এক সৌদি যোদ্ধা ফাওয়াজ আল-মাক্কি আমাকে সতর্ক করতে এলেন,

'সাবধানে থাকবেন। ইয়েমেনে মারাত্মক আক্রমণ হতে চলেছে'।

২০০০ সালের ১২ অক্টোবর ইউএসএস কোলে হামলা হয়।

আমি সেদিন রোজা রেখেছিলাম। সন্ধ্যা সাতটার দিকে আমি সানাআ বইমেলা থেকে ফিরছিলাম, তখন সালিম খামদানি আমাকে খবরটি জানালেন। তিনি দেড় মাস আগে আফগানিস্তান থেকে এসেছিলেন। তাই তারও ধারণা ছিল না যে এই হামলা ঘটবে। আমি সঙ্গে সঙ্গেই তাকে জিজ্ঞেস করলাম,

'বিস্ফোরণ কি জাহাজের বাইরে হয়েছে, না ভিতরে?'

আমি বুঝতে পারলাম যে, বিস্ফোরণ যদি বাইরে হয়ে থাকে তাহলে এটি আক্রমণ ছিল; যদি ভেতরে হয়, তাহলে এটি একটি দুর্ঘটনা। তিনি কিছুই বলেননি। কিন্তু আমি যখন টেলিভিশন দেখলাম তখন নিশ্চিত হলাম যে, এটি একটি আক্রমণ ছিল। আমি অবাক হয়েছিলাম, কারণ বিন লাদেন সর্বদা বলতেন যে, আমাদের ইয়েমেনের অভ্যন্তরে কোনো আক্রমণ চালানো উচিত নয়, কারণ, ইয়েমেন আল-কায়েদার জন্য একটি সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্র এবং আশ্রয়স্থল।

দেখা গেল যে, আক্রমণটি পরিচালনা করেছিলেন আবদুর রহিম আল-নাশিরি। তাজিকিস্তানে যাত্রার সময় তিনি আমাদের সাথে ছিলেন। পরে তিনি আল-কায়েদার সামরিক কমিটির সদস্য হন। ২০০২ সালের নভেম্বর মাসে তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতে গ্রেফতার হন। পরে আমেরিকার কাছে হস্তান্তর করা হলে সেখানে তাকে কারাবন্দি করা হয়। তিনি এই হামলার এক মাস আগে ইয়েমেনের উপকূলে অবস্থিত ফ্রান্সের তেলের ট্যাংকার লিমবার্গ-এও হামলা চালিয়েছিলেন।

ইউএসএস কোল অপারেশনের দুই দিন পর আমি স্থির করলাম যে আমার স্ত্রী ও ছেলে হাবিবকে নিয়ে সানাআ ছেড়ে চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আল-শামিও আমাদের সাথে এসেছিল এবং আমরা মুকাল্লায় আমার শ্বশুরবাড়ি গেলাম আমরা সেখানে গিয়ে চলমান ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করলাম।

এক সপ্তাহ পরে আমি সানাআয় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সেখানে গিয়ে আমি এক আল-কায়েদার বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করলাম। তিনি আমাকে বললেন যে পুলিশ আমার খোঁজ করছে। আমি শাবওয়ায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সেখানে কেউই জানত না আমি কে এবং সেখানকার গোত্রগুলো নিরাপত্তা বাহিনীর চেয়ে শক্তিশালী। সেখানে আমি গোত্রপ্রধান শায়খ মানসুর বিন সাইয়েদের সুরক্ষায় থাকছি।

আমি ভাবতে লাগলাম, আসলে ঘটেছিল কী—আল-কায়েদা কী নিজের কৌশল বদলেছিল? সংগঠনটি যেসব দেশকে দরকারী বলে বিবেচনা করত সেই দেশগুলোকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকত—পাকিস্তান, ইরান, সিরিয়া, কাতার ও ইয়েমেন। আমি নিজে বিন লাদেনকে এই দেশগুলোর ব্যাপারে বলতে শুনেছি। ইয়েমেন সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

'ইয়েমেন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সমর্থক; এটি আমাদের নিরাপত্তা দেয় এবং আমাদের সৈন্যদের বিনামূল্যে প্রবেশের অনুমতি দেয়'।

সিরিয়াও এমন একটি দেশ হিসেবে বিবেচিত হতো, যেখানে জিহাদিরা নির্বিঘ্নে ভ্রমণ করতে পারত। তারা সেখান থেকে ইরাক এবং ইরান হয়ে পরে আফগানিস্তান পৌঁছাতে পারত। কাতারও কম-বেশি একই সুবিধা প্রদান করত—যেমন, সেখানকার এফবিআই অফিস দুবাইয়ের মতো সক্রিয় ছিল না। আর ইরান মুবারক সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মিশরীয় ইসলামপন্থীদের সমর্থন করছিল। মুজাহিদরা সরাসরি ইরান হয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করতে পারতেন, পাকিস্তান দিয়ে যেতে হতো না।

ইউএসএস কোলে আক্রমণের পর খুব শীঘ্রই আমরা জানতে পারলাম যে অপারেশনের সময় একজন জিহাদি কৌশলগত ভুল করেছিলেন, বিন লাদেন ইয়েমেন উপকূলে আন্তর্জাতিক জলপথে আমেরিকান পেট্রোল ট্যাঙ্কারটিকে টার্গেট করতে চেয়েছিলেন। অপারেশনের দায়িত্বে থাকা আবদুর রহিম আল-নাশিরি এবং হামলাকারীরা নিজেরাই হয়তো এডেন বন্দরের অভ্যন্তরে হামলা চালানোর জন্য শেষ মুহূর্তে পরিকল্পনা পরিবর্তন করেছিল।

আমি আল-শামি ও আমার পরিবারের সাথে শাবওয়ায় চার মাস অবস্থান করি।

স্থানীয় এক পুলিশ আমার পরিচয় জানত তবে আমার সম্পর্কে আর কোনো তথ্য তার কাছে ছিল না। আমি এর আগ পর্যন্ত কী করছিলাম, সে সম্পর্কে তার ধারণাই ছিল না। কিন্তু তারা তখন আমাকে চিনত এমন তিনজনকে (জামাল আল-বাদাবি, ফাআদ আল-কুসো ও মুহাম্মদ তারবিয়ি) গ্রেফতার করে এবং আমার একটি পরিচয়চিত্র গঠন করতে সক্ষম হয়। আর সেটাকে আমার মতোই লাগছিল!

আমার হাতে কোনো কাজ ছিল না, পুলিশ আমার পেছনে পড়ে ছিল...এমতাবস্থায় আমি আফগানিস্তানে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার যেতে ইচ্ছে করছিল বা কোনো প্রকার দৃঢ় বিশ্বাসের কারণে আমি সেখানে যেতে চাইনি। বরং আমার কাছে কোনো বিকল্প ছিল না, তাই সেখানে যেতে চেয়েছিলাম। আমি আল-শামিকে আমার আগে যেতে রাজি করলাম, সে আমার চেয়ে কম পরিচিত ছিল। সে সিরিয়া ও ইরান হয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করতে পেরেছিল। আমি পরিবার ছাড়াই মুকাল্লায় (রিয়ান বিমানবন্দর) রওনা হই। তবে সেদিন আবুধাবির উদ্দেশ্যে কোনো ফ্লাইট ছিল না। তাই আমি সানাআ হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সানাআয় বিমান থেকে নামার সময়ই আমাকে গ্রেফতার করা হয়ে। সময়টা ছিল ফেব্রুয়ারী ২০০১।

কারাগারে

এখন আমি ইয়েমেনের প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা, Political Security Organization (PSO)-এর হাতে। আমাকে তারা তাদের আন্ডারগ্রাউন্ড কারাগারে রেখেছিল। শীঘ্রই এক প্রহরী আমাকে চোখে পট্টি বেঁধে ইন্টেরিয়র সিকিউরিটির প্রধান মুহাম্মদ রিজিক আল-সোরমির কাছে নিয়ে গেল।

'নাম কী? আপনার ছদ্মনাম কী?'

'আবু জান্দাল।'

'আপনি কোথায় যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন?'

'আফগানিস্তান।'

'কেন?'

'কারণ আমার পেছনে পুলিশ লেগে থাকার দরুন আমি অতিষ্ট!'

'আপনার সাথে কে ছিল? আপনি কার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন?'

তারা আমার চোখের পট্টি খুলে ফেলল। জেনারেল আমাকে বললেন আমার সেলে ফিরে গিয়ে আমার জীবনী লিখতে। আমি আমার শৈশব নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে

লিখলাম, তবে আফগানে আমার কাটানো সময়কে অর্ধেক পৃষ্ঠায় লিখে শেষ করে দিলাম।

পরের দিন রাতে আমাকে আবার জেনারেল আল-সোরমীর অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি বুঝতে পারলাম যে ইয়েমেনিরা আসলে আমার সম্পর্কে তেমন একটা জানত না। লাদেনের দেহরক্ষী এবং কাবুলে আল-কায়েদার গেস্ট হাউজের পরিচালক হিসেবে আমার অতীত সম্পর্কে তারা কিছুই জানত না। আমি আতঙ্কিত হইনি। জিজ্ঞাসাবাদের সময় কীভাবে আচরণ করতে হয়, সে সম্পর্কে আমি জিহাদিদের জন্য কোর্স পরিচালনা করেছিলাম এবং সেই কোর্সের নির্দেশনা আমার মনে ছিল। প্রথম নির্দেশনা—শান্ত থাকুন, আপনাকে দেখে যেন স্বাভাবিক মনে হয়। তারপর তারা আপনার কাছ থেকে কী চায় তা বোঝাপড়া করার চেষ্টা করুন। এবং নিজেকে কিছুটা সাদাসিধা হিসেবে উপস্থাপন করতে দ্বিধা করবেন না।

আমি জানতাম যে তিন ধরনের জিজ্ঞাসাবাদকারী রয়েছে—প্রথম ধরনের জিজ্ঞাসাবাদকারী নিজের স্বর উঁচু না করে সহানুভূতিশীলভাবে প্রশ্ন করে; দ্বিতীয় ধরনের জিজ্ঞাসাবাদকারীরা কঠোর, তারা আপনার দুর্বলতা খুঁজে বের করতে চাইবে; এবং সর্বশেষ ধরনের জিজ্ঞাসাবাদকারী আপনার ও তার মধ্যে বন্ধুত্বের অনুভূতি সৃষ্টি করবে—সর্বশেষ প্রকারের ক্ষেত্রে আপনার সবচেয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

আমি সাত মাস নির্জন কারাবাসে (solitary confinement) ছিলাম। এই সময়ে আমি একটি বারের জন্যও দিবালোকের দেখা পাইনি। কারাগারটি হাদাহ কোয়ার্টারে ছিল, যেখানে পিএসও অবস্থিত। তবে আমাকে কোনো নির্যাতন করা হয়নি এবং আমার জেলাররা আমার সাথে যথাযথ আচরণ করেছিল।

যখন আমাকে গ্রেফতার করা হয়, আমার স্ত্রী তখন আমাদের দ্বিতীয় সন্তানকে নিয়ে চার মাসের গর্ভবতী ছিল। আমি তার কাছে খবরের জন্য চিঠি লিখতে চেয়েছিলাম, বিশেষ করে আমাদের কন্যার জন্মের পর। আমার লুকিয়ে রাখা টাকাগুলোর দরুন আমি কোনো সমস্যা ছাড়াই দুজন গার্ডকে ঘুষ দিতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং তারা আমার চিঠি আমার স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিত।

কাগজে কলমে আমাকে কোনো সংবাদপত্র বা বই পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু আবারও আমি কিছু 'সমঝদার' গার্ডকে উপঢৌকন দিতে সক্ষম হই। তাদের একজনের একটি রেডিও ছিল। রেডিওটি সে রাত এগারোটা থেকে সকাল নয়টা অবধি আমার কাছে রেখে যেত।

আমার মেয়ে আবরারের বয়স চার মাস হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি তাকে দেখতে পারিনি।

২০০১-এর বসন্তে আমাকে এফবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করে। এরপর আমাকে যে অবস্থায় রাখা হয়েছিল, তার উন্নতি হলো। তখন থেকে ২০০২-এর বসন্তে মুক্তি পাওয়া পর্যন্ত আমাকে সপ্তাহে দু'বার আমার পরিবারের সাথে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়।

আমাকে একটি বড় সেলে স্থানান্তর করা হলো। সেখানে আমার সাথে আরও পনেরো জন জিহাদি ছিল। তাদের বেশিরভাগই ছিল ইয়েমেনি। তাদের সাথে জিহাদ নিয়ে আমার দ্বিমত ছিল। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে তাদের মধ্যে কয়েকজন আমাকে হত্যার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিল। তারা যখন দেখলো যে প্রহরীরা আমার সাথে ভালো ব্যবহার করছে তখন তারা মারাত্মকভাবে সন্দেহজনক হয়ে পড়ল,

'তুমি অবশ্যই কোনো গুপ্তচর হবে! তুমি তো আল-কায়েদাতে ছিলে, গার্ডরা কেন তোমার সাথে এমন আচরণ করছে? তুমি মনে হয় আল-কায়েদাকে বিক্রি করে দিয়েছ, তুমি মনে হয় ইসলামকে বিক্রি করে দিয়েছ, তুমি বিশ্বাসঘাতক এবং মৃত্যুই তোমার প্রাপ্য!'

তারা হয়তো আল-কায়েদার মিশরীয়দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল—আফগানিস্তানে তারা নিয়মিত আমাদের কায়রোর কারাগারে বন্দিদের নির্যাতনের ফিল্ম প্রদর্শন করত। এই তথ্যচিত্রগুলোতে দাবি করা হয়েছিল যে, কর্তৃপক্ষ সর্বদা বন্দিদের মধ্যে, এমনকি ইসলামপন্থীদের মধ্যেও গুপ্তচর ঢুকিয়ে দিত। সুতরাং, তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, তাদের মধ্যেও সরকারের এক পুতুল আছে, আর সেটা বোধ হয় আমিই, 'এক কাফের'।

সেলে আমার বেশিরভাগ সঙ্গীই আফগানিস্তানে আমার সাথে ছিল এবং ৯/১১-এর পর তাদের যখন ইয়েমেনে ফিরে আসতে বাধ্য করা হয়েছিল তখন তাদের গ্রেফতার করা হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায় : ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১

সেসময় আমি আল-কায়েদার সক্রিয় সদস্য ছিলাম না। তবে ৯/১১ সম্পর্কে আমি যা জানি তা-ই বলছি।

১৯৯৯ সালের শরত থেকে শেখ ওসামা এমন এক ঘটনা নিয়ে কথা বলতে শুরু করেন 'যা বিশ্বকে উলট-পালট করে দেবে'। কিন্তু তিনি এরচেয়ে বেশি কিছু বলেননি।

তিনি রহস্যজনকভাবে যোগ করেছিলেন, 'সম্ভবত আমরা সকলেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছি'।

যখন কাবুলের গেস্ট হাউজে ইয়েমেনি ও মিশরীয় মুজাহিদদের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল, আমাকে তা মীমাংসা করতে বলা হয়েছিল। আমার মনে আছে বিন লাদেন তখন আমাকে উদ্দেশ্য করে একটি মন্তব্য করেছিলেন। আমি যখন আমার স্বদেশি মুজাহিদদের পক্ষ নিলাম, বিন লাদেন আমাকে পরামর্শ দিলেন যে, 'নিরপেক্ষ থাকো, কারণ আমরা সবাই মুসলিম'।

'আছি তো, যদি এমন কোনো ঘটনা ঘটে যা আমাদের আলাদা করে দেবে। এমন একটি ঘটনা যা পুরো পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দেবে এবং আমরা এর সমস্ত পৃষ্ঠে ছড়িয়ে যাচ্ছি।'

আমি তাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারিনি, আমাদের 'অসচেতন' হতে শেখানো হয়নি। আসলে, ৯/১১ যত কাছাকাছি আসছিল তিনি সেই রহস্যময় ঘটনা সম্পর্কে তত কম কথা বলছিলেন। কিন্তু যখন তিনি জিহাদিদের মধ্যে কোনো সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতেন বা যখন তিনি আমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন—কেবল তখন তিনি ঐ ঘটনা সম্পর্কে কথা বলতেন। তিনি প্রায়শই ফজরের সালাতে পরে আমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন। তখন তিনি হঠাৎ করেই জিজ্ঞাসা করতেন,

'আজ কে ভালো স্বপ্ন দেখেছে?'

৯/১১-এর কয়েক মাস আগে বিন লাদেনের দেহরক্ষী এবং জামাতা আবু মুসলিম আল-আদানি বলেছিলেন যে, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, পৃথিবীতে একটি গ্রহাণু এসে আঘাত হেনেছে। ওসামা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন,

'এই স্বপ্নের মাধ্যমে তো তুমি আমাদের অপারেশন প্রকাশ করে দেবে!'

২০০১-এর অগাস্টে বিন লাদেন কান্দাহার ক্যাম্পে সাধারণ সতর্কতা জারি করেন এবং এর আশেপাশে সৈন্য সমাবেশ বৃদ্ধি করার নির্দেশ দেন। তিনি জানতেন

যে, সেপ্টেম্বরে আমেরিকায় একটি অপারেশন পরিচালনা করা হবে, তবে সঠিক তারিখটি জানতেন না। সম্ভবত এটি অপারেশনের কমান্ডারকে ঠিক করতে দিয়েছিলেন, আমি আসলে নিশ্চিত নই।

কমান্ডার মাসউদ তাদের যুদ্ধে সমর্থন জোগাড় করার জন্য ইউরোপ সফর করেন। এ ব্যাপারে ২ সেপ্টেম্বর তালেবান নেতৃত্ব লাদেনের সাথে একটি বৈঠকের আহ্বান করে।

'আমরা মাসউদের ব্যাপারে কী করব?'

'আমাদের তাকে মেরে ফেলতে হবে! এবং আমেরিকানদের আক্রমণ করতে হবে!,' শায়খ ওসামা জবাব দিলেন।

তিনি আরও বললেন, 'মাসউদকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। আমরা তার ব্যাপারটা দেখছি।'

আল-কায়েদার জন্য এই হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে জিহাদের পর থেকেই মাসউদকে নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল কিন্তু শায়খ আবদুল্লাহ আযযাম সর্বদা মাসউদকে সমর্থন করেছেন এমনকি যখন আল-কায়েদা নিশ্চিত ছিল যে মাসউদ পশ্চিমাদের একজন প্রতিনিধি, তখনও শায়খ আযযাম বিন লাদেনকে রাজি করেছিলেন যে 'আপাতত তাকে যেন ছেড়ে দেওয়া হয়'। সোভিয়েতরা চলে যাওয়ার পর আল-কায়েদা অবশেষে পশ্চিমাদের সাথে মাসউদের সম্পর্ক ও তার বিশ্বাসঘাতকতা উন্মোচন করে। তিনি মুজাহিদদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে বিন লাদেন ও তালেবানের মধ্যে সম্পর্ক যেহেতু আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়ছিল, তাই শায়খের তালেবানকে সন্তুষ্ট করা দরকার ছিল। আর সেটা করার সর্বোত্তম উপায় ছিল তাদের প্রধান শত্রুকে শেষ করে দেওয়া। এজন্যই মাসউদকে হত্যা করা হয়েছিল।

শায়খ ওসামা নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের কমান্ডারের ওপর পরিকল্পিত হামলার দিন তারিখ জানতেন। ২ সেপ্টেম্বর এই হামলার আদেশ জারি করা হয়। তিউনিশিয়ান দুজন ঘাতক (দাহমানি আল-সাত্তার ও রশিদ বুরাউয়ি) বেলজিয়ামের ভুয়া পাসপোর্ট বহন করে এবং সাংবাদিক সেজে আফগানিস্তানের উত্তর-পশ্চিমে সেপ্টেম্বরে এই মিশন পরিচালনা করেন।

১১ সেপ্টেম্বর আল-কায়েদার প্রধান সকল পরিবারকে সেইফ হাউজে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এই ঘটনা কি আমেরিকায় পরিচালিত অপারেশনের সাথে সম্পর্কিত ছিল, নাকি মাসউদের হত্যার পর আফগানিস্তানে যা ঘটছিল তার সাথে?

কাবুলের কয়েকজন লোক এসে দুজন আরব জিহাদির গলা কেটে দিয়েছিল মাসউদ হত্যাকাণ্ডের প্রতি তাদের ক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য। আল-কায়েদা আরও প্রতিশোধের আশঙ্কা করছিল।

১১ই সেপ্টেম্বর বিন লাদেন তার দেহরক্ষী এবং আল-কায়েদার অন্যান্য নেতাদের নিয়ে কান্দাহারে এক সেইফ হাউজে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তার পরিবার অন্য সেইফ হাউজে ছিল।

একজন আমাকে বলেছেন যে, লাদেন নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে অপারেশনের সঠিক দিন-তারিখ জানতেন। ১১ই সেপ্টেম্বর আবু আবদুল্লাহ (বিন লাদেন) মিডিয়ার দায়িত্বে থাকা হাসান আল-বাহলুলকে একটি স্যাটেলাইট সংযোগ স্থাপন করতে বলেছিলেন,

'আজকের সংবাদ দেখা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ,' তিনি বলেছিলেন।

বাহলুল তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলেন যে একটি অপারেশন চলছে। কিন্তু পাহাড়ি এলাকা হওয়ার দরুন বিন লাদেন যে স্যাটেলাইট সংযোগ স্থাপন করতে বলেছিলেন, তা তিনি পারেননি।

তালেবান ৯/১১-এর হামলার খবর শোনামাত্র মোল্লা জলিল তৎক্ষণাৎ সাইফ আল-আদেলকে ফোন করে বললেন যে সেদিনই ওসামার সাথে তারা দেখা করতে চান। বিন লাদেন এবং তালেবানরা কান্দাহারে এক গোপন জায়গায় সাক্ষাৎ করেন। সচেতনতার জন্য বিন লাদেন মাত্র দুটি গাড়ির একটি কাফেলায় যাত্রা করেন। বিন লাদেন ও মোল্লা উমরের আলোচনার বিষয় ছিল আমেরিকার অনিবার্য প্রতিরোধের সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি এড়াতে কী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। তালেবানরা জানত যে আমেরিকায় হামলা হয়েছে। কিন্তু সেই সময় তাদের নিকট হামলার স্পষ্ট বিবরণ ছিল না।

প্রথম সিদ্ধান্ত ছিল সমস্ত প্রশিক্ষণ ক্যাম্প খালি করা, হোক সেগুলো আল-কায়েদার, তালেবানের বা পাকিস্তানি। এরপর কান্দাহার এবং আফগানিস্তানের অন্যান্য জায়গায় অবস্থিত আল-কায়েদার সমস্ত বিল্ডিং খালি করা। অস্ত্রগুলো মুজাহিদদের বিভিন্ন গ্রুপে বিতরণ করে দেওয়া হয়েছিল। সবশেষে তালেবান ও আল-কায়েদা পাকিস্তানের অভ্যন্তরে উলামা ও ধর্মীয় পণ্ডিতদের সাথে যোগাযোগ করে এবং তাদের আমেরিকা হামলা করার আগে আল-কায়েদার নেতৃত্বের গা ঢাকা দেওয়ার জন্য কোনো জায়গা প্রস্তুত করে দিতে বলে।

আল-কায়েদার নেতৃত্ব তৎক্ষনাৎ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়নি। শায়খ তার দেহরক্ষীদের নিয়ে তার সেইফ হাউজে ফিরে যান। হাসান আল-বাহলুলের মতো তাদের কয়েকজন একটি ভ্যানে ওঠেন। সেখানে স্যাটেলাইট টেলিভিশনসহ সমস্ত মিডিয়া সরঞ্জাম লুকিয়ে রাখা ছিল তালেবানরা তাদের দাড়ি শেভ করে আফগান টুপি পরে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছিল।

৯/১১-এর কিছু দিন পর বিন লাদেন বাহলুলকে আমেরিকার ওপর হামলার অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে গবেষণা করতে বললেন। তিনি আমেরিকার এই পতনের একটি সংক্ষিপ্তসার চাচ্ছিলেন। বাহলুল এ বিষয়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক গবেষণার একটি সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করে শায়খ ওসামাকে দিয়েছিলেন। আল-কায়েদার প্রধান তার রেকর্ড করা ভিডিওটির জন্য তথ্যগুলো চাচ্ছিলেন। ভিডিওটি ৭ই অক্টোবর আল-জাজিরায় সম্প্রচারিত হয়েছিল। তিনি যা বলেছিলেন তার কিছু অংশ এমন,

'আমেরিকার দুর্বলতম স্থানে আল্লাহ একে আঘাত করেছেন। এর সর্বশ্রেষ্ঠ ভবনগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। এজন্য আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।'

'আমেরিকা এর উত্তর থেকে দক্ষিণে, পশ্চিম থেকে পূর্বে, সবদিক থেকে এখন আক্রমণের ভয়ে ভীত। এজন্য আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আমেরিকা এখন যার স্বাদ নিচ্ছে, তা আমরা বহু বছর ধরে যার স্বাদ নিয়ে আসছি তার তুলনায় তুচ্ছ। আমাদের উম্মাহ (ইসলামি বিশ্ব) ৮০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই অপমান ও এই অবক্ষয়ের স্বাদ গ্রহণ করে আসছে। উম্মাহর পুত্রদের হত্যা করা হয়েছে, রক্তপাত করা হয়েছে, এর আশ্রয়স্থলগুলোতে আক্রমণ করা হয়েছে। কিন্তু কেউ আমাদের দিকে ফিরে তাকায়নি, কেউই আমাদের দিকে কর্ণপাত করেনি।...এই ঘটনাপ্রবাহ গোটা বিশ্বকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। ইমানদারদের দল এবং কাফেরদের দল। আল্লাহ আপনাকে কাফেরদের থেকে দূরে রাখুন। প্রত্যেক মুসলিমকে তার দীনকে বিজয়ী করতে ছুটে যেতে হবে। বিশ্বাসের বাতাস বইতে শুরু করেছে।'

কিন্তু হামলার পর থেকেই কান্দাহারে আল-কায়েদার অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। সকল যোদ্ধাকে কোনো রকমে নিজেকে রক্ষা করতে হতো এবং লুকিয়ে থাকতে হতো। সবাই সন্দেহপ্রবণ ছিল। প্রত্যেকেই এয়ার রেইডের আশঙ্কা করছিল।

সেপ্টেম্বরের শেষে বিন লাদেন তার নিজের সহ সমস্ত যোদ্ধার স্ত্রী-সন্তানদের কান্দাহার থেকে কেত্তায় স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অন্যদিকে জাওয়াহিরির পরিবার কাবুলে আমেরিকান মিসাইলের টার্গেট হওয়ার পর জাওয়াহিরি তাদের

পেশোয়ারে স্থানান্তর করেন। ওসামার ছোট বাচ্চারা তাদের মায়েদের সাথে ছিল। কিন্তু সাদ সহ বাকিরা শুরুতে বিন লাদেনের সাথেই ছিল।

কিছু দিন বাদে অক্টোবরের শুরুর দিকে যখন মার্কিন ও ব্রিটিশ বোমা তালেবানের বিভিন্ন অবস্থানের ওপর পড়ছিল, তখন আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কান্দাহার থেকে জাজি পর্বতের দিকে চলে গেল। সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে প্রথম জিহাদের সময় বিন লাদেন সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

জাজিতে একটি ছোট ব্যারাক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল যা আল-কায়েদার মিলিটারি ক্যাম্প হিসেবে কাজ করছিল। ওসামা বিন লাদেন খোস্তে তার বন্ধু জালালুদ্দিন হক্কানীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আল-কায়েদার প্রধান এখন তার সমর্থকদের ছত্রভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নিলেন, যাতে সকল আরব যোদ্ধারা তাদের স্বদেশে ফিরে যেতে পারেন। অনেকে ইরান হয়ে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যান। আমি যখন ইরানের মাধ্যমে বলছি, তার মানে আমি ইরান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার কথা বলছি না—বেলুচ গোত্রগুলোর ইরানি সুন্নিরা জিহাদিদের গোপনে হরমুজ প্রণালী পর্যন্ত পালাতে সাহায্য করেছিল, সেখান থেকে আবার অন্য লোকেরা তাদের দায়িত্ব নিয়েছিল।

বাহলুলের মতো বিন লাদেনের কাছের কিছু সহযোগী জিজ্ঞেস করেছিল যে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করার সময় তারা হক্কানীর বাড়িতে তার সাথে থাকতে পারবে কিনা? বাহলুল ইয়েমেনে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত হক্কানীর বাড়িতেই ছিলেন। তবে বিন লাদেন চলে গেলেন। যাওয়ার পূর্বে আল-কায়েদা প্রধান তার আরেক রক্ষী সাদ আল-তায়েজিকে ইয়েমেনে ফিরে যেতে বললেন।

তোরা বোরার গুহার দিকে যাত্রাকালে তিনি বারো দিন আমেরিকানদের বোমা হামলার মুখোমুখি হবেন। তাই বিন লাদেন তার সাথে কেবলমাত্র তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত অনুসারীদের নিতে চেয়েছিলেন যাতে করে তাদের অবস্থান প্রকাশ হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করা যায়। আয়মান আল-জাওয়াহিরি, নাসের আল-ওয়াহাইশি, হামজা আল-ঘামদি এবং হাতেগোনা কয়েকজন সৌদি দেহরক্ষী তার সাথে ছিলেন।

বোমা হামলার পরপরই তারা আফগানিস্তান ছেড়ে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখানে তারা কয়েক মাস অবস্থান করেন। এরপর তাদের আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। মধ্যবর্তী সময়ে নাসের আল-ওয়াহাইশী তার স্ত্রীর সাথে যোগ দিতে আফগানিস্তানে ফিরে না গিয়ে বরং ইরানে পালিয়ে যান।

এই সময়ে প্রত্যেকের কাছে একটি (সনি) রেডিও ছিল এবং তাতে দ্য ভয়েস অব কুয়েত এবং বিবিসির আরবি পরিষেবাগুলো সবাই শুনত। শায়খের কিছু প্রাক্তন রক্ষী আমাকে এ কথা বলেছেন। তারা এখন কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তারা আমাকে ওসামা বিন লাদেনের সাথে তাদের কথোপকথনের কথা বলেছেন, বিশেষ করে নিউইয়র্কে আক্রমণ সম্পর্কে।

দেখে মনে হচ্ছিল, যে আক্রমণগুলোর মাত্রা আল-কায়েদা প্রধানের প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেছে। তিনি টাওয়ারগুলোতে আঘাত হানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিশ্চিত করেছিলেন যে অপারেশনটি ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এত বেশি হবে বলে তিনি আশা করেননি।

তার উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকাকে আক্রমণ করা, যাতে করে আফগানিস্তানে আল-কায়েদার ভূখণ্ডে আমেরিকা সেনা মোতায়েন করে। কিন্তু হামলার প্রকৃত ফলাফল তাকে অবাক করে দিয়েছিল বলে মনে হয়।

৯/১১ হামলাকারীরা আমার চেনা

৯/১১ সেলের সদস্যদের সাথে আফগানিস্তানে আমার দেখা হয়েছিল। সে সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই।

১৯৯৯ সালের নভেম্বরে 'হামবুর্গ সেল'-এর চার সদস্য—মুহাম্মদ আত্তা, রামযি বিন আল-শিইভ, মারওয়ান আল-শেহি এবং যিয়াদ জাররাহ—কান্দাহারে পৌঁছলেন। তখন রামাদান মাস চলছিল। তাদের মধ্যে তিনজন আল-কায়েদার ক্যাম্পে নয়, বরং শহরেই অবস্থান করলেন। আমি তাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলাম। কিন্তু দুবছর পরে তারা যে মিশনটি পরিচালনা করতে যাচ্ছিলেন, সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। তাদের প্রশিক্ষণ ছিল স্ট্যান্ডার্ড। তাদের সুরক্ষা এবং গোয়েন্দা বিষয়ক একটি কোর্স করানো হয়। পরে শহুরে পরিবেশে 'বিশেষ অভিযান' (অপহরণ, হত্যাকাণ্ড, বিস্ফোরক) পরিচালনা নিয়ে আরও একটি কোর্স করানো হয়। তারা অস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণও পেয়েছিলেন।

আমি দুসপ্তাহ তাদের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলাম। তারা চতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন। অবসর সময়ে আমরা প্রায়শই জার্মানিতে তাদের জীবন এবং কীভাবে আমাদের প্রত্যেকে জিহাদের পথে এসেছিলাম সে সম্পর্কে কথা বলতাম। মুহাম্মদ আত্তা জার্মান সমাজের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেন। জার্মান সমাজকে তিনি দুর্নীতিগ্রস্থ ও ক্ষয়িষ্ণু মনে করতেন। জিয়াদ জাররাহর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন; তিনি

বলেছিলেন যে জার্মানরা মিশুক এবং অপরিচিতদের প্রতিও বন্ধুসুলভ। তিনি মনে করতেন যে তাদের ইসলামের দিকে দাওয়াহ দেওয়া যেতে পারে।

অবশ্যই তারা আমেরিকায় হামলা পরিচালনার পরিকল্পনার কথা কখনও আমার সামনে উল্লেখ করেননি। এটি ছিল একটি গোপন পরিকল্পনা, যা কেবল তারা এবং আল-কায়েদার সামরিক কমিটির মধ্যে সংগঠিত হয়েছিল—অর্থাৎ আবু হাফস, শায়খ ওসামা ও খালেদ শেখ মুহাম্মদ। তারা সকলেই ১৯৯৯ সালের বসন্তে একত্রিত হয়েছিলেন।

আমাদের সাথে থাকাকালীন তারা তাদের ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন। মুহাম্মদ আত্তা ছিলেন মিশরীয়, আসল নাম আবু আবদুর রহমান আল-মাসরি; মারওয়ান আল-শেহি ছিলেন সৌদি, নিজেকে আবু মুহাম্মদ আল-শারকি বলে অভিহিত করতেন; খালিদ আল-মিজহার—সান্নান আল-মাক্কি (অর্থাৎ মক্কার অধিবাসী); এবং সালিম আল-হামজি—বিলাল আল-মাক্কি (তিনিও মক্কা থেকে এসেছিলেন)।

আমার মনে আছে আল-শেহিকে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। তার পেটে সমস্যা ছিল। তার চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যাওয়া প্রয়োজন ছিল। তিনি আব্বাস নামের এক ইয়েমেনির সাথে চলে গেলেন। পরে কালাশনিকভ নিয়ে প্রশিক্ষণ নেয়ার সময় আব্বাস মারা যান।

১৯৯৯ সালে কাবুলের ফ্রন্টলাইনে সালিম আল-হামজির সাথে আমার পরিচয় হয়। এক হাউতজার (Howitzer) গ্রেনেড নিক্ষেপ করার সময় তার হাত ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

তবে আমি যাকে সবচেয়ে ভালো জানতাম তিনি হলেন খালিদ আল-মিজহার। ১৯৯৯ সালের গ্রীষ্মে দূতাবাসে বোমা হামলা অবধি তিনি কাবুলে আল-কায়েদার গেস্ট হাউজের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বিন লাদেনের একজন উগ্র সমর্থক ও খাল্লাদের খুব কাছের মানুষ ছিলেন। দূতাবাসে বোমা হামলার পরে প্রথমবারের মতো তার সাথে আমার দেখা হয়। কিন্তু আমি যখন বিয়ে করার পরিকল্পনা করছিলাম তখন আমরা একসাথে অনেক সময় কাটিয়েছি। খালিদ চেয়েছিলেন আমি তার নিজের কনিষ্ঠ শালিকাকে বিয়ে করি। ১৯৯৯ সালে আমি ইয়েমেনে থাকাকালীন তিনিও সেখানে ছিলেন। তিনি আমাকে তার শ্বশুরের সাথে দেখা করতে নিয়ে যান, যিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং দুআ করেন। কিন্তু পরের দিনই আমাকে জানানো হয় যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কন্যা তার মন বদলেছে এবং সে আমাকে বিয়ে

করতে চায় না। পরে আরেকজন জিহাদির সাথে তার বিয়ে হয়। এত কিছুর পরেও খালিদ আল-মিজহার ইয়েমেনে আমার বিয়েতে এসেছিলেন।

আমি ফরাসি যাকারিয়াস মুসাউয়িকেও চিনতাম। তাকেও একটি আক্রমণ চালানোর জন্য আমেরিকায় পাঠানো হয়েছিল। আফগানিস্তানে তার ছদ্মনাম ছিল আবু খালিদ আল-সাহরাবী, কারণ তিনি মরক্কান বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি আরবির মাত্র কয়েকটি শব্দই বলতে পারতেন। আমি খোস্তে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পগুলোয় তার তত্ত্বাবধায়ক ছিলাম, বিশেষ করে খালদানে। সেখানে তিনি ১৯৯৭-এর গ্রীষ্মে একটি সামরিক প্রশিক্ষণ কোর্স করেছিলেন। খোস্তে আসলেই তিনি সাধারণত গেস্ট হাউজে গিয়ে উঠতেন। তিনি ছিলেন লম্বা এবং সুঠাম দেহের অধিকারী। যুদ্ধের সময় মুসাউয়ি সম্মুখ সমরে জিহাদিদের জন্য দুই কাঁধে দুই জেরি ক্যান পানি বহন করে নিয়ে যেতেন। আমি তার সাথে মশকরা করে বলতাম যে, আমি তাকে মারধোর করব। কিন্তু আমি যখন দৌড়ে পালাতাম, তিনি সেটা পছন্দ করতেন না।

সানাআয় জেলে থাকাকালীন আমি ৯/১১-এর অভিযান সম্পর্কে জানতে পারি। আমি নিকটবর্তী একটি মসজিদে ইমামকে আমেরিকানদের ওপর 'আক্রমণ' উদযাপন করতে শুনি। তবে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি আসলে কী চলছিল এবং এই আক্রমণের টার্গেট কী ছিল। আমি জানতাম না যে টুইন টাওয়ার ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক সপ্তাহ পর যখন এফবিআই-এর জিজ্ঞাসাবাদকারীরা আমাকে প্রশ্ন করা শুরু করে, তখন এ বিষয়ে আমি আরও জানতে পারি। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ পুরো এক মাস ধরে চলল। শুক্রবার বাদে সপ্তাহের বাকি সবদিন, সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দুটো অবধি।[২০]

দুবছর আগে কান্দাহারে খালিদ শেখ মুহাম্মাদের সাথে এক কথোপকথনের কথা আমার মনে পড়ে। তিনি ছিলেন ৯/১১ হামলার পেছনের মাথা। তিনি আমাকে গোপনে বলেছিলেন যে ফিলিপাইনে একবার দ্বিতীয় পোপ জন পল সফরে এসেছিল। সেসময় পোপের উপরে একটি বিমানের মাধ্যমে তার হামলা চালানোর কথা ছিল। কিন্তু সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। তারপরে আবার ফিলিপাইনে বিমানের মাধ্যমে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে টার্গেট করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেবারও তিনি সফল হতে পারেননি।

---

২০. আবু জান্দালের এফবিআই জিজ্ঞাসাবাদ কেবল ৯/১১ হাইজ্যাকারদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করতেই নয়, বরং এছাড়াও তারা কীভাবে আল-কায়েদা ও ওসামা বিন লাদেনের সাথে যুক্ত ছিল, তা বের করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

২০০০ সালের গ্রীষ্মে আফগানিস্তানকে একেবারে ছেড়ে আসার পর করাচীতে খালিদ শেখ মুহাম্মদ যে বাড়িতে ছিলেন সেখানে আমি কয়েক সপ্তাহ কাটাই। সেখানে মুহাম্মদ আত্তা সহ হামবুর্গ সেলের আরও দুজন সদস্য ছিলেন—রামযি বিন আল শিইভ ও ফারুক আল-তিউনিসি। তারা প্লে-স্টেশনে ফ্লাইট সিমুলেটর খেলছিলেন। আমি যখন ৯/১১-এর কথা শুনি তখন এই চিত্রটিই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তারা কী করছে তা নিয়ে প্রশ্ন না করেই আমিও তাদের সাথে এটি খেলেছি। তারা সিমুলেটরে কল্পিত টাওয়ারে হামলা করে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন!

অনুশোচনার পানে

আমার কারাসঙ্গিদের মধ্যে কেবল নাসর আল-আনিসি একমাত্র আগ্রহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আমার সাথে বসনিয়ায় ছিলেন। আমরা একসাথে জিহাদ সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো এবং আমাদের মতে সংগঠনটি (আল-কায়েদা) সম্ভাব্য যে ভুলগুলো করেছিল, তা নিয়ে আলোচনা করতাম। অন্যান্য বন্দিদের কারোরই না তো ছিল কোনো সাংস্কৃতিক গভীরতা আর না ছিল আদর্শ বা রাজনীতিতে খুব একটা আগ্রহ। কারাগারে থেকে আমি বুঝেছি যে আল-কায়েদা এই তরুণ রিক্রুটদের যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল তা তাদের কেউই মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়নি, আমেরিকানদের বা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহর নামে জিহাদ ঘোষণা করা।

আমি জানতে পারলাম যে, জিহাদিরা একে অপরের সাথে কীভাবে খারাপ ব্যবহার করে। আল-কায়েদার গুটিকয়েক সদস্য কীভাবে ইসলাম এবং সংগঠনটির নাম খারাপ করছে। আমি নিশ্চিত হলাম যে, আল-কায়েদা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে যে সভ্যতার সংঘাতের ঘোষণা করার দাবি করছিল তাতে এই লোকগুলোর কেউই অংশ নিতে পারবে না। তারা মূলত এর যোগ্যই না। তাদের সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত ভিত্তি দুর্বল। এরা হলো সংগঠনের তৃণমূল পর্যায়ের সদস্য। আমি তিন বছর নেতৃত্বের কেন্দ্রে অবস্থান করেছি। কিন্তু আমার এবং তাদের মধ্যে যোজন যোজন দূরত্ব। এই বাইশ বছরের যুবকেরা কীভাবে দখলকৃত মুসলিম ভূমিগুলো মুক্ত করবে? তারা কী করতে পেরেছে? তারা বিন লাদেনকে দেখেছে, তার কয়েকটি বক্তব্য শুনেছে এবং তারপরে বাড়ি চলে গিয়েছে; তারা তার সাথে কয়েক মাস ছিল কেবল। এই নতুন প্রজন্ম, যারা নিজেদের আল-কায়েদার সদস্য বলে দাবি করে, বাস্তবে এরা বিন লাদেনের গভীর চিন্তাভাবনার কিছুই ধারণ করতে পারেনি।

ধীরে ধীরে আমার ধারণাগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি একটি নতুন জীবন চাচ্ছিলাম। আমি আমার পরিবারকে ভীষণ মিস করছিলাম। আমি কারাগারে নয়, বরং আমার পরিবারের সাথে থাকতে চাচ্ছিলাম।

একদিন কারাগারের পরিচালক বললেন, 'তুমি কি এখান থেকে মুক্ত হতে চাও?'

'হ্যাঁ! আমি কারাগারের বাইরে এক শান্ত জীবন যাপন করতে চাই। আমি ইসরায়েলের শ্যারনকেও একই উত্তর দিতাম।'

তিনি আমার দিকে যেভাবে তাকালেন তাতেই আমি বুঝে গেলাম যে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন যে, আমি সত্যিই বদলে গেছি।

আমাকে মুক্তি দেওয়ার দুদিন আগে আমাকে আলি আবদুল্লাহ সালেহের প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে নিয়ে যাওয়া হলো; তিনি আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন। তার সাথে সাক্ষাৎটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিল; তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন এবং তারপর বললেন,

'বসৎ, আমি এখন তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি তারেকের সাথে কথা বলো।'

রাষ্ট্রপতির ভাগ্নে তারেক মুহাম্মদ সালেহ ছিলেন প্রেসিডেন্সিয়াল বডি গার্ডদের প্রধান।

তিনি আমাকে বললেন, 'আমরা আপনাকে মুক্তি দিতে চাই। কিন্তু আমাদের কী গ্যারান্টি আছে যে আপনি মুক্তি পাওয়ার পরেও সমস্যা তৈরি করবেন না?'

'আমি এখন থেকে শান্ত হয়ে যাচ্ছি। আর প্রমাণ? আপনি যখন আমাকে বিমানবন্দরে গ্রেফতার করিয়েছিলেন, তখন আমি কোনো এক সৈনিকের কাছ থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে ওপেন ফায়ার করতে পারতাম। কিন্তু আমি তা করিনি।'

তারেক বুঝতে পারলেন যে আমি সত্যি বলছি।

দুদিন বাদে আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়। আমি সহিংসতা ত্যাগ করেছি মর্মে একটি ডকুমেন্টে স্বাক্ষর করি এবং একটি বিশদ জীবনী সংক্রান্ত নোট সরবরাহ করি। বিচারক হামুদ আল-হিতারের নিকট এই কাগজপত্র পৌঁছে দেওয়া হয়। আমি নিম্নলিখিত শর্তাবলির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম, আমি আর কখনো কোনো জিহাদি সংগঠনের সাথে জড়িত হচ্ছি না; আমি কখনোই ইয়েমেনকে অন্য দেশে অভিযানের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করব না; আমি কখনোই ইয়েমেনে অবস্থানকারী বিদেশিদের টার্গেট করব না, বা ইয়েমেনের বৈদেশিক স্বার্থকে আক্রমণ করব না।

তারেক মোহাম্মদ সালেহ কারাগার থেকে আমাকে নেওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে এসে আমাকে মামার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমার পরিবারের সাথে আমার পুনর্মিলন ঘটল।

এক কঠিন পুনর্বাসন

২০০২ সালের শেষের দিকে যখন আমি কারাগার থেকে বের হয়েছি, তখন আমি আর কোনো মুজাহিদ ছিলাম না। যদিও এফবিআই এজেন্ট আলি সুফানের সাথে আমার কথোপকথনে আমার বিশ্বাস পুনরায় বলবৎ হয়েছিল যে আমেরিকানরা কেবল একটি ভাষাই বুঝতে পারে, আর তা হলো ক্ষমতা। সুফান বলতেই থাকতেন, 'আমেরিকান ইসলাম মুসলিম বিশ্বের ইসলামের চেয়ে ভালো'। তার মতে মুসলিম বিশ্বের ইসলাম ৯/১১-এ হাজারো নিরপরাধের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

এখন আমি আল-কায়েদার এবং যেকোনো সহিংস আন্দোলনের সাথে আমার সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি একটি নতুন জীবন শুরু করব। কিন্তু এমনটা করতে আমাকে কী অসুবিধাগুলোই না ভোগ করতে হবে!

আমি ভীত ছিলাম যে আমি সমাজে নির্বাসিত হচ্ছি। এবং শুরুতে তা-ই হয়েছিল। আমি আমার অতীত নিয়ে কী করব? প্রথম বছর আমি আল-কায়েদার সাথে আমার সম্পর্ক লুকিয়ে রেখেছিলাম, আমি রীতিমতো আমার অতীত জীবনকে মাটি চাপা দিয়ে দিয়েছিলাম। এটা ছিল কেবল সময়ের অপচয়। কারণ, সকলেই সত্য জেনে গিয়েছিল। সুতরাং, আমি কৌশল পরিবর্তন করলাম এবং ট্রান্সপারেন্সি বেছে নিলাম; আমি আবু জান্দাল, আমি আল-কায়েদার প্রাণকেন্দ্রে ওসামা বিন লাদেনের দেহরক্ষী ছিলাম। অবশেষে সত্য বিজয়ী হলো এবং আমি যা ছিলাম তা হিসেবেই সবাই আমাকে গ্রহণ করে নিয়েছিল।

দুঃখের বিষয় হলো আমি কোনও কাজ খুঁজে পাইনি! যদিও আমি যেকোনো কাজ করার জন্য, এমনকি ফল বিক্রেতা হওয়ার জন্যও প্রস্তুত ছিলাম! কিন্তু কোনো অভিজ্ঞতা না থাকায় আমার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। আমি এত অল্প বয়সে আল-কায়েদায় যোগ দিয়েছিলাম যে, আমি কখনই কোনো কাজ বা চাকরি করিনি। আমি ভাবলাম, আমি ছাত্র হতে পারি এবং সেভাবে কোনো একটা কাজ খুঁজে বের করতে পারি। কিন্তু আমার কোনো পুঁজি ছিল না। কারণ, আমাকে ইতোমধ্যে আমাদের থাকার ব্যবস্থা এবং পরিবারের ভরণপোষণের খরচ দিতে হতো, সেখানে আবার কোর্সের জন্য টাকা জোগাড় করার উপায় আমার ছিল না।

আমি গোয়েন্দা বিভাগের সাথে দেখা করতে গেলাম এবং তাদের বললাম, হয় আমাকে কোনো চাকরি দিন বা কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুন। ন্যাশনাল সিকিউরিটি সার্ভিস ডাচ দূতাবাসের সাথে সম্পর্কিত একটি ইনস্টিটিউটে ব্যবসায় শিক্ষা কোর্সে আমার খরচ বহনে সম্মত হয়। আমি শেষমেশ কোর্সটি সম্পন্ন করি। কোর্সটির স্থায়িত্ব ছিল ছয় মাস। কিন্তু এটি ২০০৬-এর আগে শুরু হয়নি। মধ্যবর্তী বছরগুলোতে আমাকে আমার নতুন জীবনের সাথে মানিয়ে নিতে হয়েছিল।

মধ্যবর্তী সময়গুলোয় আমি কী করেছি? তেমন কিছু না। আমার স্ত্রী একটি প্রাইভেট স্কুলে শিক্ষিকার কাজ করত। কিন্তু তার বেতন যথেষ্ট ছিল না। তাই চলার জন্য আমাদের তার গয়না এবং কিছু আসবাব বিক্রি করতে হয়েছিল।

প্রথম বছর গোয়েন্দা পুলিশের নিয়মিত নজরদারি থেকে বাঁচতে আমাকে বেশ কয়েকবার বাসা বদলাতে হয়েছিল। প্রতিবার নতুন প্রতিবেশীরা উদ্বিগ্ন হয়ে অভিযোগ করা শুরু করত। কিন্তু এসব সমস্যা এবং গোয়েন্দা বিভাগের চাপের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও আমি কখনই অনুভব করিনি যে, আমি যথেষ্ট সহ্য করেছি, এবার আমার আল-কায়েদার কাছে ফিরে যাওয়া উচিত। যদিও মাঝেমাঝে আমার অতীতের জিহাদি বন্ধুদের সাথে দেখা হতো। তারা আমাকে টাকা দিতে চাইত।

তারা বলত, 'আপনার পুরানো বন্ধুরা আপনার কথা জিজ্ঞেস করছে। তারা জানতে চায় আপনার নতুন জীবন কেমন চলছে।'

তবে যেহেতু আমি জানতাম যে তারা সংগঠনে পুনরায় যোগদান করেছে, আমি তাদের টাকা ফেরত দিয়ে বলতাম,

'না থাক, ধন্যবাদ। আমি ইয়েমেনে আল-কায়েদার সংস্পর্শে আসতে চাই না। আমার আর আগ্রহ নেই। আমি আফগানিস্তানে কাটানো আমার সময়গুলো কখনোই ভুলব না, কিন্তু আল-কায়েদা এখন আর আমার ভবিষ্যতের অংশ নয়।'

ডাচ ইনস্টিটিউটে কোর্স করার পরেও আমি কাজ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তবে এক বন্ধুর দেওয়া টাকায় ২০০৬ সালে আমি একটি ট্যাক্সি কিনতে পেরেছিলাম। আমি দেড় বছর ট্যাক্সি চালিয়েছি। কিন্তু তারপর উর্ধ্বমুখী মুদ্রাস্ফীতির দরুন কাস্টমারের সংখ্যা খুব কমে গেল। শেষমেশ আমাকে ট্যাক্সি বিক্রি করে দিতে হলো।

তবুও কর্মজীবনের এই প্রথম স্বাদটি খুব কার্যকর ছিল। এটি আমাকে আশ্বস্ত করেছিল যে আমি উপার্জন করতে পারছি, স্বাধীন হতে পারছি এবং একটি সাধারণ জীবন যাপন করতে পারছি। সর্বোপরি, আমি নিজেকে নিজে প্রমাণ করে দিয়েছিলাম যে আমি আল-কায়েদা ছাড়া বাঁচতে পারছি। আমার 'ডিটক্স' চলছিল।

কিন্তু আবারও নতুন এক বাধা এসে হাজির।

একদিন সানাআর এক চৌরাস্তার মাঝে একটি বড় 4x4 গাড়ি এসে থামলো। ট্রাফিক লাইটগুলো সবুজ হয়ে যাওয়ার পরেও গাড়িটি সরল না। তাই আমি হর্ণ বাজালাম। গাড়ির ভেতরের লোকেরা রেগে গিয়ে আমাকে অপমান করা শুরু করল। আমিও জবাব দিলাম। আমার ধারণা ছিল না যে তারা আমেরিকান দূতাবাসের লোক। তারা যেতে যেতে অবমাননাকর অঙ্গভঙ্গি করতে লাগল। আমি তাদের গাড়ি অনুসরণ করা শুরু করলাম। এদিকে তারা আমার রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি টুকে নিল এবং গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষস্থানীয় একজনকে ফোন করে বলে দিল। আমাকে সেই সন্ধ্যায় তিনি ফোন করে বললেন,

'কিছু আমেরিকানের সাথে কি আপনি কোনো ঝামেলা করেছেন? আমেরিকান দূতাবাসের সাথে?'

'না, আমি দূতাবাসের কাউকে চিনি না। আমি তো কিছুই করিনি!'

কিছু দিন বাদে আমাকে আরেক গোয়েন্দা সংস্থা গ্রেফতার করে। এ ঘটনার ঠিক আগেই আমি আমার স্ত্রীকে টেলিফোন করে জানাই এবং সে রাষ্ট্রপতির ভাগ্নে তারেক মুহাম্মদ সালেহকে সতর্ক করে দিয়েছিল। তিনি আমার মুক্তি নিশ্চিত করেছিলেন।

এক সপ্তাহ পর প্রেসিডেন্ট সালেহ তার এক দেহরক্ষীকে পাঠিয়ে আমাকে তার প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে নিয়ে আসেন। তিনি একটি সাধারণ সাওব এবং একটি পাগড়ি পরেছিলেন। তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন আমি আল-কায়েদাতে ছিলাম কি না। তিনি আমার অতীতের কিছুই না জানার ভান করছিলেন। কিছু সময় পূর্বে আল-কায়েদা ইস্তাম্বুলে একাধিক বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছিল। ইয়েমেনের রাষ্ট্রপ্রধান বুঝতে পারছিলেন না যে তুরস্ককে কেন টার্গেট করা হলো। তিনি আমাকে মনে করিয়ে দিলেন যে এটি একটি ইসলামিক রাষ্ট্র, যা তার মতে, আল-কায়েদাকে বাতিল প্রতিপন্ন করে।

'হ্যাঁ, মি. প্রেসিডেন্ট। তবে আক্রমণগুলো বিদেশি টার্গেটের ওপর পরিচালিত হয়েছিল।'

'তুরস্ক ইসলামিক দেশগুলোর সাথে মিত্রতা করতে চায়।'

'না। এটি ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে চায়...কিন্তু কি যায় আসে? যদি এটি আমাদের ছেড়ে যেতে চায়, তবে যেতে দিন। আমাদের তুরস্ককে দরকার নেই।'

তারপর প্রেসিডেন্ট আমেরিকানদের সাথে আমার বিবাদের প্রসঙ্গে কথা বলা শুরু করলেন,

'আমেরিকান সরকারের সাথে কি হয়েছিল?'

আমি তাকে বিশদ বিবরণ দিলাম এবং বললাম,

'আমি যদি জিহাদে ফিরে যাই তবে তা হবে আমেরিকানদেরকে তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য।'

প্রেসিডেন্ট হাসলেন। কিন্তু তার দেহরক্ষী বাধা দিল,

'এই লোককে শাস্তি দেওয়া উচিত, মি. প্রেসিডেন্ট!'

আমি কিছু বললাম না। প্রেসিডেন্ট আমার দিকে তাকালেন,

'তুমি উত্তর দিলে না কেন? আমি বুঝেছি যে আমি এখানে আছি তাই আমার প্রতি শ্রদ্ধার কারণে এমনটি করোনি। কিন্তু আমি তোমাকে উত্তর দেওয়ার অনুমতি দিলাম।'

'আমাকে দুই ঘন্টা সময় দিন এবং আপনি দেখতে পাবেন আমি কে!'

প্রেসিডেন্ট হাসলেন।

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি! তোমরা আল-কায়েদার সদস্যরা যা বলে তা করতে যথেষ্ট সক্ষম। তুমি বিন লাদেনের সাথে একটি কঠিন জীবন অতিবাহিত করেছ। আর আমার রক্ষীরা কেবল আমার সাথে আছে, কারণ আমি তাদের টাকা দিচ্ছি।'

আমাদের সাক্ষাৎকার শেষে রাষ্ট্রপতি আদেশ দিলেন আমাকে যেন ৪,০০০ ডলার দেওয়া হয়। এই টাকা আমি এবং আমার মতো কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া অন্যান্য সহযোদ্ধাদের জন্য ছিল। এই টাকা সর্বোত্তম সময়ে আমার হাতে এসেছিল, আমার স্ত্রী আমাদের তৃতীয় সন্তানকে জন্ম দিতে চলেছিল এবং তার খাবার কেনার জন্য কোনো টাকা আমার হাতে ছিল না।

আমাদের কথোপকথনের এক পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট সালেহ আমাকে বলেছিলেন,

'শান্ত হও, তুমি ইয়েমেনে আমার নিরাপত্তায় আছ—এটা তোমার দেশ। আমেরিকান দূতাবাসের কেউ যদি তোমাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে, নিজেকে রক্ষা করো!'

২০০১ সাল থেকে আমেরিকানরা বেশ কয়েকবার আমাকে হস্তান্তর করার অনুরোধ করেছিল। কিন্তু ইয়েমেনি কর্তৃপক্ষ নিয়মতান্ত্রিকভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। ২০০৫ সালে আমেরিকানরা আমার ভায়রা ভাই সালিম খামদানির

বিচারের সাক্ষী হিসেবে আমাকে গুয়ান্তানামোতে পাঠাতে চেয়েছিল। আবারও ইয়েমেনের কর্তৃপক্ষ তা প্রত্যাখ্যান করে। আমাকে হস্তান্তর করার এই যুদ্ধে প্রেসিডেন্ট সালেহ নিজেই জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি আমাকে বললেন,

'আবু জান্দাল, সত্তরটি দেশে তুমি একজন ওয়ান্টেড ব্যক্তি! আমি তোমাকে ভ্রমণ করা থেকে বিরত রাখতে পারি না, এটা তোমার পছন্দ। তুমি যদি ভ্রমণ করতে চাও, তাহলে আমি তোমাকে একটি পাসপোর্ট দেওয়ার অনুমতি দিচ্ছি। কিন্তু এর পরিণতি তোমাকে ভোগ করতে হবে।'

২০০০-এর দশকের শুরুর দিকে ইয়েমেনিরা জিহাদিদের পুনর্বাসনের যে প্রোগ্রামটি চালু করেছিল, তার কথা উল্লেখ না করে আমি এই অধ্যায়ের ইতি টানতে পারি না। আমি এই প্রোগ্রাম হতে লাভবান ব্যক্তিদের একজন। আমি কারাগার থেকে বের হওয়ার চার মাস আগে ২০০২ সালের শেষে এটি শুরু করি।

প্রোগ্রামটিকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূচনা হয়েছিল। গোয়েন্দা সংস্থা প্রোগ্রামটি পরিচালনা করত। এটির দুর্বলতাও ছিল—এতে বিষয়বস্তুর অভাব ছিল এবং কারাগারের পরিবেশে এই প্রোগ্রাম চালানো একটি ভুল ছিল। জিহাদিদের মন-মানসিকতা পরিবর্তন করা সম্ভব হবে যদি এবং কেবল যদি সেই ইমামরা তাদের নিষ্ক্রিয় করার উদ্যোগ নিতেন যারা তাদের জিহাদে প্রেরণ করেছিলেন। এমনকি ইমাম হিসাবে ছদ্মবেশি গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের আল-কায়েদার ভেটেরানদের নজরে কোনো গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। আরও ভালো হতো যদি তাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হতো। ফলে তারা সমাজে পুনরায় মিশতে পারত। আল-কায়েদার একজন সদস্য যদি অন্যান্য আরও দৃঢ় প্রত্যয়ী সদস্যদের সাথে মেশে তাহলে সে তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে পারে। জিহাদ বলতে কিছু নেই এবং জিহাদ পুরোপুরি শেষ—তাকে কেবল এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। তারা এ কথা কীভাবে বিশ্বাস করবে, যখন তারা নিজের চোখেই ফিলিস্তিন, ইরাক ও আফগানিস্তানকে দখল হতে দেখছে।

জিহাদিদের প্রতি সূক্ষ্মভাবে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ, জিহাদের যে আরও ধরন রয়েছে তা তাদের বুঝিয়ে বলা। যেসকল ব্যক্তিদের গুয়ান্তানামোতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং আমেরিকানদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিল তাদের পুনর্বাসন করা আমার চেয়ে আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

হ্যাঁ, আমি আমার অতীত জীবনকে মিস করি; তা ছিল রোমাঞ্চকর। বেকারত্ব, পুলিশের নজরদারি এবং আমার নিজের দেশেই নির্বাসিত হয়ে থাকা—এসব মিলিয়ে

বিগত সাত বছর খুব কঠিন ছিল। কিন্তু এত কিছুর পরেও আমাকে আল-কায়েদা ছেড়ে দিতে হয়েছিল, কারণ আমি নিজের ভেতরেই বন্দি হয়ে গিয়েছিলাম। জীবনের অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য আমাকে আমার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল।

আজকালও আমি নজরদারিতে আছি। কিন্তু দিন দিন আমার ওপর নজরদারি কমছে। আমি আমার এলাকার সকল গোয়েন্দা অফিসারকে চিনি। তারা নিশ্চিত যে আমার পূর্বের জীবনে ফিরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। কিন্তু এখনও প্রতি মাসে আমাকে একটি ফর্মে স্বাক্ষর করতে হয় যাতে শর্ত দেওয়া আছে যে আমি সানাআ ছেড়ে যেতে পারব না।

আমি আমার অতীত এবং জিহাদে কাটানো আমার পনেরো বছর—কোনোটাই অস্বীকার করতে পারি না। আমি বিন লাদেনের রাজনৈতিক এজেন্ডার নির্দিষ্ট কিছু পয়েন্ট সমর্থন করি, উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকার সৈন্যদের আরব উপসাগর ছেড়ে চলে যাওয়ার বিষয়ে তার জেদ। কিন্তু আল-কায়েদার পরিচালিত হামলায় অসংখ্য সাধারণ নাগরিকের মৃত্যুর জন্য তিনিও দায়ী।

আমার আচরণের সাথে আমার দৃষ্টিভঙ্গিও একশ আশি ডিগ্রি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। আমি যদি বিশ বছর অতীতে যেতে পারতাম, তাহলে আমি আবার একই কাজগুলো করতাম না। আমার প্রথম দুই সন্তানের জন্মের সময় আমি আমার পরিবারের সাথে থাকতে পারিনি। কান্দাহারে হাবিব যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন আমি সোকোত্রায় আল-কায়েদার এক মিশনে ছিলাম। আর যখন আবরার ভূমিষ্ঠ হয় তখন আমি কারাগারে।

আমি অবশ্যই অন্য এক জীবন বেছে নিতাম। আমরা কিছু গুরুতর ভুল করেছিলাম এবং তার প্রতিকূলতা ইসলামি বিশ্বে আজও অনুভূত হয়। আমার পরিবার দীর্ঘদিন আমার প্রতি খুব শীতলতা অবলম্বন করেছিল। আমি তাদের অনুমতি ছাড়াই তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম।

আমি সানাআর কারাগারে থাকাকালীন আমার বাবা আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। আমি বলেছিলাম,

'বাবা, আমাকে ক্ষমা করে দিন! আপনি কি আমার ওপর এখনো রেগে আছেন?'

'না, আমি রেগে নেই। তবে সেটা তোমার পছন্দ ছিল এবং এখন তোমাকে তোমার দায়িত্ব ও পরিণতি মেনে নিতে হবে।'

ঊনবিংশ অধ্যায় : ইরাক

আমি জেল থেকে বের হওয়ার কয়েক মাস পরে ২০০৩ সালে আমেরিকা যখন ইরাকে আক্রমণ করে তখন আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করে মুসলিম ভূমি রক্ষার কথা ভাবিনি। একজন ন্যাশনাল সিকিউরিটি অফিসার আমাকে একবার জিজ্ঞেস করল,

'আবু জান্দাল, ইরাকে জিহাদে যাচ্ছ না কেন?'

'কারণ ইরাকিরা আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে। আমরা সেখানে গেলে কেবল নৈরাজ্যই হবে।'

প্রায় আটচল্লিশটি ইসলামি সংগঠন ইরাকি প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেয়। আটচল্লিশ সুন্নি গ্রুপ! আমি কেন এ যুদ্ধে যাচ্ছি? শিয়াদের বিরুদ্ধে, যারা নিজেরাও মুসলিম?

ইরাক যুদ্ধ ছিল আফগানিস্তান থেকে অনেক ভিন্ন। সেখানে একটা নির্দিষ্ট নেতৃত্ব ছিল। একটাই ইমারাহ ছিল, যার ছিল একটিমাত্র সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। তারা সেটাই অর্জন করতে বদ্ধপরিকর ছিল।

যদি আবু মুসআব আল-যারকাবির পরিবর্তে আমাকেও বলা হতো আল-কায়েদা ইন ইরাকের নেতৃত্ব দিতে, আমি অস্বীকৃতি জানাতাম। আফগানিস্তানে থাকাকালীন আমি যারকাবিকে চিনতাম। তিনি নিজেই বলেছেন তার আর নতুন যোদ্ধার প্রয়োজন ছিল না। তার কেবল অর্থনৈতিক সাহায্য দরকার এবং তার সঙ্গী ও তার নিজের জন্য অনেক বেশি দুআ দরকার ছিল।

তবে আমি তার এজেন্ডার বিরোধী ছিলাম। তিনি শিয়াদেরকে নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকতেন, অথচ তার উচিত ছিল আমেরিকার দখলদারিত্বের দিকে বেশি নজর দেওয়া। তার এ নীতির আমি কঠোর সমালোচনা করতাম। আল-কায়েদার একেবারে কেন্দ্রীয় ও দলীয় মূলনীতির সাথে এ ধর্মীয় দলাদলি সাংঘর্ষিক।

আমার কাছে অনেক তরুণ আসত। তারা জানতে চাইত দুই নদীর দেশে [অর্থাৎ ইরাক] তারা কীভাবে জিহাদে অংশ নেবে। প্রথমদিকে আমি তাদের ধৈর্য ধারণ করার পরামর্শ দিতাম।

'একটু অপেক্ষা করো আর দেখো আমেরিকার আক্রমণের ফলাফল কী হয়। সাদ্দাম হুসেইন ও তার অনুসারীরা এত সহজে এই রাজনৈতিক দৃশ্যপট ছেড়ে চলে

যাবে না। তারা কী করে তা দেখা যাক। আর ইরাকিরা কি আদৌ চায় আমরা তাদের সাহায্য করি? সেটাও দেখতে হবে।'

আর আমার কাছে যেসকল তরুণরা আসত এদের বয়স ছিল অনেক কম, তাদের জ্ঞানও ছিল কম এবং কোনোপ্রকার সামরিক অভিজ্ঞতা ছিল না। আমার মনে হয়েছিল তারা সেখানে গেলে আসলে ইরাকিদের কোনো উপকার হবে না। বরং তারাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

একটি গ্রুপ এসে বলল আমি যেন তাদের অস্ত্রচালনা শিক্ষা দিই। আমি রাজি হইনি।

কিছুদিন পরে ইরাকের অবস্থা অনেকাংশে পরিবর্তন হয়ে যায়। আমেরিকার সমস্যা কেবল বাড়তেই থাকে। তারা কুলিয়ে উঠতে পারে না। আর প্রতিরোধ সংগঠনও আরও বেশি সংগঠিত হয়ে উঠতে থাকে। শেষমেশ এক নতুন আল-কায়েদার উত্থান হয় যার নেতা ছিলেন আল-যারকাবি এবং তিনি হয়ে উঠে ওসামা বিন লাদেনের একজন প্রতিনিধি। তবে তা ছিল সাদ্দামের পতনের দুবছর পরের ঘটনা।

এসময়টাতে ইরাকের ইসলামিস্ট গ্রুপগুলো বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলোতে বার্তা পাঠায় যে তাদের কিছু দক্ষ ও যোগ্য সৈন্য দরকার, কোনো আনকোরা নতুন জিহাদি না। ২০০৪ সালে ফাল্লুজাহর অবরোধের সময় সেখানকার যোদ্ধারা আবার জানান দেয় যে তাদের নতুন যোদ্ধার কোনো প্রয়োজন নেই।

আরও সমস্যা ছিল। ইরাক যাওয়ার রাস্তা ছিল অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। যদিও সিরিয়া আমেরিকার বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান জানান দিয়েছিল, তবুও অনেক দালাল অনেক জিহাদিকে পুলিশে ধরিয়ে দিত। তারপর পুলিশ তাদের আমেরিকার হাতে তুলে দিত। একই কাজ জর্ডানেও হতো। সেখানকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর সাথে যুগপৎ কাজ করত। আজকাল একই কাজ আমরা আফগানিস্তানেও হতে দেখছি। ভবিষ্যৎ জিহাদিদের অনেক সচেতন হতে হবে।

এজন্য আমি তরুণদেরকে জিহাদে না গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে বলি, নিজেদের জ্ঞান বাড়ানোর জন্য।

তদুপরি ইরাকি উদ্দেশ্যের ন্যায্যতার বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী অনেক ইয়েমেনি আমার সাথে দেখা করতেই আসেনি। কিন্তু তারা নিজেদের ইচ্ছায় সরাসরি সেখানে গিয়েছিল।

আজকাল আমার জন্য জিহাদ হলো মানুষকে সচেতন করা, তাদের ধারণাগুলো স্পষ্ট করা এবং সারা বিশ্বে ও আরব-মুসলিম ভূমিগুলোতে আসলে কী চলছে তা তাদের দেখানো। অন্ধবিশ্বাসী ইসলামি গ্রুপগুলো এখন আর গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের পরিস্থিতি ও জিহাদের ভূমিগুলোর বাস্তবতা বুঝতে হবে। জিহাদের অন্যতম একটা শর্ত হলো, যে দেশ আক্রান্ত হয়েছে সে দেশের মুসলিমরা অন্য মুসলিমদেরকে সাহায্যের আহ্বান করবে। জিহাদিদের দায় না নিজে নিজে গিয়ে সাহায্য করা।

আল-কায়েদা আন্দোলনের অন্যতম একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তরুণরা। তারা অনেকে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে উঠে যাচ্ছে। ইয়েমেনের কথাই ধরা যাক। এদের অনেকেই আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় আল-কায়েদার আদর্শ সম্পর্কে সন্দিহান। অনেকে তো জানেই না তাদের আদর্শ সম্পর্কে। মানহাজ পরিষ্কার না তাদের।

আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় মূলনীতি-আদর্শ কী? একটি প্রতিক্রিয়া হলো, যদি আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিমদেরকে হত্যা করে, তারা যদি মুসলিম ভূমি দখল করতে আসে, তাহলে আরবদেরকে ও মুসলিমদেরকে উঠে দাঁড়াতে হবে সেই একমাত্র সংগঠনের পক্ষে যারা মুসলিম বিশ্বে কাফের পশ্চিমাদের দখলদারিত্ব ধ্বংসে কাজ করে যাচ্ছে—আল-কায়েদা।

আল-কায়েদার প্রথম প্রজন্মের একজন সদস্য হওয়ায় আমি এখনো অনেক গর্ববোধ করি। আমি আফগানিস্তানে বিন লাদেনের পাশেই ছিলাম সবসময়। আমি জানতাম কেন আল-কায়েদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার মূল্যবোধগুলো কী ছিল। কিন্তু আজকে ইয়েমেনের মুজাহিদদের সৌভাগ্য হয়নি আফগানিস্তানে আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা তারা যেখানেই আছেন সেখানকার নেতৃত্বের সাথে সাক্ষাতের।

'৯০-এর দশকের শেষদিকে যখন নতুন কেউ কান্দাহারে কিংবা আল-কায়েদার কোনো ক্যাম্পে আসত আমি তাদের জিজ্ঞেস করতাম, "কেন এসেছ?"

যারা আসলেই যুদ্ধক্ষেত্রের রাজনৈতিক ও আদর্শিক অবস্থান বুঝত কেবল তাদেরই আমি প্রশিক্ষণের জন্য পাঠাতাম। যারা আমাদের আন্দোলনের আলফা-ওমেগাও জানত না, তাদের আগে আমি দীন ও রাজনৈতিক বুঝ দেওয়ার চেষ্টা করতাম। তারপর তাদের অস্ত্র ধরতে বলতাম।

আমি একই কাজ করেছি যখন ২০০৩-০৪ সালের দিকে আল-কায়েদা সদস্যরা আমার সাথে দেখা করতে আসত। আমি তাদের ধারণাগুলো স্পষ্ট করার

চেষ্টা করতাম। দুঃখজনকভাবে, আমি এসব বলায় তারা মনে করতে শুরু করে যে আমি তাদের বিরোধী। তারা আমার সব কথা প্রত্যাখ্যান করেছে।

আমি এ ধরনের তরুণদেরকে ডাকি 'ইন্টারনেট যোদ্ধা'। তারা আসলেই কিছুই জানে না। একদিন আল-কায়েদা ইন ইয়েমেনের এক সদস্য আমাকে বলল, "আপনি কি আবু মুসআবকে চেনেন? যিনি Alhesbah.org-তে লিখেন?"

"আমি কাছ থেকে বা দূর থেকে কোনোভাবেই তাকে চিনি না। সে কি খ্রিস্টান? ইহুদি? একজন ইন্টালিজেন্স অফিসার? আমাকে সাইটটা সম্পর্কে বলো।"

Alhesbah.org হলো একটি ইন্টারনেট সাইট। তারা দাবি করত তারা মুজাহিদদের পক্ষের শক্তি এবং এটা প্রায় ৫ বছর ধরে চলেছে। আমেরিকার 'সুনজর' পড়া ছাড়া কীভাবে এমন একটা সাইট এতদিন ধরে চলতে পারে? আমি আমার তরুণ বন্ধুকে আমার এ সন্দেহের কথা জানালাম।

আমি বলছি না সব তরুণরাই 'ভার্চুয়াল যোদ্ধা'। তারা জিহাদকে ভয় পায় না। তবে এই দায়িত্ব গ্রহণের ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য তাদের নিজেদের ভয় দেখানোর কারণ খুঁজতে হবে! তাদের বরং জিহাদের সত্যিকার অর্থ বোঝার দিকে নজর দেওয়া উচিত। তাদের উচিত যেকোনো উপায়ে ইসলামের সেবা করা—হোক তা যুদ্ধক্ষেত্রে বা তার বাইরে। ইন্টারনেটে ঠাট্টা মশকরা আসলে সত্যিকার জিহাদ না। এমন ভিডিও দেখে আনন্দিত হওয়া, যেখানে কয়েকজন যোদ্ধা কালাশনিকভ থেকে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ছে আর পেছন থেকে কিছু মানুষ জিহাদি নাশিদ গাইছে। এ ধরনের প্রোপাগান্ডা কখনোই বিশ্বাসযোগ্য না।

জিহাদের সীমা আছে, অবস্থান আছে। আমি সোমালিয়ায় এ বাস্তবতা বুঝতে পেরেছি। কয়েক বছর আগে জেলে থাকা অবস্থায় ও তার পরে আমি বিষয়টার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলাম। আল-কায়েদা ইন ইয়েমেনের অনেক সদস্য আমাকে গুনাহগার হিসেবে দেখত, কেননা আমি পশ্চিমা ফ্যাশনের ট্রাউজার পরতাম।

অনেকে আমাকে আমেরিকার চর হিসেবে দেখত, কারণ আমাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। গোয়েন্দা পুলিশ কিছু প্রাক্তন বন্দি জিহাদিকে ফলো করছিল। আমি সেই জিহাদিদের হয়ে হস্তক্ষেপ করতে রাজি হই, যাতে করে কর্তৃপক্ষ তাদের ভুল না বুঝতে পারে। আমি পিএসও-এর প্রধান গালিব আল-কামেশের সাথে একটি মিটিংয়ের ব্যবস্থা করি যেন জিহাদিরা তাকে স্পষ্ট করে বলতে পারে যে তারা সহিংসতা ত্যাগ করেছে। কিছুদিন পরে এ মানুষগুলোই আমাকে গোয়েন্দা হওয়ার অপবাদ দিল, কারণ আমার সাথে আল-কামেশের যোগাযোগ আছে! কী যুক্তি!

মনে রাখা দরকার যে অনেকেই আছে যারা তরুণ জিহাদিদের রিক্রুট করাকে তাদের অর্থ উপার্জনের পথ বানিয়ে নিয়েছে। যখনই আমি এমন কিছু তরুণকে ইরাকে যেতে নিষেধ করলাম বা জিহাদ করতে অন্য কোথাও যেতে বললাম, আমি তাদের পথের কাঁটা হয়ে গেলাম। ইয়েমেন ও আফগানিস্তানে ট্রানজিটের জন্য দালালরা মাথাপিছু ১৩০ ডলার করে নিত। যদি তারা এভাবে ১০০ জন জিহাদিকে সাহায্য করত তাহলে তাদের পকেট ফুলে ফেঁপে উঠত। আমি তাদের কাজকে বলি 'জিহাদ ব্যবসা'। আমি এমন অনেককে চিনি, যারা নিজেদেরকে জিহাদি দাবি করে, কিন্তু তারা আসলে মানবপাচারকারী—এর বেশি কিছুই না। এ ধরণের লোকেদের নিজস্ব বাড়িগাড়ি, ব্যবসা হয়ে যায়। তারা ব্যবসায়ী। কিন্তু তারা নিজেদের বলে মুজাহিদিন।

দিনশেষে জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সবসময় একই। কিছু জিহাদি মাঝেমধ্যে একে ভুলভাবে উপস্থাপন করে। জিহাদ ইসলামে সালাত ও সিয়ামের মতোই ফরজ। অন্য ইবাদাতের মতোই এরও কিছু নিয়ম ও শর্ত আছে। যদি জিহাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সঠিক থাকে, তাহলে এটাই একমাত্র পথ। যদি না হয়, তাহলে এ কেবলই ভণ্ডামি।

আমি মনে করি আলেমদের উচিত ৭০০ বছর আগের ফতোয়াগুলোকে বর্তমান সময়ের সাথে মিলিয়ে উপস্থাপন করা। বিশেষ করে জিহাদ এবং ইহুদি-খৃস্টানদের সাথে আমাদের সম্পর্কের বিষয়গুলো। শিয়ারা আমাদের চেয়ে কিছু দিকে এগিয়ে আছে। আমাদের বর্তমান তরুণ প্রজন্মের সামনে ইসলামকে আরও সুন্দরভাবে তুলে ধরা উচিত।

অন্য ধর্মগুলোর সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ইসলামের অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। মদীনা এবং মুসলিমবিশ্বে ইহুদিরা মুসলিমদের সাথে অনেক বছর একসাথে কাটিয়েছে। ইসলামে অসহিষ্ণুতার স্থান নেই, বরং তা ইসলামের চেহারাকে নষ্ট করে। কাফের হওয়াটা অপরাধ নয়, সেটা ইহুদি-খৃস্টান-নাস্তিক যাই হোক না কেন।

২০০৭ সালে মদীনার পাশে পিকনিকে আসা চারজন ফরাসিকে হত্যা করা হয়. হামলাকারীদেরকে যখন পুলিশ জিজ্ঞেস করল, কেন তারা তাদের হত্যা করল, তারা জবাব দিল, "কারণ তারা ইউরোপিয়ান!"

কী বিপর্যয়!

বর্তমান তরুণ জিহাদিদের অনেকেই যে ইসলামের মৌলিক মূলনীতি বোঝে না তার আরও একটা উদাহরণ দিই। বসনিয়ায় আমরা ১৪ জন সার্ব অফিসারকে আটক করি। তাদের একজন সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল, হয়তো ভয়ে। যাই হোক না কেন, যেকোনো নও-মুসলিমকে হত্যা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। যদি এমন আশঙ্কাও থাকে যে, সে আমাদের জন্য ক্ষতিকর হবে, তাও। আমি তাকে মুক্ত করে দিলাম, কিন্তু আমার সাথের অনেক তরুণ জিহাদি তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। আমি সে অফিসারের সাথে কিছু মুজাহিদকে পাঠিয়েছিলাম রাস্তায় অন্য জিহাদিদের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষার করার জন্য।

১৯৯৪ সালে বসনিয়া যাওয়ার পথে সানাআয় থাকাকালীন কিছু যুবক একজন ইউরোপিয়ানকে অনুসরণ করে তার টুঁটি চেপে ধরে ও তার অর্থ সম্পদ নিয়ে নেয়। তারা আমাকে কল করে বলে,

"আমরা জিহাদ করে ফেলেছি! আমরা তাকে পিটিয়ে তার টাকা নিয়ে নিয়েছি!"

"তো তোমরা তার স্ত্রীকে দাসী হিসেবে নিলে না? তাকে হত্যা করে ফেললে না কেন?" আমি তাদের জবাব শুনতে উদগ্রীব ছিলাম।

"এটা তো জায়েজ হবে না। আমরা তার স্ত্রীকে নিতে পারব না, তাকে হত্যা করতে পারব না।"

"কেন না? তার টাকা নেওয়া জায়েজ কিন্তু তাকে মেরে ফেলা আর তার স্ত্রী নেওয়া হারাম? তোমরা আসলে চোর। এসব জিহাদ না। তোমরা জিহাদের কথা বলে চুরি করেছ।"

কিছু চর ও দুর্বৃত্ত জিহাদ ও মুজাহিদদের নাম খারাপ করার জন্য আলজেরিয়ায় জিহাদের নামে মুসলিম মেয়েদের অপহরণ করত। তারা তাদের সাথে দাসীর মতো আচরণ করা করত, ধর্ষণ করত। এছাড়াও আলজেরিয়ায় জিহাদের নামে আফগানিস্তান থেকে সবে ফিরে আসা মুসলিমদের হত্যা করা হয়েছিল। কেউ এমন কাজ করার পর কীভাবে নিজেকে একজন ভালো মুসলিম বলে দাবি করতে পারে? আমাদের এসব কাজের বিরুদ্ধে সরাসরি কথা বলা উচিত, যাতে করে জনসাধারণ সত্যটা জানতে পারে। আর কেউ যেন জিহাদ ও মুজাহিদদের নামে চুরি, ধর্ষণ করতে না পারে।

আফগানিস্তানে আমি নতুন যোদ্ধাদেরকে একটি প্রশ্ন করতাম,

"তোমার সামনে যদি কোনো শত্রু যোদ্ধা আসে এবং বলে, 'আমার মনে হয় না আমার তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত' সেক্ষেত্রে তোমরা কী করবে? একজন মুসলিম যোদ্ধার কী করা উচিত?"

অনেক যুবক বলত তাকে খুন করা উচিত। কিন্তু ইসলাম বলে তাদের নিরাপত্তা দিতে।

আল-কায়েদার কয়েকটা সমস্যার মধ্যে একটা হলো এর রিক্রুটমেন্ট মেকানিজম। সংগঠনের উচিত আরও সতর্কতার সাথে জিহাদিদের বাছাই করা।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে, কোনো আগ্রহী জিহাদিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। সেখানে আগ্রহীদের দীনি, সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান, সামর্থ্য ইত্যাদি অনুযায়ী ক্যাটাগরি করা উচিত। এ যুবকরাই একদিন আল-কায়েদার নেতা হবে। বেশিরভাগই নিজেদের দেশে ফিরে গিয়ে লোকাল ব্রাঞ্চ বা স্লিপার সেল গঠন করবে। সে যদি বেশি তরুণ হয়, আফগানিস্তান থেকে কোনো প্রকার সঠিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা না পেলে এ জিহাদিরা কোনোদিন ভালো নেতা হতে পারবে না।

যে কাউকেই সংগঠনে ঢোকানোর এ পলিসি আল-কায়েদার ক্ষতি করেছে। সৌদি আরব আল-কায়েদার অন্যতম কাজের ক্ষেত্র এবং এখানেই কিছু ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। রিয়াদসহ বিভিন্ন জায়গায় এদের কাজের কী অবস্থা? এরা পুলিশ স্টেশনে হামলা করেছে, কিছু সাধারণ নাগরিকও মারা গিয়েছে। সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই এর কারণে আল-কায়েদার ওপর বিরক্ত হয়েছে, অনেকে সরাসরি আল-কায়েদার সমালোচনা করছে।

বিন লাদেন বারবার করে বলেছেন যে আমাদের আক্রমণ হবে আরব ভূমিতে থাকা আমেরিকান সৈন্য এবং স্বয়ং আমেরিকা রাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে, যেন আমরা রাষ্ট্রটির পতন ঘটাতে পারি। আল-কায়েদার ইয়েমেন ব্রাঞ্চ এবং সৌদি ব্রাঞ্চ আরব সরকারের বিরুদ্ধেই লড়াই করা শুরু করেছে। এটা কোনোভাবেই ইতিবাচক না। বিন লাদেনের আসল লক্ষ্যের দিকে যদি তারা অগ্রসর হতো তাহলে সৌদির সাধারণ মানুষ আল-কায়েদার বিরুদ্ধে না গিয়ে বরং তাদের সমর্থন করত। আমি মনে করি না আফগানিস্তানে আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এসব করার আদেশ দিয়েছে। কেননা এভাবে সে দেশের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং এদেশ ওসামা বিন লাদেনের ভীষণ ভালোবাসার দেশ। আমি প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি, আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে এসব ব্রাঞ্চের তেমন কোনো যোগাযোগই নেই।

বিংশ অধ্যায় : আল-কায়েদার অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ

আল-কায়েদা কোনোভাবেই একটি একনায়কতান্ত্রিক সংগঠন নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আল-কায়েদার শূরা, সাধারণ সদস্য এবং নেতৃত্বের মধ্যে বিশদ আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হয়। আমি ৩ বছর আল-কায়েদায় ওসামা বিন লাদেনের পাশে ছিলাম। সেসময় বিভিন্ন ইস্যুতেই প্রশ্ন করা হতো, আলোচনা-সমালোচনা হতো, নেতাদের মধ্যে আল-কায়েদার বিভিন্ন কৌশল, যুদ্ধের পলিসি নিয়ে আলোচনা করা হতো। সব সিদ্ধান্ত হতো পরামর্শভিত্তিক।

আমাদের মধ্যকার যে আলোচনাগুলো সবচেয়ে বেশী বিতর্কের জন্ম দিত তার মধ্যে একটা হলো টার্গেট নিয়ে, সাধারণ নাগরিক হত্যা কী বৈধ? বিশেষ করে তাদের মধ্যে যদি মুসলিম থাকে। নাইরোবি এবং দারুস সালামে আক্রমণের পরে বিন লাদেনের কাছে এ প্রশ্ন তুলে ধরা হয় আমিও এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলাম তাকে। তিনি জবাবে বললেন,

"বিশ বছর বয়সে একজন ব্যক্তি এমন সব কাজ করে যার জন্য ত্রিশ বছর বয়সে গিয়ে সে আফসোস করে। ত্রিশ বছর বয়সে সে এমন সব কাজ করে যার জন্য সে চল্লিশ বছর বয়সে গিয়ে আফসোস করে। আজ আমি জানি না ষাট বছর বয়সে আমি আমার কোন কাজগুলোর জন্য আফসোস করছি। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি একই ভুল বারবার না করার শিক্ষা নিতে পারে।"

আল-কায়েদার অনেকেই যখন এ তর্ক উঠাচ্ছিল, বিন লাদেন দেখলেন এ আলোচনা অনেক রটে গিয়েছে, তিনি বিতর্কের ক্ষেত্র বাড়িয়ে দিলেন,

"আপনারা হিসেব করেছেন আমেরিকার হাতে কতো মুসলিম নিহত হয়েছে? এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। পৃথিবীর দেখা উচিত যে আমরাও প্রতিশোধ নিতে জানি।"

তারপর তিনি একটি কবিতার কিছু পঙক্তি বলেন, তার সারমর্ম অনেকটা এমন:

"যখন আলোচনার টেবিলে আপনার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করে দেওয়া হয়, তখন কথা বলতে হয় অস্ত্রের ভাষায়।"

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আল-কায়েদার নেতারা এই কথা বলতে দ্বিধা বোধ করতেন যে তারা নির্দোষ মানুষদের হত্যা এড়াতে চাইলেও অনেকসময় তাদের হাতে কোনো

বিকল্প থাকে না। তাদের প্রধান টার্গেট আমেরিকানরা হলেও, হামলায় যদি বেসামরিক লোকেরাও মারা যায় তবে তা অনৈসলামিক না। মাঠ পর্যায়ের সদস্যরা অবশ্য বেশিরভাগই ছিল অশিক্ষিত বা কম শিক্ষিত। তারা আল-কায়েদার নীতি বা কৌশল সম্পর্কে খুব একটা ভাবত না, আর যদি ভেবেও থাকে তবে তা ছিল ক্ষণকালীন।

সবচেয়ে বেশি আলোচনা-সমালোচনা হতো উপরের স্তরে। আমিও তাদের একজন ছিলাম। কিন্তু আমরা আমাদের সমালোচনা ও চিন্তাগুলো প্রকাশ হতে দিতাম না। আমার কিছু বন্ধু ও সহযোগী কখনো তাদের চিন্তাগুলো শায়খের সামনে তুলে ধরার সাহস করেনি। এবং এসব আক্রমণ আল-কায়েদার অপারেশনের ক্ষমতা প্রদর্শন করে এবং তা দেখে অনেক নতুন রিক্রুট আসে। কেউই চায় না সংগঠনে কোনো প্রকার বিভক্তি সৃষ্টি করতে।

বিন লাদেনের আক্রমণগুলো ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করার প্রয়াসেও একধরনের যুক্তি ছিল; কেনিয়ার মার্কিন দূতাবাস রোয়ান্ডার গণহত্যার সাথে জড়িত ছিল। একইসাথে এটি আঞ্চলিক সিআইএ-র ঘাঁটি ছিল, তার পাশাপাশি এটি ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চেস (World Council of Churches)-এর সদর দপ্তরের আবাসনও ছিল।

কীভাবে একটি আক্রমণ চালানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অংশটি স্বয়ং আক্রমণকারীদের সাথেই জড়িত ছিল—এই বিষয়টি আমি বুঝতে পেরেছিলাম। এই বিকেন্দ্রীকরণও (decentralization) এর জন্য দায়ী। উদাহরণস্বরূপ, নাইরোবিতে তারা যদি সন্ধ্যায় আক্রমণ চালাত, যখন সেখানে খুব কম মানুষ উপস্থিত ছিল, তবে বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা কম হতো।

মাঝেমধ্যে কেউ যখন বলত, "সাধারণ মানুষ হত্যা করা উচিত হবে না", আমি বিন লাদেনের চোখে আফসোস দেখতে পেতাম, যদিও তার কাছে এর জবাব ছিল। আমাদের মনে হতো তিনি নিজেও পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিলেন না। সংগঠনের নেতা হিসেবে তার ত্যাগ ও একাগ্রতা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারবে না। তিনি নিজেই সকল আক্রমণের দায়ভার গ্রহণ করতেন। সাংগঠনিক পেশাদারত্বের জায়গা থেকে তিনি প্রকাশ্যে মিডিয়ায় তার আফসোসের কথা জানাতে পারেন না, এবং যুদ্ধের অনিবার্য এসব বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে সমালোচনামূলক আলোচনা করতে পারেন না।

অভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের মধ্যে সাইফ আল-আদেল বিষয়গুলোতে অনেক বাস্তববাদী থাকার চেষ্টা করতেন। তিনি সাধারণ মানুষের মৃত্যুতে কম প্রভাবিত হতেন। আয়মান আল-জাওয়াহিরি এসব বিতর্কিত বিষয়ে চুপ থাকতেন। এ বিষয়ে সবচেয়ে স্পর্শকাতর ছিলেন মুহাম্মদ আল-মাসরি। যদিও দূতাবাস হামলার মূল হোতা তিনিই, কিন্তু তিনি সাধারণ মানুষকে আক্রমণের বিরুদ্ধে ছিলেন।

“আমেরিকানরা আজ পর্যন্ত আমাদের সাথে যেভাবে আচরণ করেছে তার একটুখানি স্বাদ যদি তাদের না দেওয়া হতো তবে ওইসব মানুষ কখনোই মুখ খুলত না,” বিন লাদেন প্রায়ই বলতেন। “মানুষ প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে তুলে সরকারের নীতিতে পরিবর্তন আনতে পারে।”

৯/১১-এর পরে তিনি বলেন, “আমেরিকার সমাজ আমাদের আক্রমণের তিক্ত স্বাদ অনুভব করতে পারছে। কিন্তু আমেরিকা ও ব্রিটেন ঠিকই ইরাকে যুদ্ধ পরিচালনা করছে। যদি সে দেশের জনগণ উঠে দাঁড়ায় এবং এসকল আক্রমণের প্রতিবাদ করে তাহলে সরকারের মানসিকতায় পরিবর্তন আসবে।”

আমি এ সকল যুক্তিতে সন্তুষ্ট ছিলাম না। কিন্তু আমি শায়খ ওসামাকে বিশ্বাস করতাম। তার প্রতি ছিল আমার অগাধ আস্থা। আমি ভাবতাম আমার কী করা উচিত, বিন লাদেনের ওপর আস্থা রাখা, নাকি বিদ্রোহ করা। আমি প্রথমটাই মেনে নিলাম। আমি আমার সমালোচনা নিজের মধ্যেই চেপে রাখলাম।

মাঝেমধ্যে বিন লাদেন আমাদের একটা পরামর্শ দিতেন যেটা আসলে কাজের সাথে বিরোধ তৈরি করত। তা হলো, “ইহুদি-খ্রিস্টানরা তোমার সাথে যেমন ব্যবহার করে তাদের সাথে তেমন ব্যবহার করবে না। তারা যদি মুসলিমদেরকে হত্যাও করে, যুদ্ধের ময়দান ছাড়া মুসলিমরা তাদের হত্যা করবে না। যুদ্ধে তো আমরা অবশ্যই তাদের খুন করব। কিন্তু যেখানে সাধারণ নাগরিকের ব্যাপার আসে, সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই তা এড়ানোর চেষ্টা করব।”

বিন লাদেন ছিলেন আমাদের বাবার মতো। তিনি আমাদের পরামর্শ দিতেন ও সর্বোত্তম আখলাক বা উত্তম চরিত্র অর্জনের শিক্ষা দিতেন। যদি তিনি দেখতেন তার অনুসারীদের কেউ কোনো সহিংস কাজ করছে, যেমন কোনো মুসলিমকে হত্যা করা, তাহলে তিনি তা অনুমোদন করতেন না। তবে কাজের অন্য পন্থা শিখিয়ে দিতেন।

বিন লাদেন লাঠি হাতে কঠোরতার সাথে আল-কায়েদা পরিচালনা করেননি কখনো, যেমন সিরিয়ার হাফিজ আল-আসাদ বা ইরাকের সাদ্দাম হুসেইন করেছে। ১৯৯৬ সালে আমেরিকার বিরুদ্ধে তার জিহাদের ফতোয়া এসেছে ঘন্টার পর ঘন্টা

লম্বা আলোচনার পরে। শুধুমাত্র শুরাই এখানে সিদ্ধান্ত নেয়নি, বরং অন্যান্য কমিটির সাথেও বিস্তারিত কথা হয়েছে—যেমন সামরিক কমিটি।

তিনি সবসময় তাঁর নিকটতম সহযোগী আবু হাফস আল-মাসরি, সাইফ আল-আদেল এবং আয়মান আল-জাওয়াহিরির সাথে একমত ছিলেন না। ১৯৯৬ সালে বাকুতে জাওয়াহিরির সহযোগীর ল্যাপটপ চুরি হয়ে যায়, তখন বিন লাদেন জাওয়াহিরির প্রতি খুবই রাগান্বিত হয়েছিলেন। কম্পিউটারটিতে বিশ্বজুড়ে ইসলামিক জিহাদের প্রত্যেক সদস্যের নাম ছিল। ফলস্বরূপ, একশ ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

'আপনার সহযোগী বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারিতে আছে জানা সত্ত্বেও কেন আপনি তাকে পাঠালেন?' বিন লাদেন জাওয়াহিরির ওপর রেগে গেলেন, যিনি তার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হতে চলছিলেন।

সাধারণত বিন লাদেন ও জাওয়াহিরির মধ্যে ছিল পূর্ণ বিশ্বাসের সম্পর্ক। তবে মাঝে মধ্যে তাদের মধ্যেও মতবিরোধ দেখা দিত। বিন লাদেন সর্বদা আমাদের অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করতেন, যেখানে আল-জাওয়াহিরি তার ধারণা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। বিন লাদেন আমাদের মতামত শুনতেন, যেখানে জাওয়াহিরি কখনও আমাদের কথাই বলতে দিতেন না। মিশরীয় জাওয়াহিরির সাথে আমার বেশ কিছু খোলামেলা আলোচনা হয়েছিল। একবার আলোচনার বিষয় ছিল ইয়েমেন; কিছু ইয়েমেনি উগ্রপন্থী কান্দাহারে এসেছিল এবং আমার উপস্থিতিতে বিন লাদেনকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল,

'ইয়েমেনি ইহুদিদের কেন হত্যা করা হবে না? ইয়েমেনের ইহুদি এবং ফিলিস্তিনের ইহুদিদের মধ্যে তো কোন পার্থক্য নেই!'

বিন লাদেন জবাব দিলেন, 'ইয়েমেনে বসবাসকারী ইহুদিরা ইয়েমেনি! তাদের কেন হত্যা করতে হবে? এর পেছনে তো কোনো কারণই নেই। যদি কাউকে হত্যা করতে চান তবে সেটা আমেরিকান সেনা হওয়া উচিত!'

জাওয়াহিরি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, "না, ইয়েমেনি ও ইসরায়েলী ইহুদিদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমাদের উচিত তাদের সবাইকে হত্যা করা। কোনো প্রকার পার্থক্য গ্রাহ্য করা উচিত না।"

আমি কথা বলা শুরু করলাম কিন্তু জাওয়াহিরি তার গলার স্বর উঁচু করতে লাগলেন। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'পরেরবার আমার কোনো প্রশ্ন থাকলে

আমি অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করব। কারণ, আপনি শুধু চিৎকার করেন এবং কোনো আলোচনা ছাড়াই নিজের ধারণা চাপিয়ে দিতে চান!'

আরেকদিন কয়েকজন জিহাদি বিন লাদেনকে জিজ্ঞেস করল, আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইদের মুক্ত করার জন্য কেন তিনি কখনো ইসরায়েলে আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করেননি। ওসামা জবাবে বললেন,

'ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে হামাসসহ আরও কিছু জিহাদি দল আছে। যদি তারা আমাদের সাহায্য প্রত্যাশা করে তবে আমাদের লোকজন তাদের সাহায্যে ছুটে যাবে। কিন্তু আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো সারা বিশ্বে আমেরিকার স্বার্থে আঘাত করা এবং তারপর ইসরায়েলের প্রতি আমেরিকার সকল সহায়তার পথ বন্ধ করে দেওয়া।'

বিন লাদেনের মতে, আমেরিকা যদি আহত হয় তবে তার প্রভাব ইহুদি রাষ্ট্রের ওপরও পড়বে। শায়খের কাছে ফিলিস্তিনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু ইসরায়েলী দখলদারির বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের লড়াইয়ের চেয়ে সৌদি আরবে আমেরিকার উপস্থিতি নিয়ে তিনি বেশি কথা বলতেন।

বিন লাদেন হামাসের সুইসাইড অভিযানগুলোর পক্ষে ছিলেন। কারণ তিনি বলেছেন, ইসরায়েল কেবল একটি ভাষাই বুঝে, ক্ষমতার ভাষা। তিনি মাঝেমধ্যে ইয়াসির আরাফাত সম্পর্কে ভালো ভালো কথা বলতেন। কিন্তু তার মতে, ইয়াসির আরাফাত একজন খাঁটি আরব জাতীয়তাবাদী।

বিন লাদেন জনসম্মুখে তার ভাষণ এবং বার্তায় ইসরায়েল, জায়োনিজম এবং ইহুদিদের ক্ষেত্রে যে অবস্থান নিয়েছিলেন, ব্যক্তিগতভাবে এসব বিষয়ে তার অবস্থান ছিল ভিন্ন। এটা সত্য যে তিনি দাবি করেছিলেন 'আপনি ইহুদিদের যেখানেই খুঁজে পাবেন, তাদের মধ্যে আদর্শের অভাব দেখতে পাবেন'। কিন্তু তিনি এটাও মানতেন যে কিছু ইহুদি আছে যারা আমাদের সাথে যুদ্ধরত এবং কিছু আছে যারা শান্তি চায়। তিনি বলেছেন যে ইহুদিদের সাথে আমাদের আচরণ হওয়ার উচিত তাদের ব্যক্তিগত অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন। তিনি মনে করতেন না পৃথিবীর সকল ইহুদি কেবল ইহুদি হওয়ার দরুন অটোম্যাটিক্যালি আমাদের টার্গেটে পরিনত হয়।

একদিন আবু মুসআব আল-যারকাবির গ্রুপের একজন ফিলিস্তিনী বিন লাদেনকে জিজ্ঞেস করল,

"ফিলিস্তিন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলে আপনি ইহুদিদেরকে নিয়ে কী করবেন?"

"কিছুই না," তিনি জবাব দিলেন। "ইহুদিরা ফিলিস্তিনে দীর্ঘ সময় আমাদের সাথে একসাথেই থেকে এসেছে। অটোম্যানদের সময়েও। আমি কিছুই করব না। মুসলিম, ইহুদি ও অন্য ধর্মের সহাবস্থান সম্ভব। কিন্তু কেউ যদি কখনো তাদের না এমন কিছুতে হাত দেয়, তাহলে আমি সেই হাত কেটে ফেলছি ও জিনিসটি তার আসল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেছি।"

অন্যদিকে তিনি ভাবতেন, জায়োনিজম হলো ইসরায়েল রাষ্ট্রের মূল আদর্শ, শক্তি। এ আদর্শের সাথে লড়াই করতেই হবে। শুধু ইসরায়েলেই না, বরং যেখানেই জায়োনিজম পাওয়া যাবে সেখানেই লড়তে হবে এর বিরুদ্ধে। হোক তা আমেরিকা, ইউরোপ বা অন্য কোথাও।

একবার আমি বিন লাদেনকে জিজ্ঞেস করলাম, "লেবাননের হিজবুল্লাহ বা আমালের মতো শিয়া গ্রুপগুলোর ব্যাপারে আপনার ধারণা কী?"

'আমাদের মূল কাজে নজর দিতে হবে। তা হলো আমেরিকা এবং এর সামরিক বাহিনীর সাথে লড়াই করা। আমাদের যুদ্ধের সাথে হিজবুল্লাহ ও আমালের কোনো সম্পর্ক নেই। সেজন্য আমরা তাদের এড়িয়ে যাচ্ছি।'

জাওয়াহিরি তার পাশেই ছিলেন। কিন্তু কিছু বলেননি। বিন লাদেনের বিরোধিতা করার সাহস তিনি দেখাননি। তবুও এ ব্যাপারে তার অবস্থান কী ছিল তা সবাই জানত—লেবানিজ শিয়া আন্দোলনকারীরা কাফের এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত।

কাগজে-কলমে আল-কায়েদা এবং ইরান ছিল পরস্পর শত্রু—তেহরান নিজেকে বিশ্বের শিয়াদের রক্ষাকারী হিসাবে ভাবতে পছন্দ করে, যাদেরকে আবার আল-কায়েদা ধর্মবিরোধী বলে বিবেচনা করে—তবে জিহাদিদের ইরানের মধ্য দিয়ে দিয়ে ভ্রমণ করতে হয়। তেহরানের সাথে আল-কায়েদার এক প্রকার সমঝোতায় আসতে হয়েছিল। ইরানকে আল-কায়েদার প্রয়োজন।

সর্বোপরি, দুপক্ষেরই একটি কমন শত্রু ছিল; আমেরিকা। আল-কায়েদা অতীতে ইরানের সমর্থন থেকে উপকৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে ইরান আবারও তা করতে পারে, বিশেষ করে আমেরিকা বা ইসরায়েল যদি তেহরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোয় বোমা হামলা করে। ইরান আল-কায়েদার যোদ্ধাদের আফগানিস্তানের বাইরে একত্রিত করতে সহায়তা করতে পারে।

ইরানিরা তাদের দেশে আল-কায়েদার অবস্থানকে যেন দেখেও না দেখার ভান করত। তেহরান সবসময় আল-কায়েদাকে আশ্রয় দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে

এসেছে। অথচ আল-কায়েদা যে আছে সেটার প্রমাণ তাদের নাকের ডগায় ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ওসামার পরিবারের অন্তত ১৮ জন ২০০১ সালের পরে ইরানে ছিলেন।

৯/১১ এর পূর্বে সাইফ আল-আদেল ইরানের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন; আবু হাফস আল-মৌরিতানিও পাসদারানদের (বিপ্লবী গার্ড) সাথে যোগাযোগের জন্য নিয়মিত তেহরান সফর করতে থাকেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না যে ২০০১ সালের শরতে আফগানিস্তানে আমেরিকান বোমা হামলার পরে আল-কায়েদার বেশ কয়েকজন কর্মী ইরানে পালিয়ে গিয়েছিলেন। যারা ইরানে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন সাইফ আল-আদেল, আবু মুহাম্মদ আল-মাসরি ও সাঈদ আল-মাসরি। মিশরীয়রা বিপ্লবী গার্ডের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন কারণ বেশিরভাগ জিহাদিদের মতো পাকিস্তানের পথে পালানোর সুযোগ তাদের ছিল না। ১৯৯৬ সালে জামায়াত আল-জিহাদ ইসলামাবাদে মিশরীয় দূতাবাসে বোমা হামলা চালানোর পর থেকে পাকিস্তান মিশরীয় ইসলামপন্থীদের ওপর চড়াও হওয়া শুরু করে। এদিকে ১৯৮১ সালে আনোয়ার সাদাত হত্যাকাণ্ডে ইরানের জড়িত থাকার কারণে তেহরান এবং কায়রোর মধ্যে সাপ-নেউলের সম্পর্ক তৈরি হয়। ফলস্বরূপ, হোসনি মোবারকের বিরোধিতাকারী মিশরীয় জিহাদিরা ইরানে খুব সমাদৃত হয়েছিল। ২০০১ সালের শরতে মিশরীয় জিহাদিরা একই সুযোগ নেয়।

সাইফ আল-আদেলের মতো অনেকে ইরানি নারীদের বিবাহও করেছিল। ইরানে তাদের শরণার্থী হিসেবে থাকতে হবে না, তারা চাইলে ইরানের জাতীয়তা অর্জন করতে পারে। কিন্তু তারা সেখানে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারতেন না। ইরানের সিকিউরিটি ফোর্স তাদের সবাইকে নজরদারির আওতায় কিছু থাকার জায়গা ঠিক করে দেয়। তারা সেখানেই থাকত। কেউই ভাবেনি যে তেহরান তাদের আবার আফগানিস্তানে পাঠানো হবে। তারা তো সেখানেই ছিল এতদিন।

বিষয়টি পরিষ্কার থাকা জরুরি যে ইরানি সরকার কখনোই প্রকাশ্যে জিহাদিদের তাদের দেশের ভেতর দিয়ে যাতায়াতের সুযোগ দেয়নি। মূলত বেলুচিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকার সুন্নি সংখ্যালঘুরা জিহাদিদের সাহায্য করত। জিহাদিরা চলমান তেহরান-সুন্নি সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে ইরানের ভেতর প্রবেশ করত। হরমুজ প্রণালী হয়ে ওমান বা সংযুক্ত আরব আমিরাত যাওয়ার জন্য গোপনে ছিট ঠিক করার সময় পর্যন্ত কেবল তারা সেখানে অবস্থান করত।

আল কায়েদা ইন অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলার প্রধান নাসের আল-ওয়াহাইশি ইরানে বন্দি ছিলেন। কিন্তু সরকার রাজি হয়েছিল তাঁকে ইয়েমেনে পাঠিয়ে দিতে। সেখানে তিনি বন্দি ছিলেন। ২০০৬ সালে তিনি সেখানকার জেল থেকে পালান।

আবু মুসআব আল-যারকাবি ২০০২ সালে ইরান হয়েই ইরাকে যান। সেসময় তেহরান তাকে নিরাপত্তা দিচ্ছিলো।

আমার মনে পড়ে, ২০০০ সালে ওসামা বিন লাদেন লক্ষ্য করেন, সাদ্দাম হুসেইন বুঝতে পেরেছেন যে, ইসলামিস্ট ও জিহাদিরাই আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। তাই তিনি ইরাকে ইসলামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের সুযোগ দিচ্ছিলেন। এটা সাদ্দামের একটি কূটনৈতিক চাল ছিল। বিন লাদেন মনে করতেন, আরব স্বার্থের ব্যাপারে খুব সজাগ থাকেন সাদ্দাম হুসেইন। তিনি আরবদের স্বার্থরক্ষায় সবকিছুই করবেন। তবে বাথ পার্টির রাজনীতি তার কাছে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না।

একটি প্রাচীন প্রবাদ দিয়ে তেহরানের সাথে বিন লাদেনের সম্পর্ক যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, "আমার শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু।"

বিন লাদেন নিজেকে সবকিছুর উর্ধ্বে ভাবতেন না। তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন, "আবু জান্দাল, যদি তোমার মনে হয় যে আমি কোনো ভুল করছি, তাহলে আমাকে সাথে সাথে আমাকে বলবে, যাতে করে আমি তা সংশোধন করতে পারি।"

কিছু কিছু মানুষ আক্রমণাত্মকভাবে চ্যালেঞ্জ করতেও ভাবত না। যেমন মিশরীয় সাংবাদিক আবু ওয়ালিদের স্ত্রী। আবু ওয়ালিদ অনেকদিন যাবৎ আমাদের সাথে ছিলেন। একদিন মসজিদে ঢোকার পথেই তার স্ত্রী শায়খকে ধরে বসেন, 'মেয়েদের স্কুল নিয়ে আপনি কীভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন? এটা তো নারীদের ব্যাপার। নারীদের সাথে অবশ্যই পরামর্শ করা দরকার ছিল আপনার।'

বিন লাদেন বললেন, "আচ্ছা, সমস্যা নেই। চিন্তা করবেন না।"

শায়খ তার স্বামীকে বললেন সমস্যাটি যেন সমাধান করা হয়।

এই কর্তৃত্ব আল-কায়েদার অভ্যন্তরীণ বিরোধগুলো নিষ্পত্তি করে দিত। আল-কায়েদার সদস্যদের মধ্যকার মতবিরোধগুলো ঢাকার জন্যে বিন লাদেন আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতেন।

তা সত্ত্বেও, বিন লাদেন ও আবু মুসআব আল-যারকাবির মধ্যে সুস্পষ্ট মতবিরোধ দেখা দেয়, যদিও দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আল-যারকাবি কাবুল ও হেরাতে সময় কাটাতে থাকেন এবং প্রায়শই কান্দাহারে বিন লাদেনের

সাথে দেখা করতে আসতেন। তাদের মধ্যে মতবিরোধের মূল কারণ ছিল আরব সরকারকে কীভাবে দেখা উচিত--দুর্বৃত্ত হিসেবে নাকি সহমুসলিম হিসেবে। আল-যারকাবি তাদের আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন, তবে বিন লাদেন আরও বেশি সতর্ক ছিলেন। আল-যারকাবি আরব সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে আমেরিকানদের সাথে দ্বন্দ্বের তুলনায় বেশি প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু বিন লাদেন বিশ্বাস করতেন যে আমেরিকান দখলদারদের আরবের মাটি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলে সরকার দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তাদের গুপ্তচরদের সাথে তারাও পতিত হবে। তিনি পূর্ব ইউরোপীয় কমিউনিস্ট সরকাগুলোর উদাহরণ তুলে ধরতেন, যারা তাদের রক্ষাকারী সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সাথে পতিত হয়েছিল। আমি শায়খের সাথে একমত ছিলাম। আল-যারকাবির সাথে কয়েকবারের আলোচনার পর আমি তার সাথে আমার মতানৈক্য তার সামনে তুলে ধরি।

ইরাকে বিন লাদেন ঢালাওভাবে শিয়াদের আক্রমণ করার বিরুদ্ধে ছিলেন। যারকাবির কাজকে তিনি অনুমোদন দেননি। কিন্তু জাওয়াহিরি যারকাবির কাজকে সমর্থন দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

জাওয়াহিরির সাথে দেখা করতে যাওয়ার পথে আমার সাথে দেখা হলে তিনি প্রায়শই বলতেন, "তা আজ 'সমস্যাদের পিতা' কেমন আছেন?"

আমিও ছেড়ে কথা বলতাম না। মাঝেমধ্যে অন্যান্য জিহাদিদের সামনেই জাওয়াহিরিকে উপহাস করতাম। তার সমর্থকদের বেশিরভাগই মিশরীয়। ইয়েমেনিদের সাথে তাদের ঝামেলা ছিল। তারা ইয়েমেনি জিহাদিদের হয়রান করার জন্য বলত; 'ইয়েমেনে আমেরিকা এবং পশ্চিমের স্বার্থে আঘাত করার কিছু চেষ্টা অন্তত করো, এটা করো, ওটা করো...'

ইয়েমেনিরা এ ব্যাপারে আমাকে এসে বলত, 'তারা আমাদের এমনসব কাজ করতে বলছে যা বিন লাদেনের নীতির বিপরীত!'

আমি মিশরীয়দের কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে কৈফিয়ত চাইলাম,

'আপনারা কেন এসব বলছেন? ইয়েমেনে একইসাথে একটি মুসলিম দেশ এবং একটি দরিদ্র দেশ। আমাদের আরও সহনশীল হওয়া উচিত!'

কান্দাহারে মিশরীয়রা দুটো উপগ্রুপে বিভক্ত ছিল—একটির নেতৃত্বে ছিলেন আল-জাওয়াহিরি এবং অপরটির নেতৃত্বে উমর আবদুর রহমান। উমরের গ্রুপের সদস্য ছিল প্রায় চৌদ্দ। তারা আর দশজন সাধারণ আল-কায়েদা সদস্যের মতো আচরণ করত। অপরদিকে আল-জাওয়াহিরির সমর্থনে ছিল মোটে সাতজন। মুহাম্মদ

সালাহ, আবু আসসামা আল-মাসরি ও সালিম আল-মাসরিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা যা করার, নিজেরা নিজেরাই করত। তাদের ও আমাদের মধ্যে ঝামেলা লেগেই থাকত। এমনকি তাদের স্ত্রীরাও অতিষ্ট হয়ে পড়েছিল, তারা কায়রো ফিরে যেতে চাইত।

পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যাপারে ওসামা বিন লাদেন ও আয়মান আল-জাওয়াহিরির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। শায়খ ওসামার মতে, আল-কায়েদার পারমাণবিক অস্ত্র থাকা উচিত। তবে তা কেবল শত্রুকে ভয় দেখানোর জন্য, বাস্তবে ব্যাবহার করার জন্য নয়। একদিন তিনি বলেছিলেন,

'আমেরিকার সাথে টেক্কা দিতে পারার মতো একটি পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করার পেছনে আমার সমস্ত সম্পদ ব্যয় করতেও আমি রাজি আছি।'

পারমাণবিক অস্ত্র আদৌ ব্যবহার করা হবে কি না, আর হলেও তা কখন—এ নিয়ে আল-কায়েদার অভ্যন্তরে অনেক তর্ক-বিতর্ক ছিল। ওসামা মনে করতেন, শত্রুরা যদি আমাদের একেবারে ধ্বংস করে দিতে চায় তবে শেষ ভরসা হিসেবে এটি ব্যবহার করা হবে। জাওয়াহিরির মনে অবশ্য পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার নিয়ে কোনো সংশয় ছিল না।

অন্যান্য আরও অনেক বিষয়েই জাওয়াহিরি শায়খের চেয়েও অধিক কট্টর। উদাহরণস্বরূপ, পাকিস্তানি সরকারকে তিনি কাফের মনে করতেন। তিনি আরব সরকার ও নেতাদের কাফের বলে অভিহিত করতেন। বিন লাদেন অবশ্য তাদের একেবারে সাধু না বললেও, তারা যে আসলে মুসলিম—এই বিষয়টাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করতেন। জাওয়াহিরি বিন লাদেনের চেয়েও বেশি কঠোর ছিলেন।

জাওয়াহিরি ও তার সমর্থকদের শায়খ ওসামা যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিলেন, তাতেই তার নিজের বিজ্ঞতা প্রমাণিত হয়। তিনি মিশরীয়দের সকল সমস্যা সম্পর্কে জানতেন, কিন্তু কখনোই সেগুলো উল্লেখ করেননি। তিনি জাওয়াহিরির আচরণ পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সক্ষম হননি।

জাওয়াহিরিকে ইঙ্গিত করে একবার বিন লাদেন আমাকে মনে রাখতে বলেছিলেন যে 'পুরোনোরা' শীঘ্রই মারা যাবে। যাওয়াহিরি স্পষ্টতই আল-কায়েদা এবং এর নেতার ওপরে আরও বেশি প্রভাব ফেলতে চেয়েছিলেন, তবে এজন্য একটি সত্যিকারের সমস্যায় পরিণত হওয়ার মতো পর্যাপ্ত লোকবল তার ছিল না। এটা সত্য যে, সেই সময় আল-কায়েদার নয়জন প্রধান নেতার মধ্যে ছয় জন

মিশরীয় ছিলেন, কিন্তু তারা সকলেই যাওয়াহিরির সমর্থক ছিলেন না, তাদের অঙ্গীকার ছিল সবার ঊর্ধ্বে জিহাদ ও আল-কায়েদার প্রতি।

যদিও তাদের নেতৃত্বের মধ্যকার টানাপোড়েন কখনো সামরিক কিংবা ভ্রাতৃঘাতী হয়ে উঠেনি, তবে এটিই ছিল আল-কায়েদার ঐক্যের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।

মতানৈক্যগুলো বাদ দিলে, আমি কখনো শায়খ ও আল-জাওয়াহিরিকে তর্ক বা ঝগড়া করতে শুনিনি। সবার মতোই জাওয়াহিরি বিন লাদেনকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। জাওয়াহিরি কখনো বিন লাদেনের মুখের ওপর জবাব দিতেন না।

একদিন আমি আল-জাওয়াহিরিকে খুব তীব্র ভাষায় বলতে শুনি, "ঐ ইয়েমেনি কেউ না। এসব ইয়েমেনি কিছু জানে না।" তিনি জানতেন না আমি সেখানে ছিলাম।

আমি ফিরে গিয়ে বললাম, "কারও পেছনে এভাবে কথা বলা উচিত না।"

"ওহ! আপনি এখানে ছিলেন?"

তিনি চুপ হয়ে যান এবং আর কিছুই বলেননি।

একবিংশ অধ্যায় : আল-কায়েদার কেন্দ্র আর নেই

বিন লাদেন যেদিন মোল্লা উমরের হাতে বাইয়াত দেন, সেদিন থেকেই আল-কায়েদার কেন্দ্র অফিসিয়ালি তালেবান আন্দোলনের একটি অংশ হয়ে যায়। সবার বোঝা উচিত, তালেবান ও আল-কায়েদা একই সত্ত্বার সাথে মিশে গেছে। তবে আমেরিকান মিডিয়া এই সত্যটি গোপন করতে খুব কঠোর পরিশ্রম করে। তারা বিষয়টা মেনে নিতে পারে না।

তালেবানের হাতে আফগানিস্তানের যে পরিমাণ স্থান দখলে আছে তা গোটা ফ্রান্সের চেয়েও বড়। তারা সেখানে তাদের অনু সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। এটাই স্বাভাবিক যে বাইয়াত ও তার পরের ঘটনায় আল-কায়েদার অবস্থান সত্ত্বাগতভাবে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

আল-কায়েদা ক্রমশ একটা আদর্শে রূপ নেয়। এর প্রাথমিক মূলনীতি একেবারেই সাধারণ; যারা আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায় তাদের উচিত এই সত্ত্বাগুলো যেকোনো একটির অংশ হয়ে যাওয়া। এ সত্ত্বা ও তার অংশগুলো ওসামা বিন লাদেনের তিলে তিলে গড়ে তোলা। এদের কয়েকটাতে ওসামা বিন লাদেনের ব্যাপক সাহায্যও আছে। যেমন, আফগানিস্তানের তালেবান, পাকিস্তানের তালেবান, আল-কায়েদা ইন দ্য ইসলামিক মাগরেব, ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক, আল-কায়েদা ইন অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা (২০০৯ সাল থেকে) এবং সম্প্রতি সোমালিয়ায় ইসলামি ইমারাহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আল-শাবাব।

আমেরিকার মিডিয়া দাবি করতে থাকে যে আমেরিকা ইরাকে আল-কায়েদাকে দুর্বল করে দিয়েছে। তাদের কথা মৌলিকভাবেই ভুল। শুরুতে আল-কায়েদা ইন ইরাক বলে কিছু ছিল না। সেখানে ছিল ইসলামিক স্টেট অব ইরাক। সেখানে আল-কায়েদার প্রভাব ছিল। কেননা তাদের নেতাদের একজন ছিলেন আল-কায়েদাপন্থী— আবু মুহাজির।

এ দেশগুলোতে বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির ব্যাপারে কাজ হচ্ছিল। সোমালিয়ায় জিহাদি আন্দোলনের বিরাট অংশ পরিচালিত হতো আঞ্চলিক গোত্রগুলোর মাধ্যমে। ইরাকেও গোত্রগুলোর মধ্যে আল-কায়েদা নিজেদের খুঁটি শক্ত করার কাজ করে যাচ্ছিল, যদিও সেখানে কিছু সমস্যা ছিল। ইয়েমেনে সমস্যা কিছুটা কম ছিল, কেননা সেখানে অনেক গোত্রই আল-কায়েদার মিত্র ছিল। আর আফগানিস্তানে পশতুন গোত্রের সাথে ভালো মিত্রতা ছিল আল-কায়েদার।

আল-কায়েদা কেন্দ্রকে এমন মিশ্রিত করার একটা পরিণতি ছিল ওসামা বিন লাদেনের দুর্বল হয়ে যাওয়া। বিশ্বের মোস্ট ওয়ান্টেড ম্যানকে এখন স্থায়ীভাবে লুকিয়ে থাকতে হলো এবং তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ও যোগাযোগের স্বাধীনতা স্বাভাবিকভাবেই কমে এল। শেষ পর্যন্ত তার কেবল একটাই ক্ষমতা রইল, কথা ক্ষমতা। ইন্টারনেটে তার কথার আঘাত আসা। এটাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বিন লাদেন যদি বিশ্বাসীদের নেতা হতে চাইতেন তাহলে তিনি মোল্লা উমরের কাছে বাইয়াত দিতেন না। এ টাইটেল (আমিরুল মুমিনীন) ছিল মোল্লা উমরের।

তালেবানের কাছে বাইয়াত দেওয়ার এক বছর আগে ১৯৯৭ সালে বিন লাদেন আমাকে বলেছিলেন, তালেবান ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে, আল-কায়েদা একদিন এর অংশ হবে ইনশাআল্লাহ। তিনি জানতেন আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ক্ষমতা এভাবে ক্রমশ কমে আসবে। ইসলামি রাষ্ট্র ও বাইয়াত ছিল তার অন্যতম লক্ষ্য। তিনি নিজের ক্ষতির কোনো পরোয়া করতেন না। তিনি নিজের স্বার্থকে পাত্তাই দিতেন না।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বলা যায়, আল-কায়েদা যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে, সেখানে বিন লাদেন যদি গ্রেফতার বা নিহত হন তাহলে তাতে কিছুই আসবে যাবে না। শায়খ অন্য অনেক মুজাহিদের মতোই এ কাফেলার একজন মুজাহিদ।

কিন্তু আল-কায়েদার এ বিবর্তন কোনোভাবেই বৈশ্বিক জিহাদের মৃত্যু ঘটায়নি। অনেকেই এই ভিত্তিহীন দাবি করেছেন। কারণ, সব প্রতিকূলতা বাদ দিয়েও বিশ্বের হাজার হাজার মানুষ আল-কায়েদার প্রতি, ওসামা বিন লাদেনের প্রতি তাদের সমর্থন-আনুগত্য জানিয়েছে। তাদের বেশিরভাগই কখনো বিন লাদেনকে সামনাসামনি দেখেইনি। তারাই এগিয়ে নিচ্ছে বৈশ্বিক জিহাদের ঝাণ্ডা।

সকল জিহাদি গ্রুপের একটি কমন শত্রু ছিল—আমেরিকা। যদিও তাদের অনেকে আমেরিকার আগে নিজের দেশের সরকারের সাথে লড়াই করাকে প্রাধান্য দিত। আমি শুনেছি, এ ধরনের রাষ্ট্রীয়ভাবে চিন্তা করা জিহাদিরা আল-জাওয়াহিরি ও বিন লাদেনের আদর্শের বিপরীত। কিন্তু এ ধরণের সমস্যাগুলোকে বড় করে দেখার কিছু নেই। আল-কায়েদা নেতাদের অবস্থান হলো, আমেরিকা যদি একটি ষাঁড় হয় যাকে হত্যা করতেই হবে, তাহলে তার মাথা এখনই আফগানিস্তানে নড়াচড়া করছে। তার পা ইয়েমেন, ইরাক, জর্ডান ও সৌদি আরবে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে বসছে। আর

এসব আঞ্চলিক যুদ্ধ একটি নির্দিষ্ট শত্রু, একটি নির্দিষ্ট দানবের বিরুদ্ধে। তা হলো আমেরিকা।

ওসামা বিন লাদেন হারিয়ে গেলেও সংগঠনটি টিকে থাকবে, জিহাদের বর্শার লৌহ-ফলার মতো। এর বিভিন্ন ব্রাঞ্চের নেতারা হলেন প্রথম প্রজন্মের মানুষ। তারা বিন লাদেনকে ব্যক্তিগতভাবে চিনেতেন এবং আল-কায়েদার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তারা এর মূলনীতি সম্পর্কে একদম পরিষ্কার ধারণা রাখেন। আর তা হলো, কাফেরদের হাত থেকে মুসলিম ভূমিসমূহ রক্ষা, ইসলামি ইমারাহ প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীর বুকে শরিয়াহ আইন প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা।

অনেকেই দাবি করেন যে আমেরিকায় ৯/১১-এর মতো কোনো নতুন আক্রমণ সংগঠনকে আবার প্রাণবন্ত করে তুলবে। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই। ৯/১১-এর আগে বিন লাদেন আমাদের প্রায়ই বলতেন যে, আমেরিকানদের আমেরিকার মাটিতে আক্রমণ করা খুব কঠিন। এ কারণেই তিনি বেশ কয়েকটি মিশন পরিচালনা করেছেন, যেন আমেরিকানরা আমাদের কাছে আসে, আফগানিস্তানে আসে, যেখানে আমাদের অবস্থান, সুযোগ অনেক বেশি।

৯/১১-এর আগে আমেরিকা আমাদের দিকে অত নজর দিত না। আমরা তাদের ভুল-ত্রুটি থেকে সুবিধা নিতে পারতাম। কিন্তু ৯/১১-এর পরে আমেরিকা নিরাপত্তা খাতে অনেক বেশি নজর দিতে শুরু করে।

ওসামা বিন লাদেন এখন কেমন আছেন? মানুষ প্রায়ই আমাকে এ প্রশ্ন করে। আমার সাথে তার বেশ কয়েক বছর ধরে কোনো যোগাযোগ নেই। তবে আমার মনে হয় তিনি আফগান-পাকিস্তান সীমান্তে কোনো গোত্রের নিরাপত্তায় আছেন। গরিবি হালত বিন লাদেনের জন্য কোনো সমস্যা না। তিনি খোলা মাঠে কোনো বিছানা ছাড়াই ঘুমাতে পারেন। রুটি-পানি থাকলে যেকোনো স্থানেই তিনি অভিযোজিত হতে পারবেন। তিনি নিশ্চয়ই কোনো ইসলামি পরিবেশে মুসলিমদের সাথে আছেন যেখানে তাকে সমর্থন দেওয়া হচ্ছে। তাকে যথার্থ নিরাপত্তা দিয়ে রাখা হয়েছে, এমনকি তিনি যখন এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যান, তখনও। তিনি তার সাথে তার খুব কাছের তিন-চারজন মানুষকে রাখেন, তাদের একজন হতে পারেন হামজা আল-ঘামদি, তাজিকিস্তানে আমাদের আমির। তিনি কোনোভাবেই পাকিস্তানে অবস্থান করছেন বলে আমার হয় না। সেখানকার সরকার তার বিরুদ্ধে। তাদের নিরাপত্তা সেখানে হুমকির মুখে থাকবে। অভিজ্ঞতা বলে, কিছু পাকিস্তানি অর্থের বিনিময়ে সহজেই জিহাদিদের সাথে বেইমানি করতে পারে। বিন লাদেন এসব বিপদের কথা জানেন।

আমি ওয়াজিরিস্তানের গোত্রের মানুষদের চিনি। আমেরিকা মনে করে, বিন লাদেন সেখানেই আছেন। এসব গোত্র আরও বেশি ধার্মিক, এবং এটাই ছিল শায়খের সুবিধা। তাদের আনুগত্য জিহাদ, ইসলাম ও এর রক্ষাকারীদের প্রতিই বেশি, এমনকি তাদের গোত্রের নেতাদের চেয়েও। তারা 'বিক্রয়যোগ্য' না বললেই চলে। এসব গোত্রসমূহের বেশিরভাগ নেতাই উলামা, পশতুন। এদের সাথে তালেবানের সম্পর্ক ভালো। এদেরকে বিন লাদেন আশির দশক থেকে চেনেন। তার সেখানে সহজে জীবন কাটাতে পারার কথা।

ভুলে যাবেন না, আজ থেকে ২৫ বছর আগেই এসব গোত্রের জন্য বিন লাদেন রাস্তা, বাড়ি-ঘর বানিয়ে দিয়েছেন। একান্তই মানবসেবার খাতিরে। তারা বিন লাদেনের প্রতি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ। তারা তাদের গোত্রের নীতি ও নৈতিকতার (পশতুলওয়ালি) জায়গা থেকে মনে করে বিন লাদেন তাদের সাহায্য ও নিরাপত্তার হকদার। তারা তাদের এসব নীতি নিয়ে অনেক বেশি গর্বিত। সে সময় শীতে তিনি তাদের খাবার ও কম্বল পর্যন্ত দিয়েছিলেন। তিনি তাদের টাকা দেওয়ার সাথে সাথে তাদের নেতাদের এটাও বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে ইসলামই একমাত্র সঠিক পথ। তিনি তাদের আমেরিকানদের আগ্রাসন সম্পর্কে বুঝিয়েছেন। আফগানরা সবাই আমেরিকার আগ্রাসনকে ঘৃণা করত।

তাদের এলাকায় অনেক বেশি পাহাড়। এখানে প্রবেশ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। এখানে এসে ব্রিটিশ ও রাশিয়ানদের অনেক বেশি ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। বলাই বাহুল্য, এখানে এসে আমেরিকারও একই অবস্থাই হবে। এখানে অনেক প্রাকৃতিক গুহা আছে যা আল-কায়েদার দখলে। লুকানোর জন্য আদর্শ জায়গা। পাহাড়গুলোতে আছে, গহীন জঙ্গল। আর সবকিছু জায়গাটিকে বিন লাদেনের জন্য অধিক নিরাপদ করে তুলেছে।[২১]

তিনি কি মারা গিয়েছেন?[২২] তিনি ইন্তেকাল করলে, আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দ ও তালেবান তার পদে অন্য কারো নাম ঘোষণা করত। তার মৃত্যুর কথা সাথে সাথেই প্রচার করা হতো না। কারণ, ঘোষণার আগে কিছু অফিসিয়াল প্রসিডিউর শেষ করা প্রয়োজন। কিন্তু মৃত্যু বেশিদিন লুকিয়ে থাকবে না। কোনো না কোনোভাবে সবাই জানবে। হয় সরাসরি, না হয় ইন্টারনেটে। আমার মত হলো, তিনি বেঁচে আছেন।

---

২১. বিন লাদেন ২০০৫ সাল অবধি ওয়াজিরিস্তানে আত্মগোপন করেছিলেন। এরপর তিনি পাকিস্তানের অভ্যন্তরে অ্যাবোটাবাদে স্থানান্তরিত হন।

২২. বাহরি এ বই লিখেছেন ২০১০ সালে, বিন লাদেন হত্যার ১ বছর আগে।

একটি বিষয় নিশ্চিত, বিন লাদেনের কাছে সবচেয়ে জঘন্যতম বিষয় হলো গ্রেফতার হওয়া। আল-কায়েদা প্রধানের জন্য এর চেয়ে জঘন্য বিষয় আর কিছু নেই। তিনি অসংখ্যবার আমাকে বলেছেন, তিনি কোনো এক যুদ্ধে আল্লাহর পথে শহিদ হতে চান।

তিনি প্রায়ই বলতেন, তিনি সম্মুখসমরে তালেবানদের হয়ে নর্দান অ্যালায়েন্সের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান মানসিক ও ইমানি শক্তি বাড়ানোর জন্য।

'শাহাদাতের বাইরে আমি আর কিছুই ভাবি না। আমি এখানে এসেছিই কাফেরদের সাথে লড়াইয় করার জন্য।'

বিন লাদেন কখনো সরাসরি বলে যাননি, তার পরে সেকেন্ড ইন কমান্ড আয়মান আল-জাওয়াহিরিই হবে আল-কায়েদার প্রধান। তাত্ত্বিকভাবে হায়ারার্কি হিসেব করলে তার পরিবর্তে মিশরীয় আল-জাওয়াহিরিরই আল-কায়েদা প্রধান হওয়ার কথা।[২৩]

এ উত্তরাধিকারটা একটু ঝামেলার। আমার মতে, সংগঠন চালানোর মতো ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা জাওয়াহিরির নেই।

বিন লাদেন ছিলেন জাত নেতা। তিনি এত স্বচ্ছতার সাথে কাজ করতেন যে সবাই তাকে গ্রহণ করে নিয়েছিল। তিনি সরাসরি আলোচনা করতেন এবং তার একটি ঐতিহাসিক গ্রহণযোগ্যতা ছিল। কিন্তু জাওয়াহিরি কাজ করতেন গোপনে। আল-কায়েদার অনেকেই জাওয়াহিরির নেতৃত্বকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। একজন মিশরীয় হিসেবে তার আচরণ অনেককে চিন্তিত করেছে এবং অনেক সমালোচনা এসেছে এ নিয়ে। এ সবকিছুই দাগ কেটেছে। মাঝেমধ্যে তার সিদ্ধান্তের সাথে অন্য নেতাদের সিদ্ধান্তের সংঘর্ষ হতো। তিনি আসলেই নেতৃত্ব দিতে পারবেন কি না—এ নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। যদিও তিনি তার একনায়কত্ব ও নিয়ন্ত্রনকারী মনোভাবের জন্য সুপরিচিত ছিলেন।

কান্দাহারে তিনি দূরত্ব বজায় রাখতেন। আমি তার স্ত্রী হাসাকে চিনতাম না, তার মেয়েদেরকেও না। আমি শুধু জানতাম তার একজন স্ত্রী জর্ডানের, আরেকজন মিশরীয়। তার ছেলে মুহাম্মদ তখনো ছোট ছিল। তার সর্বকনিষ্ঠ মেয়ে আয়েশা ডাউন'স সিনড্রোম নিয়ে জন্ম নেয়। তার কিছু সন্তান ৯/১১ পরবর্তী সময়ে আমেরিকার এয়ার রেইডে শহিদ হয়।

---

২৩. আয়মান আল-জাওয়াহিরি সত্যিই ২০১১ সালের জুনে এই সংগঠনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

আরব মিডিয়ার প্রভাবে আমেরিকা মনে করে আল-কায়েদার আদর্শ এসেছে জাওয়াহিরির মাথা থেকে। এটা সত্য যে, তিনি অনেক বেশি জ্ঞানী এবং মার্জিত ছিলেন। কিন্তু দীন ও শরিয়াহর জ্ঞান বিন লাদেনের মতো সুগভীর ছিল না।

যদি আমেরিকা বা ইসরায়েল ইরাকে আক্রমণ করত, তবে তা হতো আল-কায়েদার সৌভাগ্য। আফগানিস্তান, ইরান, সিরিয়া এবং ইরাক—সবই হতো আল-কায়েদার যুদ্ধক্ষেত্র।

আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা নির্বাচনের পর থেকেই পুরো পৃথিবীকে আফগানিস্তানে একত্রিত করতে চাচ্ছেন, যেন আরব বিশ্ব থেকে তিনি তার সৈন্যদের সরিয়ে নিতে পারেন। বিন লাদেন এ সিদ্ধান্তেরই অপেক্ষা করছিলেন। জর্জ বুশের মতো গর্দভ ছিলেন না ওবামা। একজন ছিল টেক্সাসের কাউবয়, আরেকজন হলো হার্ভার্ডের গ্র্যাজুয়েট। ওবামা দেখাতে চাচ্ছিলেন যে তিনি আসলে আরব ও মুসলিম মন বুঝতে পারেন, তাদের নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্যতা তার আছে। কিন্তু বোকা বনে যাবেন না, শিয়ালও ভুল করে।

জিহাদি আন্দোলনগুলো এদের দাবি পূরণের আগ পর্যন্ত কোনোভাবেই পশ্চিমের সাথে কোনো প্রকার সমঝোতায় যাবে না।

সভ্যতার সংঘাত এখানেই শেষ নয়, এখনো অনেক পথ বাকি।

প্রজন্ম পাবলিকেশনের নন-ফিকশন বই সমূহ

ক্র	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
০১	কয়েদী ৩৪৫	সামি আলহায	২৩৫৳
০২	আফিয়া সিদ্দিকী: গ্রে লেডি অব বাগরাম	টিম প্রজন্ম	২২০৳
০৩	গুজরাট ফাইলস	রানা আইয়ুব	৩০০৳
০৪	দ্য কিলিং অব ওসামা	সিমর হার্শ	২১৬ট
০৫	উইঘুরের কান্না	মুহসিন আবদুল্লাহ	২৬৪৳
০৬	আজাদীর লড়াই (কাশ্মীর কেস ফর ফ্রিডম)	অরুন্ধতী রায়	২০৪৳
০৭	আয়না	আফজাল	৩২০৳
০৮	জাতীয়তাবাদ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫০৳
০৯	দ্য রোড টু আল-কায়েদা	মুনতাসির আল-যায়াত	৩৩০৳
১০	মোস্ট ওয়ান্টেড উইম্যান	দাউদ গজনভী	৩০০৳
১১	ভারতে সন্ত্রাসবাদের আসল চেহারা	এস এম মুশরিফ	৫০০৳
১২	একটি ফাঁসির জন্য	অরুন্ধতী রায়	৩০০৳
১৩	নয়া পাকিস্তান	তীলক দেভাশের	৩২০৳
১৪	মোসাদ এক্সোডাস	গ্যাড সিমরণ	২৫০৳
১৫	পার্মানেন্ট রেকর্ড	এডওয়ার্ড স্নোডেন	৩৫০৳
১৬	অ্যাম্বাসেডর	আবদুস সালাম জাইফ	২৩৫৳
১৭	মুখোশের অন্তরালে	নাজমুল চৌধুরী	৩০০৳
১৮	ম্যালকম এক্স । নির্বাচিত ভাষণ	ম্যালকম এক্স	৪০০৳
১৯	মাইন্ড ওয়ারস	ম্যারি ডি জোনস	৩৩০৳
২০	বিপ্লবী ভাষণ । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব	আহমদ মুসা	৩৫০৳
২১	নির্বাচিত বাণী	শেখ মুজিবুর রহমান	২০০৳
২২	মৌলবাদী নাস্তিক	কাজী ম্যাক	২৮০৳
২৩	বীর নারী মুক্তিযোদ্ধার কথা	সুরমা জাহিদ	২০০৳
২৪	পুঁজিবাদ	অরুন্ধতী রায়	১৭৫৳
২৫	যে কারণে শেখ মুজিবকে ভালোবাসি	রফিকুল ইসলাম	২০০৳
২৬	ইলুমিনাতি এজেন্ডা	ডিন এন্ড জিল হ্যান্ডারসন	২৫০৳
২৭	ভারতের কারাগারে দিনগুলো	ইফতিখার গিলানি	২৫০৳
২৮	শত্রুযোদ্ধা	মোয়াজ্জেম বেগ	৫৫০৳

একবিংশ শতাব্দির বিশ্বরাজনীতিতে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা কী? নিঃসন্দেহে, ৯/১১। সবচেয়ে আলোচিত শক্তি কে? নিঃসন্দেহে আল-কায়েদা। আল-কায়েদা প্রধান, বিশ্বরাজনীতির সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তি, মোস্ট ওয়ান্টেড ওসামা বিন লাদেনকে আপনি কতটুকু চেনেন? তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর চেয়েও বেশি?

নাসের আল-বাহের। এককালে দীর্ঘ সময় ধরে তিনি ওসামা বিন লাদেনের পাশে থেকে আল-কায়েদার অন্যতম একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে সংগঠন পরিচালনা, প্রশিক্ষণসহ আরো অনেক কাজে নিয়োজিত ছিলেন তিনি। তাঁর কথা থেকে কেবল ওসামা বিন লাদেনের ব্যক্তিগত জীবন, আদর্শই নয়, বরং উঠে এসেছে আল-কায়েদার প্রতিষ্ঠা, কি ফিগার এবং আদর্শিক অবস্থানসহ আরো অনেক কিছু।

আল-কায়েদা বর্তমান সময়ে অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি প্রাসঙ্গিক। আর আল-কায়েদা বুঝতে হলে পৌঁছে যেতে হবে তাঁর শিকড়ে। তবে আর দেরি কেন? নাসেরের হাত ধরে ঘুরে আসুন প্রায় বিশ বছর আগ থেকে, ঘুরতে থাকুন এক দশকের বেশি সময় ধরে।

BDT ৳ 330
USD $ 20

www.prajonmo.pub

NON FICTION
ISBN: 978-984-95578-5-2